গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ইতিহাস

বৈষ্ণব-বিবৃতি।

A Short Social History of Vaishnabs in Bengal.

—:o:—

"শ্রীগোবিন্দনামামৃত, শ্রীগৌর-উপদেশামৃত, প্রেম ও ভক্তি-সাধনা,
শ্রীশ্যামানন্দ চরিত, ভক্তের সাধন, বৈদিক বিষ্ণুস্তোত্র, শ্রীশিক্ষামৃত,
শ্রীরাধাবল্লভ-লীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও বহু প্রাচীন
ভক্তি-গ্রন্থ-প্রকাশক "শ্রীভক্তিপ্রভা"-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৩।

মূল্য কাগজের মলাট—২৲ টাকা মাত্র।
" উৎকৃষ্ট বাধান—২৷৷৹ টাকা মাত্র।
ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

প্রকাশক—

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বিদ্যাবিনোদ,

"শ্রীভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয়,

আলাটী পোঃ, জেলা হুগলী।

———:o:———

Printed by—

UPENDRA NATH MALIK,

at the

"Ranjadu Press," Sermpore, Hooghly.

ভূমিকা।

অধুনা যদিও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে—অনেকেই এখন বৈষ্ণব-সাহিত্যের ও ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন বটে, কিন্তু এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ও বৈষ্ণবজাতি-সমাজকে অতীব ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। ইহা অসত্য নহে, বৈষ্ণবজাতি-সমাজের আবর্জ্জনা স্বরূপ এমন কতকগুলি ভ্রষ্টাচারী বৈষ্ণবব্রুব আছেন, যাঁহারা সমাজের দুষ্ট-ক্ষতরূপে সমগ্র বৈষ্ণবজাতি-সমাজের অঙ্গকে দূষিত ও কলঙ্কিত করিতেছেন। ইহা কম দুঃখের বিষয় নহে। সে যাহা হউক, বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম্ম, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষ্ণবজনের আচার-ব্যবহার যে সম্পূর্ণ বেদ-বিধি-সম্মত, বৈদিক সিদ্ধান্তানুকূল প্রমাণ-মুখে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহা প্রদর্শনের যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুরূহ বিষয়ের আলোচনা যে গভীর জ্ঞান ও গবেষণা সাপেক্ষ, তাহা বলাই বাহুল্য। তাদৃশ শক্তির অভাবে এই গ্রন্থে সংক্ষেপে কেবল আভাস মাত্র বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-জাতির বিরাট ইতিহাস-সঙ্কলনের কত যে উপকরণ-স্তূপ সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, ক্ষুদ্র আমি, তাহার যথাসাধ্য দিগ্‌দর্শনমাত্র করিলাম। আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে কোন না কোন শক্তিমান বৈষ্ণব-সুধী বৈষ্ণব-ইতিহাসের বিরাট-সৌধ নির্ম্মাণ করিবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

বৈষ্ণবজাতি ধর্ম্মোৎপন্ন জাতি, সুতরাং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত এই জাতির সম্বন্ধ ওতঃপ্রোতোভাবে বিজড়িত। বৈষ্ণবের স্থান অতি উচ্চে হইলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব-জন শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'অমানী' হইয়া মানদ হইবার উপদেশকে হৃদয়ে ধরিয়া আত্ম-সম্মান লাভের প্রতিও ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ক্রমশঃ শিক্ষার অভাবে আত্মসম্মান বোধশক্তি হারাইয়া ও সমাজের বন্ধন-শৈথিল্য-প্রযুক্ত অবাধে আবর্জ্জনা প্রবেশের ফলে বিশুদ্ধাচারী গৌড়াদ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি হিন্দুসমাজের একটী প্রধান অঙ্গ হইয়াও দিন দিন কলুষিত

হইয়া স্বস্থানচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। তাই এক্ষণে এই বৈষ্ণবজাতির মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষালোক প্রবিষ্ট হওয়ায় সাধারণ্যে আত্ম-পরিচয় দিবার কালে শিক্ষিত জনের হৃদয়ে আত্মসম্মানবোধ ও জাতীয় গৌরব-খ্যাপনের স্পৃহা স্বতঃই জাগরিত হইতেছে। বিশেষতঃ এই জাতীয় আন্দোলনের যুগে বরেণ্য ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম স্তরের জাতি পর্য্যন্ত সকল জাতিই স্ব স্ব জাতীয় ইতিহাস-সঙ্কলন করিয়া স্ব স্ব জাতীয় গৌরবকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। কিন্তু এই অবসন্ন বিপন্ন বৈষ্ণবজাতির এমন কোন জাতীয় ইতিহাস নাই—যদ্দ্বারা দেখান যাইতে পারে, এই বৈদিক বৈষ্ণব জাতির শাস্ত্রে কিরূপ গৌরব বর্ণিত আছে, উহাঁদের সামাজিক স্থানই বা কোথায় এবং তাঁহাদের অধিকারই বা কি আছে? জাতীয় সাহিত্যই অবসন্ন সমাজকে পুনরায় উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার সহায়তা করে। এই উদ্দেশে কতিপয় শিক্ষিত স্বজাতি বন্ধুর উপদেশে ও উৎসাহে বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণবজাতির উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ঐতিহাসিক তথ্য, সামাজিক অধিকার-নিরূপণ, আচার-ব্যবহারের বিবরণ ও পরিশেষে গভর্ণমেণ্টের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে বৈষ্ণব জাতি সম্বন্ধে যে অযথা মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহারও যথাশাস্ত্র যুক্তিমতে তীব্র সমালোচনা করিয়া প্রথম সংস্করণের পুস্তক অপেক্ষা প্রায় আটগুণ বর্দ্ধিতায়তনে এই **দ্বিতীয় সংস্করণ** বৈষ্ণব-বিবৃতি **"গৌড়ীয় বৈষ্ণব ইতিহাস"** (A short social History of Vaishnavs in Bengal) নামে প্রকাশিত করিলাম। এই সংস্করণে আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং এত অধিক বিষয় বিন্যাস করা হইয়াছে যে, ইহা পাঠ করিলে পাঠকগণের নিকট একখানি সম্পূর্ণ অভিনব গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হইবে। সুতরাং যাঁহাদের নিকট প্রথম সংস্করণের অসম্পূর্ণ 'বৈষ্ণব বিবৃতি" আছে, তাঁহাদের পক্ষেও এই গ্রন্থ অবশ্য পাঠ্য। গ্রন্থ-সঙ্কলনের ও মুদ্রণের ক্ষিপ্রতা বশতঃ এই গ্রন্থে বহুতর ভ্রম-প্রমাদাদি থাকা অসম্ভব নহে। এজন্য একটী শুদ্ধি-পত্র এবং গ্রন্থ শেষে একটী পরিশিষ্ট সংযোজিত করা হইল, তদ্দৃষ্টে সহৃদয় পাঠকবর্গ অশুদ্ধ স্থান অগ্রে সংশোধন করিয়া লইয়া পরে গ্রন্থ পাঠ করিলে পরম বাধিত হইব।

তদতিরিক্ত ত্রুটী কৃপাপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিলে পরবর্ত্তি-সংস্করণে অবশ্য সংশোধন করা হইবে।

মানব-সমাজের শান্তিপথ-প্রদর্শক সত্যনিষ্ঠ গুণগ্রাহী ব্রাহ্মণ-সমাজকে উদ্দেশ করিয়া যাহা এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, তাহা সমালোচনা-প্রসঙ্গে মাত্র। কটাক্ষ করিয়া কি ঈর্ষা প্রণোদিত হইয়া কোন কথারই অবতারণা করা হয় নাই। আশা করি, উদার-স্বভাব ব্রাহ্মণ-সমাজ ও আচার্য্যসমাজ নিজ গুণে এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়গুলি প্রণিধান পূর্ব্বক দোষাংশ পরিহার করিয়া বৈদিক বৈষ্ণবজাতির যাবতীয় ন্যায্য অধিকার অনুমোদন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না, ইহাই করপুটে প্রার্থনা।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলন বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ কৃতিত্ব কিছুই নাই। আমি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, এই গ্রন্থ-প্রণয়ন পক্ষে আনন্দবাজার পত্রিকা, সমাজ, বৈষ্ণবসেবিকা, হিন্দুপত্রিকা, কায়স্থপত্রিকা, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড, ব্রাহ্মণ ইতিহাস, সম্বন্ধ-নির্ণয়, জাতিভেদ, গৌড়ীয় প্রভৃতি এবং বিবিধ শাস্ত্র গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি। সুতরাং উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও গ্রন্থকারগণের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ। বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন—সন্দর্ভসদন হইতে প্রকাশিত মাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহোদয়ের গ্রন্থাবলী হইতে, পণ্ডিত ৺রাসবিহারী সাঙ্খ্যতীর্থের "বৈষ্ণব-সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ হইতে ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত মুরারিলাল অধিকারী মহাশয় কৃত "বৈষ্ণব-দিগ্‌দর্শনী" নামক গ্রন্থ হইতে আমি প্রভূত সাহায্য পাইয়াছি, এজন্য তাঁহাদের শ্রীচরণস্তম্ভে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ এবং যে সকল স্বজাতি বৈষ্ণববন্ধু আমাকে এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটও চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। আরও উপসংহারে নিবেদন—সমাজের যে কোন মহাত্মা এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন অভিমত বা সমালোচনা প্রকাশ করিলে, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে পরবর্ত্তী সংস্করণে ছাপা হইবে।

বাঙ্গলার উপসম্প্রদায়ী তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবজাতি-সমাজের পার্থক্য সূচিত করাই এই গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য। অতএব যাঁহাদের জন্য এই গ্রন্থ লিখিত হইল, তাঁহারা যদি এই গ্রন্থপাঠে কিঞ্চিৎও প্রীতিলাভ করেন অথবা এই গ্রন্থ-প্রকাশে সমাজের যৎসামান্যও উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে আমি সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিয়া কৃতার্থ হইব। ইতি—

পশ্চিমপাড়া,
আলাটী পোঃ জেলা হুগলী।
শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের পাট,
শ্রীজন্মাষ্টমী,
সন ১৩৩৩ সাল।

বৈষ্ণবজনানুগদাস
শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি।

সূচীপত্র।

—:o:—

প্রথম অংশ।

বৈদিক প্রকরণ।

প্রথম উল্লাস।

দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উল্লাস।

পৌরাণিক প্রকরণ।

চতুর্থ উল্লাস।

পঞ্চম উল্লাস।

ঐতিহাসিক প্রকরণ।

ষষ্ঠ উল্লাস।

গৌড়াদ্য বৈষ্ণব।

সপ্তম উল্লাস।

চতুঃসম্প্রদায়।

অষ্টম উল্লাস।

দ্বিতীয় অংশ।

বৈষ্ণব-সাহিত্য।

নবম উল্লাস।

তৃতীয় অংশ।

বর্ণ-প্রকরণ।

দশম উল্লাস।

একাদশ উল্লাস।

দ্বাদশ উল্লাস।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

পঞ্চদশ উল্লাস।

বিংশ উল্লাস।

একবিংশ উল্লাস।

পরিশিষ্ট।

সম্পূর্ণ।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১২	১	ভগবানের জ্ঞান	ভগবানের ভজন।
১৮	১৯	শ্রীরাস লীলা	শ্রীরাম লীলা।
২২	৪	বিজ্ঞমত্রেরই	বিজ্ঞমাত্রেরই।
২৪	১০	সতস্থাভিহিতং	সত্যস্থাপিহিতং।
৯২	১৪	এই জন্যই বৈষ্ণব—তান্ত্রিক	এই জন্যই প্রবাদ আছে, বৈষ্ণব—তান্ত্রিক।
৯৭	১৭	বৈষ্ণব রস সাধনে	বৈষ্ণবরস সাধনার অনুকরণে।
৯৭	১৮	এই মতের	বৈষ্ণব রসতত্ত্বের।
৯৮	৫	"আচার"—ইহার পর ৭ম, লাইনের প্রারম্ভের "পরিদৃষ্ট হয়"—এই পদ বসিবে।	
১০৫	৬	ভক্তিপ্রতিভা-লে ববৈষ্ণব	ভক্তি-প্রতিভাবলে বৈষ্ণব।
১২৪	২৫	গীতীয়া	গীতায়া।
১২৯	৫	ধুমুরি ছিলেন	ধুমুরি কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন।
১৩০	২	অচ্যুতপ্রোচ্	অচ্যুতপ্রেক্ষ।
১৩১	১৮	মধ্ব দিগ্বজয়	মধ্ব-দিগ্বিজয়।
১৩৩	৯	বর্ণশ্রম	বর্ণাশ্রম।
১৪২	১	নৃবহরি	নৃহরি।
ঐ	ঐ	নহরির	নৃহরির।
১৬০	২৩	ক্রমে পরিপাটি	ক্রম-পরিপাটি।
১৬১	৭	কলন্তঃ	কলতঃ।
১৬৬	৭	প্রণবরক্ত	প্রণবযুক্ত।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১৭৫	১৫	চৈতলীলা	চৈতন্যলীলা।
২০৩	১	অশ্বথতরু	অশ্বথতরু, গো, বিপ্র ও।
ঐ	৭	নির্দ্দিন্য:তেতরাং	নির্দ্দিশ্যতেতরাং।
২১৭	১৫	মন্ত্রোপাসকান্নাং	মন্ত্রোপাসকানাং।
২২১	৮	তথোলব্যাঃ	তথোলুক্যাঃ।
২২২	১৯	মেদ্গল্য	মৌদ্গল্য।
২২৬	৬	ঝরিগণ	ঋষিগণ।
২৪৭	২১	যজ্ঞোস্ত্র	যজ্ঞসূত্র।
২৪৯	৫	উচ্চতে	উচ্যতে।
ঐ	৬	কথিত হইয়া হইয়া	কথিত হইয়া।
২৫২	৬	কল্পহরুকার	কল্পতরুকারঃ।
২৬৪	৮	ধ্রবমচরং	ধ্রুবমচরং।
২৬৮	২	সঙ্গ +	সঙ্গ—।
২৭০	১৭	চারণায়ঃ	চারণায়।
২৭২	২	প্রদান	প্রদর্শন।
২৭৯	৪	ইতিপূর্ব্বে	ইতঃপূর্ব্বে।
৩০৮	১৫	পিতামহ অভিহিত	অভিহিত।
৩১১	১৬	হইতেন	হইলেন।
ঐ	২৪	র্ব্বপূং	পূর্ব্বং।
৩১৩	১৩	অন্ন	অন্নদেবতাগণকেও।
৩১৩	৭	১৬৪০—	১৫৪০—।
৩৭৪	৫	পরি-বর্ত্তে	পরিবর্ত্তে।

ওঁ নমঃ ভগবতে [illegible]

বৈষ্ণব-[illegible]ক্তি।

বা

বৈষ্ণব-জাতীয় ইতিহাস।

———:o:———

প্রথম অংশ

বৈদিক প্রকরণ।

প্রথম উল্লাস।

স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে যে এক মহান্ ধর্ম্মমত ভারতের বক্ষে মধ্যাহ্ন-তপনের ন্যায় উদ্ভাসিত রহিয়াছে, সাধারণতঃ তাহা সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম নামে অভিহিত। এই বিশাল হিন্দুধর্ম্ম আবার বহু উপাসক-সম্প্রদায়ে বিভক্ত; তন্মধ্যে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ই প্রধান। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণবধর্ম্ম যে অনাদি-সিদ্ধ, অতি প্রাচীন এবং সম্পূর্ণ বৈদিক, শাস্ত্রে তাহার ভূরিভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই সংক্ষেপ আলোচনা করা যাইতেছে।

বিষ্ণু বৈদিক দেবতা, সুতরাং বিষ্ণু-উপাসনা যে বেদসিদ্ধ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ঋক্ সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদেই বিষ্ণু-উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয়। শ্রুতি-স্মৃতি- পুরাণাদি শাস্ত্রে যে পরতত্ত্ব পরমেশ্বরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানই বিষ্ণু। বিষ্ণু শব্দের ব্যুৎপত্তি। যথা—"বেবেষ্টি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং যঃ" অর্থাৎ যিনি বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছেন অথবা "বেষতি সিঞ্চতি আপ্যায়তে বিশ্বমিতি" অর্থাৎ বিশ্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন, তিনিই বিষ্ণু। কিম্বা "বিশতি বিযুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব শব্দের শাব্দিক ব্যুৎপত্তি।

সংসারাদিতি" অর্থাৎ মায়াপসারণ পূর্ব্বক যিনি ভক্তগণকে সংসার হইতে বিমুক্ত করেন, তিনিই বিষ্ণু। পরন্তু "বিশতি সর্ব্বভূতানি বিশন্তি সর্ব্বভূতানি অত্রেতি।"

যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ।
তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥"

ইতি বিষ্ণুপুরাণম্।

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে যিনি অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন এবং সর্ব্বভূতও যাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, তিনিই বিষ্ণু। এই জন্যই অগ্নি-পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"স এব সৃজ্যঃ স চ সর্গকর্ত্তা
স এব পাতা স চ পাল্যতে চ।
ব্রহ্মাদ্যবস্থাভিরশেষ মূর্ত্তি
বিষ্ণুর্বরিষ্ঠো বরদো বরেণ্যঃ॥

অর্থাৎ সেই বিষ্ণুই সৃজ্য, আবার তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পাল্য, তিনিই পালয়িতা, ব্রহ্মাদি নিখিল দেবতা তাঁহারই মূর্ত্তি; সুতরাং বিষ্ণুই বরিষ্ঠ, বিষ্ণুই বরদ, বিষ্ণুই বরেণ্য।

বৈষ্ণব শব্দের শাব্দিক ব্যুৎপত্তি, এই বিষ্ণু শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন। যথা—"বিষ্ণুর্দেবতা অস্য ইতি বৈষ্ণবঃ। সম্বন্ধার্থে ষ্ণঃ প্রত্যয়ঃ। দেবতেতি ইষ্টদেবত্বে প্রয়োগঃ অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।"

যিনি বিষ্ণুর সহিত সম্বন্ধবদ্ধ হইয়াছেন অর্থাৎ বিষ্ণুই যাঁহার উপাস্য দেবতা হইয়াছেন বা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, তিনিই বৈষ্ণব।

বেদ কি?

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব শব্দ বেদমূলক প্রতিপন্ন করিবার অগ্রে বেদ কি, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা আবশ্যক। যেমন আধার ব্যতীত কোন বস্তু থাকিতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মের আধারও গ্রন্থ। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের আধার বেদ। হিন্দু

ধর্ম্মের একটী মহান্ বিশেষত্ব এই যে, এই ধর্ম্ম প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় কোনও একজন মহাপুরুষ বা তদ্রচিত কোন মহাপুস্তকের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। এই সনাতন ধর্ম্মের আধার বেদ—অনাদি, অনন্ত অপৌরুষেয়—শ্রীভগবানের তনুস্বরূপ। বেদ কোন ঋষি-প্রণীত গ্রন্থ নহে কিম্বা মানব বুদ্ধির কল্পনা-কুসুম নহে—বেদ শ্রীভগবানের করুণামাখা সাক্ষাৎ অভয়বাণী। "বেদং ভগবদ্বাক্যং" ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। কল্কিপুরাণ বলিতেছেন—"বেদা হরের্বাক্।" অর্থাৎ বেদ সকল শ্রীভগবানের বাক্যস্বরূপ। মানব-সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত সমাহিত ঋষিদের হৃদয়ে শ্রীভগবানের এই বেদবাণী স্বতঃই স্ফুরিত হইয়া থাকে। এই জন্য ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের ঋষি ভিন্ন ভিন্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন। আবার বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে—

"স যথার্দ্রৈন্ধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথগ্ ধূমা
বিনিশ্চরন্তি এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য
নিঃশ্বসিত মেতৎ যৎ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ
অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ
শ্লোকঃ সূত্রাণি অনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানানি অস্য
এব এতানি সর্ব্বাণি নিঃশ্বসিতানি ॥ ১০ ॥"

হে মৈত্রেয়ি! যে প্রকার আর্দ্রকাষ্ঠে অগ্নিসংযোগ হইলে তাহা হইতে পৃথগ্ ভাবে ধূমরাশি নির্গত হয়, সেইরূপ পরমাত্মা হইতে ঋকবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, চতুর্দ্দশ বিদ্যা(১) উপনিষদ, সূত্রসমূহ, ব্যাখ্যা ও অনুব্যাখ্যা সকল নির্গত হইয়াছে। এই সমুদয় সেই পরমেশ্বরেরই নিঃশ্বসিত স্বরূপ।

(১) চতুর্দ্দশ বিদ্যা।—"অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্ম-শাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥" শিক্ষা ১, কল্প ২, ব্যাকরণ ৩, নিরুক্ত ৪, জ্যোতিষ ৫, ছন্দ ৬, ঋগ্বেদ ৭, যজুর্ব্বেদ ৮, সামবেদ ৯, অথর্ব্ব ১০, মীমাংসা ১১, ন্যায় ১২, ধর্ম্মশাস্ত্র ১৩, পুরাণ ১৪।

যে সময়ে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি অথর্ব্বা অরণি সংঘর্ষণ দ্বারা প্রথম অগ্নির উৎপাদন করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এবং তাঁহার পিতৃব্য মহর্ষি সূর্য্যদেব তাহাতে যোগদান করেন, তৎকালে সেই যজ্ঞের নিমিত্তই বেদ ও ছন্দ সকল আবির্ভূত হইয়াছিল। তাই স্বয়ং ঋগ্বেদই বলিয়াছেন—

" তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ১০ম, ৯০সূঃ ॥

অনেকেই বলিয়া থাকেন, ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের সৃষ্টি হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে। ব্রহ্মা বেদের স্মর্ত্তা অর্থাৎ স্মরণকর্ত্তা মাত্র। যেহেতু পরাশর বলিয়াছেন—

"ন কশ্চিৎ বেদকর্ত্তা চ বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ।"

এই জন্যই ব্রহ্মা বেদের বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন—

" ব্রহ্মণা বাচ্ সর্ব্বে বেদা মহীয়ন্তে।"

শ্রীভগবান্ এই আদি কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদকে প্রেরণ করিয়াছিলেন—

" তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে।" শ্রীভাগবত।

এ বিষয়ে শ্বেতাশ্বর শ্রুতি বলেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং

যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।

তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং

মুমুক্ষু র্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ৬অঃ, ৮।

যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট বেদসমূহ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই আত্মা ও বুদ্ধির প্রকাশক শ্রীভগবানের আমি—মুমুক্ষু শরণ লইতেছি।

এই বেদ সকল ভগবানের অঙ্গ। যথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে—

"তস্য যজুরেব শিরঃ ঋগ্‌ দক্ষিণঃ পক্ষঃ।

সামোত্তরং পক্ষঃ, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা॥ ৩ অঃ, ২।

যজুর্ব্বেদ সেই ভগবানের শির, ঋগ্বেদ দক্ষিণপক্ষ, সামবেদ উত্তর পক্ষ ও অথর্ব্ববেদ পুচ্ছ বা পশ্চাৎ ভাগ।

অতি প্রাচীন কালেও জড়-বিজ্ঞানবাদী এমন অনেক লোক ছিলেন, তাঁহারা বেদের এই নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব সম্বন্ধে তেমন আস্থাবান ছিলেন না। বায়ুপুরাণে লিখিত আছে—

"সন্তি বেদবিরোধেন কেচিদ্ বিজ্ঞানমানিনঃ।"

উত্তরকাণ্ড ১৬ অঃ, ৪৬।

সুতরাং বর্ত্তমান কালে বেদকে যে, "চাষার গান", বা ঋষিদের "মুখ গড়া" বলিয়া বেদের নিত্যত্ব ও অপৌরুষেয়ত্বকে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? কিন্তু ইহা বলাই বাহুল্য যে, ইহা সর্ব্ববিধ লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে সনাতন আর্য্য-সমাজে শ্রীভগবদ্বিগ্রহ স্বরূপে সমাদৃত ও পূজিত। জীব প্রাণের পিপাসা মিটাইবার জন্য যে শান্তি-সুধার আশায় জন্মে জন্মে ঘুরিয়া বেড়ায়, বেদ বা শ্রুতি জননীর ন্যায় সেই সর্ব্বানন্দদায়িনী শান্তি-সুধাধারা প্রদান করেন— প্রেমপুরুষার্থের পথ প্রদর্শন করেন। ইহাই বেদের মাহাত্ম্য— ইহাই বেদের বিশেষত্ব।

বেদের স্বরূপ।

বেদ মানবের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের ন্যায় অপূর্ণ বা ভ্রমসঙ্কুল নহে—চির অভ্রান্ত। এই ভগবন্মুখ-নিঃসৃত মঙ্গলময়ী উক্তি গুলি দেশকালাতীত পদার্থ, নিত্যই একরূপ। সমাহিত ঋষিদের হৃদয়ে ইহা ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আবির্ভূত না হইয়া একই রূপে পরিস্ফুরিত হয়, সুতরাং ইহা নিত্য। ইহা অনন্ত সাগরের লহরীলীলার ন্যায় নিরন্তর শব্দিত হইতেছে, গ্রহণ করিতে পারিলেই, উপলব্ধ হয়।

অধুনা, বেদ বলিলে যে চারিখানি বেদসংহিতাকে বুঝাইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহাই বেদের সীমা নহে। ঋষিগণ বেদকে অনন্ত অসীম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদের আজ প্রায় সবই বিলুপ্ত—বেদ-মহীরুহের এখন বহু শাখা-প্রশাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান আকারে আমরা যে সংহিতা গুলি দেখিতে পাই, উহা কতিপয় মন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। আবার এই সংগ্রহও যে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট বা শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে, তাহা অভিজ্ঞ বেদ-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব বেদের তথ্য- নির্দ্ধারণ যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। বেদই ব্রহ্ম নামে সংজ্ঞিত। সুতরাং বেদালোচনা ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার ন্যায় গভীর সাধনা সাপেক্ষ। এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া কত যে ধর্ম্ম-মতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই এবং ভবিষ্যতেও কত যে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? ভগবান্ হইতে প্রকাশিত আদি বেদ লক্ষ শ্লোকাত্মক ছিল। পরে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সেই চতুষ্পাদ বেদকে একীভূত হইতে দেখিয়া পুনরায় চারিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁহার বেদ-পারগ চারিজন শিষ্যকে চারিবেদ অর্পণ করেন। পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ, জৈমিনীকে সামবেদ ও সুমন্তকে অথর্ব্ববেদ প্রদান করেন। যজ্ঞের সময় ঋগ্বেদের দ্বারা হৌত্র কর্ম্ম, যজুর্ব্বেদের দ্বারা অধ্বর্য্যব-কর্ম্ম, সামবেদের দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদের দ্বারা মন্ত্রপরিদর্শন রূপ ব্রহ্মত্ব কর্ম্মের সংস্থাপন করেন। অনন্তর তিনি ঋক্ সমুদায় উদ্ধার করিয়া ঋগ্বেদ সংহিতা, যজুঃ সমুদায় উদ্ধার করিয়া যজুর্ব্বেদসংহিতা, গীতাত্মক সাম সমুদায় উদ্ধার করিয়া সামবেদ সংহিতা এবং যজ্ঞাদি পরিদর্শন-সূচক কর্ম্ম এবং শান্তি, ও পুষ্টি অভিচারাদি কর্ম্মসমুদায়ের প্রকরণ উদ্ধার করিয়া অথর্ব্ববেদ প্রণয়ন করেন। অতঃপর শিষ্য-প্রশিষ্য কর্ত্তৃক এই বেদচতুষ্টয় ক্রমশঃ বহুশাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বেদের বিভাগ।

মনীষিগণ এই বেদচতুষ্টয়ের মধ্যে ঋগ্বেদকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মের প্রথম অবস্থার ইতিহাস যেরূপভাবে ঋগ্বেদে সঙ্কলিত আছে, অন্য বৈদিক সংহিতায় সেরূপ দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা সাম ও যজুর্ব্বেদকে ঋগ্বেদের অনুচরস্বরূপ বলিয়াছেন। যথা কৌষীতকী ব্রাহ্মণে—

"তৎপরিচরণাবিতরৌ বেদৌ। ৬।১১॥"

আবার ঋগ্বেদভাষ্যের অনুক্রমণিকায় সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্রাধ্বর্য্যুণা
প্রয়োজ্যা ঋচো বহব আম্নাতাঃ। সাম্নান্তু
সর্ব্বেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বণিকৈ
রপি স্বকীয় সংহিতায়া মৃচএব বাহুল্যেন ধীয়ন্তে।"

অর্থাৎ যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত মন্ত্রকাণ্ডের মধ্যে বহুতর মন্ত্র, সামবেদের প্রায় সমুদায় মন্ত্র এবং অথর্ব্ববেদের অনেকাংশ ঋগ্বেদ-সংহিতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।

এই প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের বহুস্থানে বিষ্ণুর নাম ও তন্মহিমা ব্যঞ্জক মন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত বৈধ কর্ম্মের প্রারম্ভে যে মন্ত্রটী উচ্চারণ করিয়া আচমন করিতে হয়, উহা বিষ্ণুরই মহিমা প্রকাশক। যথা— "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্।

বিষ্ণু উপাসনা অবৈদিকী নহে।

ঋগ্বেদ ১।২।৭।২৫ এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদ ৬।৫। অর্থাৎ বিষ্ণুর সেই পরমপদকে জ্ঞানিজন সর্ব্বদা দিবালোকে উদিত সূর্য্যের ন্যায় দর্শন করেন; সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদ লাভ যে ব্রহ্মজ্ঞানের ন্যায় কাল্পনিক অনুভব মাত্র নয়, তাহা এই ঋক্ দ্বারা প্রমাণিত হইল। আকাশে সূর্য্যোদয় হইলে যেমন তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়, শ্রীবিষ্ণুস্বরূপকেও সেইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায়। বিষ্ণুর মহিমাব্যঞ্জক

কতিপয় ঋক্, ঋগ্বেদ হইতে এস্থলে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। তদ্‌যথা—

(১) "অতো দেবা অবন্তু নো যতো বিষ্ণুর্বিচক্রমে। পৃথিব্যাঃ সপ্ত-ধামভিঃ॥" ১ম, মঃ ২২ সূ; ১৬।

(২) ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা. নিদধে পদং। সমূঢ় মস্য-পাংশুরে॥ ঐ, ১৭।

(৩) ত্রিণি পদাঃ বিচক্রমে বিষ্ণুর্গোপা অদাভ্যঃ। অতো ধর্ম্মাণি ধারয়ন্॥ ঐ ১৮।

(৪) বিষ্ণো কর্ম্মাণি পশ্যতঃ যতো ব্রতানি পস্পশে। ইন্দ্রস্য যুজ্যঃ সখা॥ ঐ, ১৯।

(৫) তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগ্রিবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদং।" ঐ ২০। *

এই সকল পবিত্র ঋক্ মন্ত্রে যে সকল আর্য্য ঋষি বিষ্ণুর স্তব করিতেন বিষ্ণুর মহান্ মাহাত্ম্য মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেন, সেই ঋষিগণই প্রাচীন-তম বৈদিক বৈষ্ণব। এই বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে সকলেই যে বিষ্ণুর উদ্দেশে মাংসদ্বারা যজ্ঞ করিতেন—হবিঃ প্রদান করিতেন তাহা নহে, তন্মধ্যে এক শ্রেণীর উপাসক শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে বিষ্ণুর আরাধনা করিতেন। তাঁহারা কেবল আজ্য সমিধ সহযোগে বিষ্ণুর হোম করিতেন। বিষ্ণুর নামাদি শ্রবণ কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহারা জীব-বলিদান কি সোমপান করিতেন না। তাঁহাদের স্বর্গাদি ভোগ-সুখ-কামনাও ছিল না। তাঁহারাই "সাত্বত" নামে অভিহিত। আর যাহারা জীব-বলিদানাদি দ্বারা বিষ্ণুর

* এই সকল ঋক্ মন্ত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা মৎ-সম্পাদিত "বৈদিক বিষ্ণুস্তোত্রম্" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

উদ্দেশে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহাদিগকে যাজ্ঞিক বৈষ্ণব নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। ভোগ-সুখ-স্বর্গাদি যাজ্ঞিকগণের নিত্য বাঞ্ছনীয় ; কিন্তু শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ অর্থাৎ ভগবদ্দাস্য লাভ বৈষ্ণবগণের চরম লক্ষ্য। বৈদিককালে বিষ্ণু উপাসক বা বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাজ্ঞিক ও সাত্বত ভেদে যে দ্বিবিধ সম্প্রদায় ছিল, নিম্নলিখিত ঋক্‌টী আলোচনা করিলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা—

" যঃ পূর্ব্বায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি।

যো জাতমস্য মহতো মহিব্রুবং সেদু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥ ঋঃ ২।২।২৬

অর্থাৎ হে মানব! যিনি পূর্ব্বতন নানাবিধ জগতের কর্ত্তা এবং নিত্য নবরূপ ও স্বয়ং উৎপন্ন বিষ্ণুকে হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি সেই মহান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, তিনিও কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া একমাত্র গন্তব্য সেই বিষ্ণুর চরণ সমীপে গমন করেন।

ঋগ্বেদে অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম, বরুণ, রুদ্র, সরস্বতী প্রভৃতি দেবতার উপাসনা বিষয়ে যতগুলি ঋক্ ব্যবহৃত আছে বিষ্ণুর উপাসনা বিষয়ে তদপেক্ষা ন্যূন নাই। বরং কোন কোন দেবতা অপেক্ষা অধিক। এই বিষ্ণু ব্রহ্মবাদিদের মতে নিরাকার নির্ব্বিশেষ—এক ধারণাতীত বস্তু নহেন। বিষ্ণুর সবিশেষত্ব বেদে প্রতি পদেই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত ঋক্‌গুলি অনুশীলন করিলে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। সূর্য্য যেমন আলোকের কারণ তদ্রূপ চরাচর জগতে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্মরূপ চিৎসত্তার আশ্রয় স্বরূপ সবিশেষ ও সগুণ মূর্ত্তি শ্রীভগবান্ বিষ্ণু। বিষ্ণু যে ত্রিবিক্রমাবতার হইয়া বলীকে আবদ্ধ করিয়াছিলেন ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে " ইদং বিষ্ণু র্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং " এবং " ত্রিণি পদাঃ বিচক্রমে " ইত্যাদি মন্ত্রে তাহার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং অবতারবাদও যে বৈদিক, তাহা ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীত হয়। বিশেষতঃ অবতার সকলের মধ্যে দ্বিভুজ নরাকারে এই বামনাবতারই শ্রীভগবানের প্রথম অবতার। দ্বিভুজ-নরাকারত্বই তাঁহার নিত্যস্বরূপ।

বিষ্ণুর স্বরূপ ও অবতার। অন্যান্য বেদসংহিতাতেও বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(এই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুই যাঁহাদের বরেণ্য ও শরণ্য, প্রধানতঃ তাঁহারাই বৈষ্ণব ; সুতরাং বৈষ্ণবত্ব সামান্য সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। বিষ্ণুর স্বরূপ যেরূপ বিশ্বব্যাপক, সেইরূপ বৈষ্ণবত্বও সঙ্কীর্ণ নহে—বহুব্যাপক। ফলকথা যিনি বিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার করেন, সামান্যতঃ তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যায়। বিষ্ণুর অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তি ভক্তির সহায়তা ভিন্ন এই বৈষ্ণবত্ব লাভ সম্ভবপর নহে। এই জন্যই বৈষ্ণবের অপর নাম ভক্ত, এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের অপর নাম ভক্তিবাদ।) কিন্তু কাল-মাহাত্ম্যে অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের আচার দোষে এমন সনাতন বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্মটী সাধারণের চক্ষে কেমন হীন নিষ্প্রভ বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। এখন বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেই সাধারণের হৃদয়ে এক বিজাতীয় ঘৃণার ভাব উদয় হয়। তাহারা জানেনা, বৈষ্ণবের এই বৈষ্ণবত্ব আধুনিক নহে—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সময় প্রবর্ত্তিত নহে, ইহা নিত্য—অনাদিসিদ্ধ। হিন্দুর মহাগ্রন্থ বেদ যত দিনের বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্বও ততদিনের। শ্রুতির প্রত্যেক মন্ত্র, বিষ্ণুরই মহিমা দ্যোতক। প্রত্যেক প্রার্থনাতে ভক্তির মহীয়সী শক্তি বিনিহিত— প্রত্যেক ঋকে প্রেম-ভক্তির অমল ধারা ঝলকে ঝলকে উৎসারিত। বৈদিক বৈষ্ণব-ভক্তিতে তন্ময় হইয়া কেমন সুন্দর ভাবে বিষ্ণুর মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন দেখুন।

" বিষ্ণোর্নুকং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি।
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমাণ স্ত্রেধোরুগায়ঃ
বিষ্ণবে ত্বা ॥ শুক্ল যজুঃ ৫ম, অঃ।

যিনি পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি লোকস্থানসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন অথবা পার্থিব পঞ্চভূতাত্মক সৃষ্টির উপকরণস্বরূপ নিখিল অণু-পরমাণু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অলৌকিক কর্ম্মের মাহাত্ম্যনিচয়ই আমি কেবল কীর্ত্তন করিতেছি। সেই আরাধ্যতম বিষ্ণু, উপরিতন অতিশ্রেষ্ঠ দেবগণের সহবাসস্থান দ্যুলোককে—যাহাতে অধঃপতিত না হয়, এমনভাবে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে তিনি পৃথিবী, অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোক সৃষ্টি করিয়া অর্থাৎ " ভূর্ভুর্বস্বঃ "

নির্ম্মাণ করিয়া এই ত্রিলোকেই তিনি অগ্নি, বায়ু সূর্য্য, এই ত্রিবিধ স্বরূপে পদত্রয় স্থাপন করিয়া আছেন বা সর্ব্বব্যাপী " বরেণ্য ভর্গ " দেবতা রূপে বিচরণ করিতেছেন। এই বিশ্বব্যাপী গতির কারণই তাঁহাকে 'উরুগায়' বলা হইয়া থাকে। অথবা সাধু মহাত্মাগণ সর্ব্বদা তাঁহার মহিমা গান করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি 'উরুগায়' নামে অভিহিত। অতএব হে আমার হৃদয়নিহিতা ভক্তি! সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত আমি তোমাকে নিয়োজিত করিতেছি।"

আবার ঋগ্বেদ মন্ত্র-মাহাত্ম্যে মহর্ষি শৌনক কহিয়াছেন—

" বিষ্ণোর্নু কং " জপেৎ সূক্তং বিষ্ণু-ভক্তি ভবিষ্যতি।
জ্ঞানোদয়ং তপঃ পশ্চাদ্বিষ্ণু-সাযুজ্য মাপ্নুয়াৎ॥"

" বিষ্ণুর্নু কং " (১ম, ১৫৪সূ, ১—৬ ঋ) ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়, এবং জ্ঞান ও তপস্যা সিদ্ধ হয়, পরে বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্তি ঘটে।

অতএব কৃষ্ণভক্তি যে অবৈদিকী নহে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল।

এই হৃদয়-নিহিতা শুদ্ধাভক্তি ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত হইলে ভগবান্ অবশ্য প্রীত হইয়া থাকেন। কারণ ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র সাধনা ভক্তি। শ্রুতি বলেন—

" ভক্তিরেবৈনং নয়তি,
ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি,
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ,
ভক্তিরেব ভূয়সীতি।"

ভক্তিই জীবকে আনন্দময় ভগবদ্রাজ্যে লইয়া যান্, ভক্তিই শ্রীভগবানের চরণকমল দর্শন করাইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ ভক্তিরই বশীভূত, সুতরাং ভক্তিই শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠসাধন। শ্রীগোপালতাপনী বলেন—

" ভক্তিরস্যভজনং। বিজ্ঞানঘনানন্দ-সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ ভক্তিই ভগবানের জ্ঞান। সেই বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তিযোগেই অবস্থিত।

কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি অপেক্ষা ভক্তি দ্বারাই যে ভগবানের পরম সন্তোষ লাভ হয়, তাহা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ," "ভক্তিলভ্যস্তনন্যয়া' ভক্ত্যা মামভিজানাতি," অর্থাৎ আমি একমাত্র ভক্তিরই গ্রাহ্য, ভক্তিরই লভ্য, অন্য কোন সাধন দ্বারা নহে, ভক্তি দ্বারাই আমাকে অবগত হওয়া যায়. ইত্যাদি প্রমাণই উক্ত বাক্যের দৃঢ়তা প্রতিপন্ন করিতেছে। "বিষ্ণবে ত্বা" এই বেদবাক্যের অর্থ, পুরাণে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"সর্ব্বদেবময়ো বিষ্ণুঃ শরণার্ত্তি-প্রণাশনঃ।
স্বভক্তবৎসলো দেবো ভক্ত্যা তুষ্যতি নান্যথা॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বৃহন্নারদীয় বচনং।

অর্থাৎ যিনি শরণাগতজনের আর্ত্তি-বিনাশক ও স্বভক্ত-বৎসল সেই সর্ব্বদেবময় ভগবান্ বিষ্ণু কেবল ভক্তিতেই তুষ্ট হইয়া থাকেন। অন্য প্রকারে তাঁহার তুষ্টি ঘটে না।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে নৃসিংহস্তুতিতে বর্ণিত আছে—

"মন্যে ধনাভিজনরূপ তপঃ শ্রুতৌজ
স্তেজঃ প্রভাববলপৌরষবুদ্ধিযোগঃ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়॥"

অর্থাৎ, আমি অনুমান করি, অর্থ, সৎকুলে জন্ম, দেহের রূপ, তপোবল বা স্বধর্ম্মাচরণ, পাণ্ডিত্য, তেজ, ইন্দ্রিয়-পটুতা, প্রভাব, শারীরিক শক্তি, পৌরুষ (উদ্যম) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) ও অষ্টাঙ্গযোগ প্রভৃতি ইহারা কেহই যখন পরম পুরুষ ভগবানের ভজনেরই উপকরণ নহে, তখন, তাঁহার প্রীতি উৎপাদনে কিরূপে সমর্থ হইবে? যেহেতু ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই গজেন্দ্রের প্রতি এরূপ পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

অতএব ভগবান্ কাহারও গুণের দিকে লক্ষ্য না করিয়াও ভক্তিরই আদর করিয়া থাকেন। কেননা—

"ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিন্তৎ সুদাম্নো ধনম্।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ॥"

অর্থাৎ ব্যাধের কি আচার ছিল, ধ্রুবের এমন কি বয়স ছিল, গজেন্দ্রেরই বা কি বিদ্যা ছিল, কুব্জারই বা এমন কি রূপ-গৌরবের সুনাম ছিল, সুদামার ধন মর্য্যাদাই বা কি? বিদুরের বংশমর্য্যাদাই বা কি? (দাসীগর্ভজাত) যাদবপতি উগ্রসেনেরই বা পরাক্রমের কি পরিচয় ছিল? অতএব কর্ম্ম, বয়স, বিদ্যাদি গুণের দ্বারা ভগবান্ প্রীত হয়েন না, কেবল ভক্তি দ্বারাই পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। বাস্তবিকই এইজন্য তিনি ভক্তিপ্রিয় মাধব বলিয়া কীর্ত্তিত।

এই জন্যই বৈদিক বৈষ্ণব প্রথমে স্বীয় হৃদয়-নিহিতা ভক্তিকে ভগবানের সন্তোষের নিমিত্ত নিয়োজিত করিয়াছেন। ভক্তির প্রেরণায় ভগবান্ সন্তোষলাভ করিয়াছেন জানিয়া ভক্ত, ভগবানের নিকট প্রেমধন প্রার্থনা করিতেছেন।

পরিবর্ত্তী মন্ত্রে এই ভাবই পরিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

" দিবো বা বিষ্ণো উত বা পৃথিব্যা মহো বা
বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ।
উভা হি হস্তা বসুনা পৃণস্বাপ্রযচ্ছ
দক্ষিণাদোত সব্যাৎ
বিষ্ণবে ত্বা॥" শুঃ যজুঃ ৫।১৯

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! হে ভগবন্! আপনি দ্যুলোক হইতে কি ভূলোক হইতে কিম্বা অনন্ত-প্রসারী অন্তরিক্ষলোক হইতে পরম ধন বা প্রেম ধন লইয়া আপনার উভয় হস্ত পূর্ণ করুন এবং দক্ষিণ ও বাম হস্ত অর্থাৎ উভয় হস্ত দিয়াই অবাধে

অবিচারে আমাদিগকে সেই ধন প্রদান করুন। অথবা আপনার যে করুণা "ভূর্ভুব স্বঃ" এই ত্রিলোকে অনন্তধারায় উৎসারিত রহিয়াছে, সেই করুণাধারা আমাদের প্রতি বর্ষণ করিয়া আপনার প্রেমধনের অধিকারী করুন।" শুদ্ধাভক্তির উদয় না হইলে এই ভগবৎপ্রেমলাভ সুদূরপরাহত। তাই "হে আমার হৃদয়-নিহিতা শুদ্ধাভক্তি! তোমাকে ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি।"

(বিষ্ণুর দ্বিভুজ নরাকারতা সম্বন্ধে এই ঋক্‌ই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই দ্বিভুজ নরাকারই সেই জগৎকারণ পরতত্ত্বের নিত্যস্বরূপ। ভক্তি কেবল ভগবানের প্রেমধন লাভ করাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্ম পর্য্যন্ত লাভ করাইয়া দেন। ইহাই ভক্তির মহীয়সী শক্তি।) অব্যভিচারিণী ভক্তির প্রভাবেই ভগবানের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। বৈদিক বৈষ্ণব, ভক্তির সহায়তায় ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ অবগত হইয়াই যেন, এই পরবর্ত্তী মন্ত্রে বিষ্ণুর মহিমা গান করিতেছেন।

"প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ
কুচরো গিরিষ্ঠাঃ ॥
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি
ভুবনানি বিশ্বা ॥" ঐ ৫।২০

সেই অনন্তবীর্য্য অনন্ত মহিমাশালী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অসাধারণ বীরকর্ম্মা বলিয়া নিখিল লোক তাঁহার প্রকৃষ্টরূপে স্তব করিয়া থাকেন। সিংহ যেরূপ পশুদিগকে বিনাশ করে বলিয়া তাহাদের ভীতিজনক, সেইরূপ ভগবান্‌ও পাপাত্মগণের নিখিল পাপরাশি নষ্ট করিয়া বিনাশ করেন বলিয়া পাপাত্মগণের পক্ষে ভীতিজনক। অথবা তিনি ভক্তের হৃদয় নিহিত কুবাসনাদির সংশোধক এবং পাপী-অভক্তের পক্ষে দণ্ডদাতা বলিয়া ভীষণ। তিনি কুচর অর্থাৎ কু অর্থে পৃথিব্যাদি লোকত্রয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন। কিম্বা কু শব্দে জল বুঝায়। সুতরাং

প্রলয়কালে মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপে পৃথিবী ধারণ করিয়া সৃষ্টিরক্ষা করিয়া থাকেন। আবার তিনি গিরিষ্ঠা অর্থাৎ গিরিবৎ উন্নত লোকস্থায়ী অথবা গিরি অর্থাৎ মন্ত্রাদি-রূপ বাক্যে বা বেদবাণীতে সর্ব্বদা বিরাজিত—মন্ত্রাত্মক, কিম্বা গিরি শব্দে দেহ বুঝায়, সুতরাং অখিল জীবদেহে অন্তর্য্যামী রূপে নিত্য বিরাজমান। সেই ভগবান্ বিষ্ণুর অনন্তবিস্তার "ভূর্ভুবস্ব" এই তিনলোকে বিশ্বের ভূতজাত তাবৎ পদার্থই অবস্থিত রহিয়াছে। এই জন্যই বিষ্ণু নিখিল জীবের বরেণ্য ও শরণ্য, তিনিই আরাধ্য তত্ত্বের মূল।

এইরূপে ভক্তিবলে ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ ও মহিমা অবগত হইয়া ভগবানের স্তবকারী সেই বৈদিক ঋষি পরিশেষে ভক্তিদেবীর ও ভক্তের (বৈষ্ণবের) মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন—

"বিষ্ণো ররাট মসি। বিষ্ণোঃ শ্নপত্রে স্থঃ।
বিষ্ণোঃ স্যূরসি। বিষ্ণো ধ্রুবোঽসি।
বৈষ্ণবমসি। বিষ্ণবে ত্বা॥" ঐ ৫।২১

হে শুদ্ধা ভক্তি! তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর ললাট স্বরূপা*। অহেতুকী শুদ্ধা ভক্তি ভগবানের অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি বলিয়া এবং ভগবান্ এই ভক্তিরই একান্ত বশীভূত বলিয়া তাঁহার ললাটস্বরূপা বলা হইয়াছে অর্থাৎ এই শুদ্ধা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তারপর যেই তুমি জ্ঞান বা কর্ম্মাঙ্গভূতা হইয়া মিশ্রাভক্তিতে অপনীত হও অমনই জ্ঞান বা কর্ম্মের যোগে তোমরা উভয়ে ভগবান্ বিষ্ণুর "শ্নপত্রে" অর্থাৎ ওষ্ঠ-সন্ধিরূপে অবস্থিত কর। ওষ্ঠসন্ধি যেরূপ ভোগের ও বাক্যের যন্ত্র, সেইরূপ তুমিও কর্ম্মের যোগে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি হইয়া পুণ্যভোগের সহায়তা কর, এবং

*ভক্ত-মাহাত্ম্য ও ভক্তি তত্ত্বতঃ একই বলিয়া অনেক বৈষ্ণব-মহাত্মা "ললাটাদ্বৈষ্ণবো জাতঃ" অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর ললাট হইতে বৈষ্ণবের জন্ম এই কথা বলেন। তাঁহাদের উক্তি এই মন্ত্রের ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

জ্ঞানের যোগে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি হইয়া জ্ঞানীর শব্দ-ব্রহ্ম লাভের সহায়তা কর। হে শুদ্ধাভক্তি! তুমিই ভগবানের "স্যূঃ" অর্থাৎ গ্রন্থিরূপা হও—ভক্ত তোমার দ্বারাই ভগবান্‌কে বন্ধন করিয়া থাকেন। হে ভক্তি! তুমিই ভগবান্ বিষ্ণুর "ধ্রুব" অর্থাৎ নিত্য সত্যস্বরূপা হও। নিত্য সত্য ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বলিয়া তুমিও নিত্য সত্য স্বরূপা। আবার হে ভক্তি! তুমিই "বৈষ্ণব" অর্থাৎ ভক্তস্বরূপা হও। কারণ, ভক্তের মাহাত্ম্য ও ভক্তি পৃথক্ বস্তু নহে। এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই "শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে" পূজনীয় গোস্বামীপাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।—

"মাহাত্ম্যং যচ্চ ভগবদ্ভক্তানাং লিখিতং পুরা।
তদ্ভক্তেরপি বিজ্ঞেয়ং তেষাং ভক্ত্যেব তত্ত্বতঃ॥
১১শ, বি, ৩৬১ শ্লোকঃ।

অর্থাৎ ইতি পূর্ব্বে যে ভগবদ্ভক্ত মাহাত্ম্যের কথা লিখিত হইয়াছে তাহাকেই ভক্তির মাহাত্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ, ভক্তদিগের মাহাত্ম্য ও ভক্তি তত্ত্বতঃ একই প্রকার।

অতএব হে ভক্তি! তোমাকে বিষ্ণুর প্রীতির নিমিত্ত নিয়োজিত করিতেছি।

বিষ্ণু স্বতন্ত্র দেবতা।

আবার কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, আদিত্যকেই বিষ্ণু বলা হইয়াছে;—বিষ্ণু স্বতন্ত্র দেবতা নহেন। যে হেতু, দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে একটী বিষ্ণু নামে অভিহিত। কিন্তু যাঁহারা বৈদিক গ্রন্থ আলোচনা করেন, তাঁহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, বিষ্ণু ও সূর্য্য এক দেবতা নহেন বা বিষ্ণু, সূর্য্যের নামান্তর নহে। বৈদিক দেবতাগণের যে ত্রিবিধ বাসস্থান ভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা দৃষ্ট করিলে বিষ্ণু ও আদিত্যের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপন্ন হয়। বাসস্থান ভেদে বৈদিক দেবগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— দ্যুলোকবাসী, অন্তরিক্ষবাসী ও ভূলোকবাসী। দ্যুলোকবাসীর মধ্যে দ্যু, বরুণ, মিত্র, সূর্য্য, সাবিত্রী, পূষণ, বিষ্ণু,

বিবস্বৎ প্রভৃতি। এস্থলে বরুণ যেমন পূষণ হইতে পারেন না, সেইরূপ সূর্য্যও বিষ্ণু হইতে পারেন না। যেহেতু সকলেই পৃথক্ দেবতা।

বেদ বিভাগ-কর্ত্তা ভগবান্ কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বিষ্ণুকে সূর্য্য হইতে পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর শ্রীবিষ্ণুই যে সর্ব্বেশ্বর পরতত্ত্ব তাহা, মুক্তকণ্ঠে পরিব্যক্ত করিয়াছেন—

"জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপং দ্বিভুজং শ্যামসুন্দরং।"

আবার গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"যদাদিত্যগতং তেজস্তত্তেজো বিদ্ধিমামকাম্।" ১৫।১২।

অর্থাৎ আদিত্যের যে তেজ, সে তেজ আমার বলিয়াই জানিবে।

শ্রীবিষ্ণুর ধ্যানেও বিষ্ণু ও আাদত্যের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। যথা—

"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরিটী-
ধারী হিরণ্ময়বপুঃ ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥"

অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি কমলাসনে সন্নিবিষ্ট, কেয়ূর ও স্বর্ণকুণ্ডল-ভূষণে ভূষিত, শিরে মুকুট, গলে হার, এবং দুই হস্তে শঙ্খ, ও চক্র ধারণ করিয়াছেন, সেই হেমময়বপু নারায়ণকে ধ্যান করি।

সুতরাং প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে যে, শুদ্ধসত্ত্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর বিষ্ণুর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ঋগ্বেদে এই বিষ্ণুর ধাম মাধুর্য্যময় বর্ণিত আছে। নিম্নলিখিত ঋকে তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

বিষ্ণুর ধাম মাধুর্য্যময়।

যথা—

"তদস্য প্রিয়মভিপাথো অশ্যাং নরো দেব যত্র মদো মদন্তি
উরুক্রমস্য স হি বন্ধুরিত্থা বিষ্ণোঃ পদে পরমে মধ্বা উৎসঃ ॥
তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যৈ যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ
অত্রাহ তদুরুগায়স্য বৃষ্ণঃ পরমং পদমবভাতি ভূরিঃ ॥"

২।২।২৪।৫-৬

সেই পরমধামে যে মাধুর্য্যের অমৃত-উৎস নিরন্তর উৎসারিত এবং মাধুর্য্য-মূর্ত্তি গোপবেশ বিষ্ণুই যে সেই ধামে নিত্য অবস্থান করিতেছেন, তাহা উক্ত ঋকের অর্থে অবগত হওয়া যায়। শ্রীবৃন্দাবনের অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনই যে এই গোপবেশ বিষ্ণু, তাহা ধীর চিত্তে বিচার করিলে অনায়াসেই উপলব্ধ হয়।

এই গোপাল বিষ্ণুর নাম ঋগ্বেদ ৩য়, মণ্ডলে ৫৫ সূক্তে উক্ত হইয়াছে—

"বিষ্ণুর্গোপাঃ পরমং পাতি পাথঃ
প্রিয়া ধামান্যমৃতা দধানঃ ॥* ১০ম্ ঋক্।

* এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা মৎ-সম্পাদিত "মন্ত্র-ভাগবত" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীমদ্‌গোবিন্দ সূরির পুত্র শ্রীমৎনীলকণ্ঠ সূরি ভট্ট "মন্ত্র-ভাগবত" (১) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে রামকৃষ্ণ বিষয়ক মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সেই সকল মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ-লীলা পরিস্ফুট করা হইয়াছে। ফলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত যে বৈদিক সন্দর্ভ, বৈদিক মন্ত্রেও যে শ্রীরামলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলার বীজ নিহিত আছে, এই গ্রন্থে তাহা মন্ত্র-প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গ্রন্থকার যে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, বৈদিককালে সকল দেবতাই যে তুল্যরূপে উপাসিত হইতেন

(১) "মন্ত্র-ভাগবত"—ঋগ্বেদীয় মন্ত্র, ভাষ্য এবং বঙ্গানুবাদ সহ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ টাকা। "শ্রীভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

তাহা বলা যায় না। যে হেতু, দেবতাগণের উত্তমাধমত্ব বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। বেদের দুইটী ভাগ; মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। বেদ বলিলে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। এই ব্রাহ্মণ ভাগে অরণ্যে ও নগরে বাস কালে যজ্ঞাদি, জীবনের যাবতীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে মন্ত্রভাগের কিরূপ প্রয়োগ করিতে হয় তাহার বিবরণ এবং তদুপলক্ষে ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান ও অনুব্যাখ্যান্ রূপ অষ্টবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদীয়—"ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" বৈদিক দেবগণের মধ্যে বিষ্ণুকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। যথা—

বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম দেবতা।

"অগ্নির্দেবানামবমো বিষ্ণুঃ পরমঃ তদন্তরেণ সর্ব্বা অন্যা দেবতাঃ।" ১।১

"অর্থাৎ অগ্নি অবম, বিষ্ণু পরম, ইহারই অন্তরে অন্য সমস্ত দেবতা। অবম ও পরম এই দুইটী শব্দের অর্থ যথাক্রমে ছোট ও বড় ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। অর্থাৎ অগ্নিই কনিষ্ঠ, বিষ্ণুই সর্ব্বোত্তম এবং অন্য সমস্ত দেবতা যখন ইহার অন্তর্গত তখন তাঁহাদিগকে মধ্যম বলা যাইতে পারে। ফলতঃ অগ্নি হইতেই সমস্ত দেবতার পূজা আরম্ভ হইয়া বিষ্ণুতেই তাহার পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতা সম্পাদিত হয়; সুতরাং এক বিষ্ণু আরাধনাতেই সমস্ত দেবতার আরাধনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং বিষ্ণুউপাসনাই বৈদিক মুখ্য বিধান। অন্য-দেবোপাসনা কেবল কর্ম্মাঙ্গভূত। এই জন্যই যাঁহারা কেবল বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁহাদের অন্য-দেবোপাসনা আর প্রয়োজন হয় না। উক্ত "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" এবিষয়ে প্রমাণ লক্ষিত হয়। যথা—

"বিষ্ণু সর্ব্বাঃ দেবতাঃ।" ঐ।ঐ

অর্থাৎ বিষ্ণুই সকল দেবতার মূল। উহাতে আরও বর্ণিত আছে—

"অগ্নিশ্চ বৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ।" ১।১

অর্থাৎ অগ্নি ও বিষ্ণুই দেবতাগণের দীক্ষার পালক।

এইরূপ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় "শতপথ-ব্রাহ্মণে"ও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে। তদ্ যথা—

"তদ্‌বিষ্ণুঃ প্রথমং প্রাপ্য স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ
তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠ ইতি।" ১৪।১।১।৫

অতএব এই সকল বৈদিক সিদ্ধান্তে বিষ্ণুই যে সমস্ত দেবগণের মধ্যে পরম অর্থাৎ সর্ব্বোত্তম তাহা প্রতিপন্ন হইল। সুতরাং তদেতর কোন দেবতাকেই তাঁহার সমতুল্য কল্পনা করা যাইতে পারে না। করিলে, তাহা বেদ-বিরুদ্ধ হেতু অপরাধের কারণ হয়। এই শ্রৌত-বাক্যানুসারেই পৌরাণিকগণ ঘোষণা করিয়াছেন—

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবং॥" হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ১।৭

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নারায়ণ বিষ্ণুকে ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতার সহিত সমান জ্ঞান করে, সে পাষণ্ড নামে অভিহিত।

উল্লিখিত শ্রুতি-বাক্যে এক্ষণে এই মীমাংসিত হইল যে, (বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত ধর্ম্ম এবং বিষ্ণু ও বৈষ্ণব শব্দও সম্পূর্ণ বেদ-মূলক।) বেদের প্রাচীন সংহিতা ভাগে যে বিষ্ণু ও বিষ্ণু-উপাসনার উল্লেখ আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সেই বিষ্ণুর উপাসক মাত্রেই যে বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইতে পারেন, ইহা সহজেই অনুমিত হয়। তথাপি বৈদিকগ্রন্থে 'বৈষ্ণব' শব্দের যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণু র্বৈ যজ্ঞ স্বয়মেবৈনং
তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দসা সমর্দ্ধয়তি॥" ১।৩।৪

বৈষ্ণব শব্দ বৈদিক।

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত। যজ্ঞই বিষ্ণুর নাম। সেই বিষ্ণু স্বয়ংয়ের স্বয়ং; তিনি স্বয়ংই স্বাধীনভাবে সেই পুরুষের (যিনি দীক্ষা লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাঁহার) বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

বেদে পুরুষ-বিশেষণরূপে কেবল 'বৈষ্ণব' শব্দ দেখা যায়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য কিম্বা স্মার্ত্ত আদি শব্দ পুরুষ-বিশেষণরূপে বেদে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বৈষ্ণবত্বই বৈদিক মুখ্য বিধান। স্বয়ং বেদই বৈদিক দেবতাগণের মধ্যে বিষ্ণুকে সর্ব্বোত্তম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইজন্য বেদার্থ-প্রতিপাদক পুরাণে ও ইতিহাসে সেই বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর সমুজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি এবং উপাসনার উপাদেয় সুপ্রণালী বিশদরূপে প্রকটিত আছে। সেই সঙ্গে তদুপাসক বৈষ্ণবের মহিমাও ভূরিশঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদ-বেদান্তে, তন্ত্রে, মন্ত্রে সর্ব্বত্রই সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্মের বিমল-উৎস উৎসারিত আছে। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্ম যে অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বেদার্থ-নির্ণয়ের নিয়ম।

অনেকে বেদে কর্ম্মাঙ্গভূত রুদ্রাদি দেবগণের মন্ত্র দেখিয়া রুদ্রাদির সাম্প্রদায়িক উপাসনাকেও বৈদিক বলিয়া মনে করেন; কিন্তু বেদার্থ নির্ণয়ের নিয়ম তাঁহারা অবগত নহেন। বেদের ছয়টী বিভাগ। শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা। বেদের এই ছয়টী বিভাগের মধ্যে অর্থ-বিপ্রকর্ষ হেতু পর-দৌর্ব্বল্যই নিয়ম। এই বিভাগ সকলের লক্ষণ ও বাধ্যবাধকতা-জ্ঞান ভিন্ন বেদার্থ-নির্ণয় সহজ-সাধ্য নহে। "জৈমিনিসূত্রে" লিখিত আছে—

"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পরদৌর্ব্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ।"

উক্ত সূত্রানুসারে বুঝা যাইতেছে, শ্রুতির বাধক কিছুই নাই। শ্রুতিই সর্ব্বপ্রধান, নিরপেক্ষ ও সর্ব্ববাধক। "নাম মাত্রেণ নির্দ্দেশঃ শ্রুতিঃ" অর্থাৎ নাম মাত্রে নির্দ্দেশের নামই শ্রুতি; ইহাই শ্রুতির লক্ষণ। এই বিভাগ-নির্দ্দেশ অনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত "বৈষ্ণবো ভবতি" ইত্যাদি বৈদিক বাক্যটী শ্রুতি ও নিরপেক্ষ বলিয়াই সিদ্ধান্তিত হইবে। সুতরাং বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পরন্তু বেদের ষড়্বিধ বিভাগ, লক্ষণ ও তাহার বাধ্য-বাধকতা সম্বন্ধ না জানিয়া বেদমন্ত্র মাত্র দেখিলেই বুঝিতে হইবে

যে, ইহাই প্রমাণ ও এতৎ-প্রতিপাদ্য বস্তু উপাস্য, তাহা কদাচ সুধীজনের অনুমোদিত হইতে পারে না। ফলতঃ শ্রুতি-প্রতিপাদ্য বৈষ্ণবতত্ত্বই যে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য—বৈষ্ণবতত্ত্বই যে মানবজীবনের চরম পরিণতি, নিরপেক্ষ-বিচারপরায়ণ বিজ্ঞমণ্ডলেরই স্বীকার্য্য।

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের আবার দুইটী বিভাগ আছে। যথা ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক। সমস্ত উপনিষদ্ এই ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক বিভাগের অন্তর্গত। এই জন্যই উপনিষদ্ ভাগকে বেদের অন্তিম ভাগ বলা হইয়া থাকে। এই উপনিষদেই বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের মীমাংসা আছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ অপৌরুষেয়, ইহার অপর নাম শ্রুতি।

উপনিষদে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত।

সুতরাং ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক ভাগের অন্তর্গত উপনিষদও শ্রুতি নামে অভিহিত। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাধান্য এই উপনিষদ্ ভাগেও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সংহিতার কাল হইতে এই উপনিষদ্ প্রচারের কাল পর্য্যন্ত যে বিষ্ণু-উপাসনা অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে তাহা এতদ্দ্বারা পরিসূচিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত আছে—

"বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥" ৬।৪।২১

তৈত্তিরীয়োপনিষদে—

"ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণঃ। শন্নো ভবত্বর্য্যমা। শন্ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শন্নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।" ১।১২।১

আবার কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—

"বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥" ৩।৯

অর্থাৎ বিজ্ঞান যাহার সারথিস্বরূপ এবং মন প্রগ্রহ (অশ্বাদির লাগাম) স্বরূপ সে ব্যক্তি অধ্বার পার বিষ্ণুর পরমপদকে লাভ করে। বিষ্ণুর পরমপদ

লাভই সে জ্ঞানের চরম সীমা লাভ, তাহা ' অধ্বার পার ' বাক্যে পরিস্ফুট হইয়াছে। বিষ্ণুর পরমপদ লাভ যে ব্রহ্মসমাধির ন্যায় কল্পিত অনুভব মাত্র নয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। উপনিষদ্ বিভাগের সময় জ্ঞাননিষ্ঠ ঋষিগণ ভগবজ্জ্যোতি-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই যে কেবল অনুসন্ধান করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা সেই ব্রহ্মজ্যোতির আশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ দর্শনের নিমিত্তও অহরহ চেষ্টিত ছিলেন। এই বিষ্ণু দর্শনের সাধন এইরূপ নির্ণীত আছে। যথা—

" আয়ম্য তদ্ভাগবতেন চেতসা।"

আথর্ব্বণ উপনিষদ্, ৪র্থ খণ্ড।

অর্থাৎ ভগবৎ-প্রবণ চিত্ত দ্বারাই সেই বিষ্ণু-দর্শন আয়ত্ত। এই ভগবৎ-প্রবণতাই 'ভক্তি' নামে অভিহিতা। বেদের সংহিতা ভাগে কোন মন্ত্রে ভক্তি শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি শাসনের অতীত এক স্বাভাবিকী চিদ্বৃত্তিময়ী উপাসনা প্রণালী দ্বারা যে শ্রীভগবানের উপাসনা বিহিত ছিল তাহা উক্ত শ্রুতি প্রমাণে সুপ্রতীত হয়। " ভগবৎ-প্রবণ চিত্ত" এই বাক্যে শ্রীভগবৎ শরণাপত্তির ভাবই পরিব্যক্ত হয়। এই শরণাপত্তি বা অনুরক্তির নামই ভক্তি। মহর্ষি শাণ্ডিল্য ভক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"ভক্তিঃ পরাণুরক্তিরীশ্বরে" অর্থাৎ ভগবানে পরম অনুরাগের নামই ভক্তি। এই ভক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপ-শক্তি বিশেষাত্মিকা বলিয়া শ্রীভগবানের কৃপা-সাপেক্ষ। যেহেতু শ্রীভগবৎ-কৃপা ভিন্ন শ্রীভগবৎ-প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।

বেদে ভক্তিতত্ত্ব।

শ্রুতি বলেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা
শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ ॥

কঠোপনিষৎ। ১।২।২৩

এই আত্মাকে অর্থাৎ বিষ্ণুকে প্রবচন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কি বুদ্ধি দ্বারা

কি বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ দ্বারাও নয়, কিন্তু যাঁহাকে তিনি কৃপা করেন তিনিই তাঁহাকে পাইতে পারেন।

এই বিশদ বৈদিক সিদ্ধান্তের নামই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। শুদ্ধ-সত্ত্ব ঋষিগণ সাত্ত্বিক-ভাবে শ্রীভগবানে চিত্ত সমর্পণ করিয়া তদীয় নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে তাঁহার উপাসনা করিতেন, এই সকল শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। অথর্ব্বশির উপনিষদ্ বলেন—

"বিষ্ণু দেবত্যা [illegible] যস্তাং ধ্যায়তে নিত্যং
স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্।" ৫।

আবার মৈত্রায়ণ্যুপনিষদ্ বলেন—

"হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাভিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় বিষ্ণবে॥" ৬।৩৫

শ্রুতি-প্রতিপাদ্য অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্বও যে শ্রীবিষ্ণুরই আশ্রিততত্ত্ব এবং সেই শ্রীবিষ্ণুই যে দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণোপনিষদে তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত আছে—

"ব্রহ্মণ্যো দেবকীপুত্রো ব্রহ্মণ্যো মধুসূদনঃ।
ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মণ্যো বিষ্ণুরুচ্যতে॥" ৫।

শ্রীবৃন্দাবনে নন্দপত্নী যশোদার একটী নাম "দেবকী" বলিয়া কথিত আছে, সুতরাং এই শ্রুত্যুক্ত 'দেবকীপুত্র' বাক্য সেই যশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই যে নির্দ্দেশ করিতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

বিষ্ণুর লক্ষণ।

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

"অথৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায় উক্ত্বা উবাচ।"

অর্থাৎ অনন্তর আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামক ঋষি দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন। আবার বিষ্ণুই যে রুদ্র স্বরূপ তাহা "নমো রুদ্রায় বিষ্ণবে মৃত্যুর্ম্মে পাহি।"—এই বাক্যে প্রমাণিত হইল। এই বিষ্ণুর লক্ষণ শ্রুতি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা নৃসিংহতাপন্যুপনিষদে—২।৪

" অথ কস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি যঃ সর্ব্বাল্লোঁকান্ ব্যাপ্নোতি ব্যাপয়তি স্নেহো যথা পললপিণ্ড মোতপ্রোত মনু প্রাপ্তং ব্যতিষক্তে ব্যাপ্যতে ব্যাপয়তে। যস্মান্ন জাতঃ পরোঽন্যোঽস্তি য আবিবেশ ভুবনানি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবিদান স্ত্রীণি জ্যোতিংষি সচতে স ষোড়শীতি তস্মাদুচ্যতে মহাবিষ্ণুমিতি।"
ফলতঃ যিনি নিখিল জগতে অন্তর্যামীরূপে অনুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নিয়ম করিতেছেন, সেই সর্ব্বব্যাপক পরতত্ত্বই বিষ্ণু নামে অভিহিত। জগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুও বিষ্ণু হইতে পৃথক্ নহে। শ্রীভগবান্ স্বীয় স্বরূপ-শক্তিতে অচিন্ত্য-তর্কৈশ্বর্য্য-মহিমবলে বিশ্ব-ব্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও প্রপঞ্চে তাঁহার বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রকটিত করেন। নৃসিংহতাপনী শ্রুতি বলেন—

" তুরীয়মতুরীয়মাত্মানমনাত্মানমুগ্রমনুগ্রং
বীরমবীরং মহান্তমমহান্তং বিষ্ণুমবিষ্ণুং
জ্বলন্তমজ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখমসর্ব্বতোমুখমিত্যাদি।" ৬

শ্রীভগবানের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য একবারেই অচিন্ত্য। তিনি বিভু হইয়াও পরিচ্ছিন্ন, পরিচ্ছিন্ন হইয়াও বিভু। তবে তাঁহার বিজ্ঞানময় আনন্দঘনত্বই স্বরূপ মূর্ত্তি। ক্রমবৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্যই শ্রুতি শ্রীভগবানের "সচ্চিদানন্দ" নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ অগ্রে সৎ, তৎপরে চিৎ, অবশেষে আনন্দ এইরূপ পদ-বিন্যাস করিয়াছেন। (এই আনন্দঘন-স্বরূপ শ্রীভগবানই বৈষ্ণব-দর্শন মতে ভক্তগণের পরম উপাস্য-তত্ত্ব।) সচ্চিদানন্দৈক রসস্বরূপিণী ভক্তিই তাঁহার সাধন। গোপালতাপনী শ্রুতি বলেন—

" ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যে
নৈবামুস্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।"

অর্থাৎ ভক্তিই ইহার ভজন। তাহা কিরূপ? ইহলোক ও পরলোক-সম্বন্ধীয় কামনা নিরাসপূর্ব্বক এই কৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের যে অর্পণ অর্থাৎ প্রেম তদ্দ্বারা তন্ময়ত্ব হওয়া, এইটীই ইহার ভজন—এইটীই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ কর্ম্মাতিরিক্ত জ্ঞান।

বৈদিকভাষায় অনেক স্থলে উপাসনাকেও জ্ঞান বলা হইয়াছে। বেদান্তসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার বৌধায়ন বলেন—

" বেদন মুপাসনং স্যাত্তদ্বিষয়ে শ্রবণাৎ !"

অর্থাৎ উপাসনাই জ্ঞান, যেহেতু তদ্বিষয়ে বহু শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তিই বিষ্ণুর সাধন।

এই জ্ঞান বা উপাসনার চরম তত্ত্বই বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই পরাভক্তি নামে অভিহিত। এই পরাভক্তি-প্রভাবেই ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে দর্শন করিয়া থাকেন। যথা শ্রুতি—

" তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" মণ্ডুকে ২।২।৭

গোপালতাপনী শ্রুতি তাই মুক্তকণ্ঠে ভক্তির জয় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

" ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি
ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি বিজ্ঞানানন্দ-
ঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি।"

অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ধামে লইয়া যান, ভগবানের চরণ দর্শন করান, শ্রীভগবান্ ভক্তিতেই বশীভূত, ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন। বিজ্ঞানানন্দ-ঘন শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দৈকরসরূপিণী ভক্তিযোগে অবস্থিত।

অতএব বৈদিককালেও ভগবদ্ভক্ত ঋষিগণ কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপরিচর এই বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি দ্বারা যে ভগবানের ভজনা করিতেন তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতি-প্রমাণে অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে। যথা—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১১শঃ, বিঃ ধৃত শ্রুতি—

" ওঁ আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে।" ঋগ্বেদ ২ অষ্টক, ২অঃ ২৬সূ।

অর্থাৎ হে বিষ্ণো! যে সকল ব্যক্তি তোমার এই বিষ্ণু নামের অনন্তাদ্ভুত মাহাত্ম্য অবগত হইয়া বা বিচার করিয়া উহাই সতত উচ্চারণ করেন, তাঁহাদের ভজনাদি নিয়মের কোনও অন্যথা হয় না। কারণ, নামোচ্চারণে দেশ-কাল-পাত্রের বৈষম্য নাই। নামই মহঃ অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশক, পরমানন্দ ও ব্রহ্ম-স্বরূপ, সুমতি অর্থাৎ সুজ্ঞেয়, আত্মস্বরূপাদিবৎ দুর্জ্ঞেয় নহে। অথবা (সু—শোভনা মতি—বিদ্যারূপ) সাধ্যসাধনাত্মিকা শোভনা বিদ্যারূপ সেই নামকেই আমরা ভজনা করি।

ভজ ধাতু হইতেই ভক্তি শব্দের উৎপত্তি। নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভজনাই ভক্তির সাধন। শ্রুতি আরও বলেন—

"ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আন্নমৃক্তম্। নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়াস্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।" ঐ।ঐ।

অর্থাৎ হে পরমপূজ্য! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার নমস্কার করি। যেহেতু তোমার ঐ শ্রীচরণ-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্তজন যশঃ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে। অন্য কথা কি, যাঁহারা ঐ শ্রীপাদ-পদ্ম নির্ব্বাচনের জন্য বাদবিতণ্ডা করিয়া থাকেন এবং পরস্পর কীর্ত্তনে উহার অবধারণ করিয়া থাকেন, সেই ভক্তগণের হৃদয়ে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে তাঁহারা সাক্ষাতের জন্য চৈতন্য-স্বরূপ আপনার নামকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন।

শ্রুতি আরও বলেন—

"ওঁ তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথাবিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।

আস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবিক্তন মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥" ঐ।ঐ

অহো! সেই পুরাতন, বেদের তাৎপর্য্য-গোচর ব্রহ্মের সারভূত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে তোমরা যেমন জান, সেইরূপ কীর্ত্তন করিয়া জীবন সার্থক কর। কিন্তু আমরা তাহা পারিতেছি না। অতএব হে বিষ্ণো! আমরা যখন তোমার স্তব বা কীর্ত্তন কিরূপে করিতে হয় জানি না, তখন তোমার নামকেই ভজনা করি। নিরবচ্ছিন্ন নাম করাই আমাদের নিত্য কার্য্য।

এই যে বিশুদ্ধা শ্রবণকীর্ত্তনাদিময়ী উপাসনা ইহা ভক্তিবাদেরই অন্তর্গত। সর্ব্বব্যাপী বিশাল বৈষ্ণবধর্ম্ম এই ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত— ভক্তিবাদই বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাণ। জ্ঞানের চরম ফল যে মোক্ষ, সেই মোক্ষেও ভক্তির অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়। ব্রহ্ম-সূত্রকার বলেন—

ভক্তিতত্ত্ব মোক্ষেরও উপরিচর।

"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টমিতি।" ৪।১।১২

কোন কোন শ্রুতিতে মুক্তি পর্য্যন্তই উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার কোন কোন শ্রুতিতে উহার পরেও উপাসনার উপদেশ পরিদৃষ্ট হয়। অতএব সংশয় হইতে পারে, উপাসনার ফল যখন মুক্তি, তখন মুক্তি পর্য্যন্তই উপাসনার কর্ত্তব্যতা স্বীকৃত হউক। ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—"আপ্রায়ণাৎ মোক্ষাৎ তত্রাপি মোক্ষে চ ভক্তিরনুবর্ত্তত ইতি।"

মোক্ষ পর্য্যন্ত তো উপাসনা করিতেই হইবে, আবার তাহার পরও উপাসনার কর্ত্তব্যতা আছে। কারণ, শ্রুতি বলেন—

"সর্ব্বদৈন মুপাসীত যাবদ্বিমুক্তি। মুক্তা অপি হেন মুপাসত ইতি।" সৌপর্ণোপনিষদ্।

অর্থাৎ তাবৎ সর্ব্বদা উপাসনা কর, যাবৎ বিমুক্তি না হয়। মুক্তির পরেও এই যে বিমুক্তি, ইহাই পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম। ইহাই পরাভক্তির ফল। অতএব মুক্ত-পুরুষগণও এই প্রেম লাভের জন্য সর্ব্বদা উপাসনা করিবেন। এই শ্রৌত-প্রমাণে মুক্তির পরেও যে উপাসনার কর্ত্তব্যতা আছে তাহা পরিব্যক্ত হইল। মুক্ত ব্যক্তিগণ ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, বিধি-নিষেধের অতীত হইলেও শ্রীভগবানের অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদিতে সমাকৃষ্ট হইয়া উপাসনাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পিত্ত-দগ্ধ ব্যক্তির শর্করা ভোজনে পিত্ত নাশ হইলেও যেরূপ শর্করা ভক্ষণে প্রবৃত্তি দেখা যায়, তদ্রূপ ভগবদুপাসনারও নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

(অতএব ঔপনিষদ্ জ্ঞান যেমন জ্ঞানরূপ ব্রহ্মের সাধন, সাধন ভক্তিও তেমনি প্রেমরূপ ভগবদ্ভক্তির সাধন। জ্ঞান যেমন বৈদিক কাল হইতে ব্রহ্ম সাধনার সম্বল, ভক্তিও সেইরূপ বৈদিক কাল হইতে শ্রীভগবানের সাধন-সম্বল) বৈদিক মন্ত্রগুলি ভক্তিময়ী উপাসনার সুস্পষ্ট উচ্ছ্বাস। বৈদিক উপাসনায় ভক্তিরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। উপাসনা ভক্তিরই পর্য্যায়। শ্রীরামানুজ-ভাষ্যে কথিত আছে—

"ধ্রুবানুস্মৃতিরেব ভক্তিশব্দেনাভিধীয়তে।
উপাসন পর্য্যায়ত্বাদ্ভক্তি শব্দস্য॥"

এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যাহা বেদন (জ্ঞান) তাহাই উপাসন। উপাসন পুনঃপুনঃ অনুষ্ঠিত হইলেই ধ্রুবানুস্মৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এই ধ্রুবানুস্মৃতিই ভক্তি। সুতরাং জ্ঞান এই ভক্তিরই অন্তর্গত। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" ৬।২৩

(অতএব যে ভক্তিবাদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, সেই ভক্তিবাদও যে সম্পূর্ণ বৈদিক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।)

সে যাহা হউক এক্ষণে অনেকেই এই আপত্তি করিতে পারেন যে, বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব যুক্ত বা অযুক্ত? কারণ বেদসমূহে প্রায়ই কর্ম্মের বিধান দর্শনে বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব অযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। বৃষ্টি, পুত্র ও স্বর্গাদি প্রাপ্তির নিমিত্ত কারীরী, পুত্রেষ্টি ও জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সমুদায়ই কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে, বিষ্ণুর প্রাধান্য ব্যক্ত হয় নাই। তবে যে বিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল যজ্ঞের অঙ্গভূত দেবতারূপই জানিতে হইবে।—এরূপ পূর্ব্বপক্ষ কদাচ সঙ্গত বোধ হয় না। বিষ্ণুর সর্ব্ববেদবেদ্যত্বই যুক্ত। কারণ, সুবিচারিত উপক্রম-উপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গ দ্বারা বেদের

বিষ্ণু যজ্ঞাঙ্গভূত দেবতা নহেন।

তাৎপর্য্য, ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়। শ্রুতি বলেন—

" যোঽসৌ সর্ব্বৈ র্বেদৈর্গীয়ত "। ইতি গোপাল তাপন্যুপনিষদে।

" সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তীতি "—কঠবল্লী। ২।১৫.

" অর্থাৎ যিনি সকল বেদে গীত হয়েন," এবং " সকল বেদ যাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকে " ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্য গুলিই বেদে বিষ্ণুর প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

" বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।" ১৫।১৫

অর্থাৎ সকল বেদ কেবল আমার বিষয়ই বলিয়া থাকেন—আমিই বেদান্ত-কর্ত্তা ও বেদবেত্তা।

মহাভারতেও উক্ত হইয়াছে—

" সর্ব্বে বেদাঃ সর্ব্ববিদ্যাঃ সর্ব্বশাস্ত্রাঃ

সর্ব্বোযজ্ঞাঃ সর্ব্বে ইজগ্যাশ্চ কৃষ্ণঃ।"

বেদান্তের প্রধান ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেন—

" কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ।

ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদকশ্চন॥

মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহং।" ১১।২১।৪২

কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্য দ্বারা কি ব্যক্ত হয় দেবতাকাণ্ডে মন্ত্র-বাক্য দ্বারা কি ব্যক্ত হয় এবং জ্ঞানকাণ্ডে কি উক্ত হয় তাহা আর কেহই জানে না, আমিই জানি। বেদ সকল আমাকেই যজ্ঞরূপে বলিয়া থাকে আমাকেই দেবতারূপে প্রকাশ করিয়া থাকে এবং অমাকেই প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্ এবং প্রপঞ্চকে আমারই স্বরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকে। অতএব আমিই সর্ব্বস্বরূপ।" আবার সাক্ষাৎ পরম্পরা ভাবে বেদসকল তাঁহাতেই (ব্রহ্মেই) প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের স্বরূপ-গুণ নিরূপণের দ্বারা বেদের জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এবং জ্ঞানাঙ্গভূত কর্ম্ম

প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গাদি-ফলদায়ক কর্ম্ম সকল জীব-রুচি উৎপাদনের নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে। বৃষ্ট্যাদি ফল দর্শনে রুচি উৎপন্ন হইলে সে ব্যক্তি যাহাতে বেদার্থ বিচার পূর্ব্বক নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক দ্বারা সংসারে বিতৃষ্ণ ও ব্রহ্মপর হন, ইহাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বৈদিক কর্ম্ম সকল কাম্যফল-বিধায়ক হইলেও, কি জ্ঞানোদয়ের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইলেও উহারা চিত্তশুদ্ধি রূপ ফলও প্রদান করিয়া থাকে। ইন্দ্রাদি দেবতা সকল ভগবানেরই শক্তি, এবং তাঁহারা কর্ম্মাঙ্গরূপেই বেদে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। অতএব যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্রাদি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্ম লাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ স্পষ্টই বলিয়াছেন—

বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত।

" যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকং॥" ৯।২৩

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্য দেবতাগণের ভজনা করিয়া থাকে তাহারা অবিধি পূর্ব্বক আমারই ভজনা করিয়া থাকে।

সুতরাং ভগবৎশক্তিভূত ইন্দ্রাদি দেবতার অর্চ্চনে গৌণ ভাবে শ্রীভগবানেরই অর্চ্চনা সিদ্ধ হয় এবং তদ্দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি রূপ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এস্থলে আরও সংশয় হইতে পারে যে, শ্রুত্যুক্ত রুদ্রাদি শব্দ শিবাদি দেবতা বিশেষেরই বাচক অথবা উহারা ব্রহ্মবস্তুকেই বোধ করাইতেছে কিম্বা ঐ সকল শব্দ দেবতা বিশেষেই প্রসিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকেই বুঝাইতেছে? এরূপ আশঙ্কা কদাচ সঙ্গত বোধ হয়না। যেহেতু হয়াদি সকল শব্দ ব্রহ্মপররূপেই নির্ণীত হইয়াছে। সকল নাম তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। শ্রুতি বলেন—

" নামানি বিশ্বানি ন সন্তি লোকে যদাবিরাসীৎ
পুরুষস্য সর্ব্বং। নামানি সর্ব্বানি যথা বিষন্তি

তং বৈ বিষ্ণুং পরমমুদাহরন্তীতি।" ভাল্লবেয়শ্রুতি।

(অর্থাৎ এই বিশ্ব বা নাম কিছুই ছিলনা; সকলই সেই পরমপুরুষ ভগবান হইতে আবিভূর্ত হইয়াছে, সমস্ত নামও যাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট তিনিই বিষ্ণু নামে অভিহিত। তাই পুরাণ সকলও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। যথা ব্রহ্মাণ্ডে—

"কৃত্তিবাসস্ততো দেবো বিরিঞ্চিশ্চ বিরেচনাৎ।
বৃংহনাদ্ ব্রহ্মনামাসাবৈশ্বর্য্যাদিন্দ্র উচ্যতে॥
এবং নানাবিধৈঃ শব্দৈরেক এব ত্রিবিক্রমঃ।
বেদেষু চ পুরাণেষু গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥"

পুনশ্চ স্কান্দে—

"ঋতে নারায়ণাদিনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।
প্রাদাদন্যত্র ভগবান্ রাজবৎ ত্র্যম্বকং পুরং॥"

পুনশ্চ ব্রাহ্মে—

"চতুর্ম্মুখঃ শতানন্দো ব্রহ্মণঃ পদ্মভূরিতি।
উগ্রো ভস্মধরো নগ্নঃ কাপালীতি শিবস্য চ॥
বিশেষ নামানি দদৌ স্বকীয়ান্যপি কেশবঃ॥"

ফলতঃ বেদ-পুরণাদিতে নানাবিধ শব্দ দ্বারা সেই এক ত্রিবিক্রম বিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ স্বয়ং, হরি-নারায়ণাদি ভিন্ন হরাদি নাম ঐ শিবাদি দেবতাকে প্রদান করিয়াছেন। এস্থলে এইমাত্র নিয়ম জানিতে হইবে যে, যেস্থলে ঐসকল নাম অন্যকে বোধ করাইলেও কোন বিরোধ হয় না, সেই স্থলে অন্যান্তের অপ্রাধান্য এবং যে স্থলে বিরোধ হয় সেইস্থলে উহারা অন্যকে বোধ না করাইয়া বিষ্ণুকেই বোধ করাইবে।

আরও কূর্ম্মপুরাণ, ৪র্থ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে। যথা—

"আদিত্বাদাদিদেবোঽসাবজাতত্বাদজঃ স্মৃতঃ।
দেবেষু চ মহাদেবো মহাদেব ইতি স্মৃতঃ॥

পাতি যস্মাৎ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাপতিরিতি স্মৃতঃ।
বৃহত্ত্বাচ্চ স্মৃতো ব্রহ্মা পরত্বাৎ পরমেশ্বরঃ॥
বশিত্বাদপ্যবশ্যত্বাদীশ্বরঃ পরিভাষিতঃ।
ঋষিঃ সর্ব্বত্রগত্বেন হরিঃ সর্ব্বহরো যতঃ॥
অনুৎপাদাচ্চাপূর্ব্বত্বাৎ স্বয়ম্ভূরিতি স স্মৃতঃ।
নরাণাময়নং যস্মাৎ তস্মান্নারায়ণো স্মৃতঃ॥
হরঃ সংসার-হরণাদ্ বিভুত্বাদ্বিষ্ণুরুচ্যতে।
ভগবান্ সর্ব্ববিজ্ঞানাদবনাদোমিতি স্মৃতঃ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিজ্ঞানাৎ সর্ব্ব সর্ব্বময়ো যতঃ।
শিবঃ স্যান্নির্ম্মলো যস্মাদ্বিভুঃ সর্ব্বগতো যতঃ॥
তারণাৎ সর্ব্বদুঃখানাং তারকঃ পরিগীয়তে।
বহুনাত্র কিমুক্তেন সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥"

অর্থাৎ সেই বিষ্ণু সকলের আদি বলিয়া তাঁহাকে আদিদেব কহে, এবং অজত্ব হেতু তাঁহার একটী নাম অজ। দেবতাগণের মধ্যে তিনি মহাদেব অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া তিনি মহাদেব নামে অভিহিত। প্রজাসকল অর্থাৎ নিখিল জীব-জগৎ তাঁহা হইতে রক্ষিত বা পালিত হয় বলিয়া তাঁহার নাম প্রজাপতি। বৃহত্ব হেতুই তিনি ব্রহ্মা এবং পরত্ব হেতুই তিনি পরমেশ্বর নামে উক্ত। বশিত্বাদি-সিদ্ধিতে তিনি বশীভূত হন না বলিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর কহে। সর্ব্বত্রগামী বলিয়াই ঋষি এবং সর্ব্বহর বলিয়াই তাঁহার নাম হরি। নরের অয়ণ অর্থাৎ আশ্রয় হেতুই তাঁহার নাম নারায়ণ। সংসার হরণ হেতুই হর এবং বিভুত্ব বা সর্ব্বব্যাপকতার নিমিত্তই বিষ্ণু নামে কীর্ত্তিত। সর্ব্ববিজ্ঞান হেতু তিনি ভগবান্ ও অবন হেতু ওম্ নামে অভিহিত। ফলতঃ তিনিই সর্ব্বজ্ঞ, শিব, বিভু এবং সর্ব্বদুঃখ-বিনাশের কারণ তারক নামে কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং এস্থলে আর অধিক উল্লেখের প্রয়োজন নাই, নিখিল জগৎই বিষ্ণুময় বলিয়া জানিবে।

অতএব জগৎ সংসারে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয় সকলই বিষ্ণুময়—সকলই সেই আনন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের আনন্দ লীলার মধুর প্রতিচ্ছবি। তাই শ্রুতি বলেন—

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" ছান্দোগ্য ৩।১৩।১

আবার গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।" ১০।৪২।

সুতরাং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে বৈষ্ণব-জগৎ নামে অভিহিত তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্র-কেই স্বীকার করিতে হইবে। কি শৈব, কি শাক্ত, কি সৌর এমন কোন শাস্ত্রই নাই যাহা বৈষ্ণব শাস্ত্রের অনুগামী নহে। অন্যান্য শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিলে অনুমিত হইবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার—বৈষ্ণব ধর্ম্মই সকল ধর্ম্মের আশ্রয়, বৈষ্ণবধর্ম্ম জগতের সকল ধর্ম্ম মতকে সামঞ্জস্য ভাবে ক্রোড়ে লইয়া উদারতা ও মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। যাহারা ভ্রমান্ধ তাহারাই অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত বৈষ্ণব শাস্ত্রের ভেদ জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবী মায়ায় আত্মবঞ্চিত হইয়া থাকে মাত্র। রুদ্রযামলে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে—

"ন শাস্ত্রং বৈষ্ণবাদন্যন্নদেবঃ কেশবাৎপরঃ।" রুদ্রযামলে, উত্তর খণ্ডে।

এইজন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল মহিমা সকল শাস্ত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে বিঘোষিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা ভাগে যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম ধারা দৃষ্ট হয়, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ ভাগে কিঞ্চিৎ প্রবলতা প্রাপ্ত হইয়া বেদান্তে তাহা পুষ্টকায়া তরঙ্গিণীতে পরিণত হইয়াছে, পরে গীতা, ভাগবত, পুরাণ পঞ্চরাত্রাদিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অনন্ত-বিস্তার মহাসাগরে পরিণত হইয়াছে। এই বিশ্বপ্লাবী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিষয় বিবৃত করিতে হইলে একটী স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ হইয়া যাইবে। সুতরাং এস্থলে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক।

দ্বিতীয় উল্লাস।

—:o:—

বৈদিক কালে শুদ্ধসত্ত্বঋষিগণ কর্ত্তৃকই যে সনাতন বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বেদ বিপুল জলধির ন্যায় অনন্ত-বিস্তার ও অতল গভীর। এই বেদ-মহাসমুদ্রে কত প্রকার যে সাধনতত্ত্ব-নিধি নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? বেদে কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি অধিকারী দিগের জন্য বহুবিধ বিধি সন্নিবেশিত থাকায় তন্মধ্য হইতে শুদ্ধ ভক্তদিগের উপযোগী উপদেশরত্ন সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। শব্দের সহজার্থ যে শক্তি দ্বারা উপলব্ধ হয় তাহাকে অভিধা কহে। বেদ শাস্ত্রে সেই অভিধা দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাহাই গ্রাহ্য। সমস্ত বেদ ও বেদান্ত বিচার করিলে দেখা যায় ভগবদ্ভক্তিই বেদ শাস্ত্রের অভিধেয়। জ্ঞান কর্ম্ম যোগাদি অভিধেয়ের অবান্তর সম্বন্ধ, মুখ্য সম্বন্ধ নহে। (যে সাত্ত্বিকভাবাপন্ন ঋষিগণ যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিহার করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি-ময়ী ভগবদ্ভক্তির সাহায্যে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতেন তাঁহারা সাত্বত নামে অভিহিত। এই সাত্বত সম্প্রদায়ই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্ত্তক) একই ব্যক্তির দ্বারা সমান অনুরাগে সকল দেবতার উপাসনা অসম্ভব। এই জন্যই উপাসকের স্বস্ব প্রকৃতি ও রুচি অনুসারে একনিষ্ঠ সাম্প্রদায়িক উপাসনার উৎপত্তি। ইহারই ফলে বৈদিক কালে যাজ্ঞিক-সম্প্রদায় ও সাত্বত-সম্প্রদায় এই দুইটী বিভাগ দৃষ্ট হয়। তবে বৈদিক কাল হইতেই যে পঞ্চ-উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে তাহা নিঃসংশয়রূপে স্বীকার করা যায় না। বৈষ্ণবধর্ম্ম-সম্প্রদায়-অভ্যুদয়ের অনেক পরবর্ত্তী কালে যে সৌর-শাক্তাদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে তাহার বহুল প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। বেদার্থই বৈষ্ণবধর্ম্ম। পুরাকালে সমস্ত বেদার্থই ভগব-তত্ত্বময়রূপে পরিগৃহীত হইত। এই ভগবৎ-জ্ঞানমূলক ভক্তিময় বেদার্থ, ক্রমে

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

কামনা-কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই কর্ম্মকাণ্ড রূপে প্রবর্ত্তিত হয়। এ বিষয়ে শ্রৌত-প্রমাণও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা মুণ্ডকে—

"তদেতৎ সত্যং মন্ত্রেষু কর্ম্মাণি কবয়ো
যান্যপশ্যং স্তানি ত্রেতায়াম্ বহুধা সন্ততানি।" ১।২।১

অর্থাৎ ইহা সত্য যে, কবিগণ বৈদিক মন্ত্রসমূহে যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক কর্ম্ম দৃষ্ট করিয়াছিলেন তাহা ত্রেতাযুগে বহু প্রকারে বিস্তৃত হইল অর্থাৎ সেই ভক্তিময় জ্ঞানের দৌর্ব্বল্যে কর্ম্মানুষ্ঠানই বেদার্থরূপে পরিকল্পিত হইল।

বেদমূলক পুরাণও এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন—

"নারায়ণাৎ বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃত যুগে স্থিতম্।
কিঞ্চিৎ তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥"

অর্থাৎ সত্য যুগে শ্রীভগবান্ হইতে বিনিষ্পন্ন জ্ঞান অবিকৃত ভাবে অবস্থিত ছিল। ত্রেতাযুগে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথা ভাব হয় অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তিময় বেদের অর্থ কর্ম্মময় প্রতীতি হয়। এই সময়েই বিরুদ্ধ দর্শন-শাস্ত্র সকলের সৃষ্টি হইয়াছে।

পুরাণের সৃষ্টি।

অবশেষে দ্বাপরযুগে কামনা-কলুষিত জীবগণের হৃদয় এরূপ দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, উহারা বিশুদ্ধ বেদার্থময় জ্ঞানকে কোন প্রকারেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইল না। ক্রমেই জ্ঞানের বিনাশে অজ্ঞানের উদয় হইতে লাগিল। এই সময়েই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদের শাখাবিভাগ করিলেন এবং সেই বিপুল বেদের অর্থ বিনির্ণয়ের নিমিত্ত উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তদর্শন প্রণয়ন করিলেন। অনন্তর সেই অজ্ঞান-তিমিরাবৃত জন সমাজকে পুনরায় ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্ত এবং বেদ উপনিষদ্ ও স্মৃতি শাস্ত্রের উচ্চ উপদেশ সকল সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত সরল সংস্কৃত ভাষায় পুরাণ সমূহের রচনা করিলেন। এইজন্য বেদোক্ত দেবদেবীর ন্যায় আরও অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পূজাবিধি পুরাণে পরিকল্পিত হইয়াছে। শ্রীভগবানের যে অনন্ত শক্তি অনন্ত-প্রভাব এই ব্যক্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

প্রত্যেক অণু পরমাণুতে ওতঃপ্রোত ভাবে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে, সেই শক্তির এক একটী বিকাশকেই এক একটী দেবতা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এইরূপে বেদোক্ত ত্রেত্রিশটী দেবতা, পুরাণে ত্রেত্রিশকোটী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

" সদারা বিবুধাঃ সর্ব্বে স্বানাং স্বানাং গণৈঃ সহ।
ত্রৈলোক্যে তে ত্রয়স্ত্রিংশৎ কোটিসংখ্যা তয়াভবন্॥" পদ্মপুরাণ।

কালপ্রভাবে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ও সামর্থ্য অনুসারে ঐ সকল দেবতার আখ্যায়িকা ও অর্চ্চনবিধি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়াছে। উল্লিখিত পুরাণ সকল যে বেদেরই অঙ্গবিশেষ—পৌরাণিক সিদ্ধান্ত যে সম্পূর্ণ শ্রুতিমূলক তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়।

পুরাণ বেদের অঙ্গ।

" বেদো নামালৌকিকঃ শব্দঃ"—অর্থাৎ অলৌকিক শব্দের নামই বেদ। বর্ত্তমান কালে সেই বেদার্থ-নির্ণয় অত্যন্ত দুরূহ বলিয়াই বেদার্থ বিচারস্থলে ইতিহাস-পুরাণাত্মক শব্দই অবলম্বনীয়। এই শব্দ সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ এবং বেদার্থনির্ণায়ক। তাই শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে—

" ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ॥"

অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারাই বেদকে স্পষ্ট করিতে বা বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। বেদার্থকে পূরণ করে বলিয়াই ইহার নাম পুরাণ। তাই "তত্ত্বসন্দর্ভে" লিখিত হইয়াছে—

" পূরণাৎ পুরাণম্ ন চাবেদেন বেদস্য বৃংহণং
সম্ভবতি, ন হ্যপরিপূর্ণস্য কনকবলয়স্য ত্রপুণ পূরণং যুজ্যতে।"

বেদ ভিন্ন বেদের পূরণ সম্ভব হয় না। অপূর্ণ কনক-বলয়কে কি সীসক দ্বারা পূরণ করা যায়? যদিও সীসক দ্বারা স্বর্ণবলয়ের অবকাশ অংশ পূরণ হইতে পারে কিন্তু তাহাতে স্বর্ণাংশের পূরণ হইল একথা কে স্বীকার করিবে? অতএব স্বর্ণ-বলয়ের অভাব পূরণে যেমন স্বর্ণই সমর্থ, সেইরূপ অপৌরুষেয় বেদার্থ পূরণে পুরাণই সমর্থ বলিয়া পুরাণেরও বেদত্ব সিদ্ধ হইল।

• বেদবিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস আরও বলিয়াছেন—

"একতশ্চতুরে বেদান্ ভারতশ্চ তদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদা প্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ মহাভারত মুচ্যতে॥"

অর্থাৎ পুরাকালে দেবতাগণ সমবেত হইয়া তুলাদণ্ডের এক দিকে চারিবেদ এবং অপর দিকে ভারতপুরাণ স্থাপন পূর্ব্বক ধারণ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সরহস্য চারিবেদ অপেক্ষা ভারতই অধিক ভারবিশিষ্ট। তদবধি ভারত গ্রন্থ 'মহাভারত' নামে আখ্যাত হয়। এই জন্যই লিখিত হইয়াছে—

"যো বিদ্যাচ্চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদঃ দ্বিজ।
ন চাখ্যান মিদং বিদ্যাৎ নৈব স স্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাঙ্গ চারিবেদ ও উপনিষদ্ পাঠ করিয়াও এই ইতিহাস পাঠ না করেন, তাহাকে কদাচ বিচক্ষণ বলা যায় না।

ভবিষ্য পুরাণও বলিয়াছেন—

"কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমং বেদং যন্মহাভারতং স্মৃতং।"

অর্থাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-কথিত যে মহাভারত তাহাকে পঞ্চম বেদ বলা হয়।

আবার বেদান্তের অকৃত্রিমভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের বেদোৎপত্তি-প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—

"ইতিহাস পুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরং।
সর্ব্বেভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ॥" ৩।১২।৩৯

এই ইতিহাস ও পুরাণ সকলও পঞ্চম বেদ। এই সকলও তাঁহার বদন হইতে আবির্ভূত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের আরও বহুস্থলে ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষাৎ বেদস্বরূপ উক্ত হইয়াছে।

যথা—

" ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারত পঞ্চমান্॥"

সংখ্যাবাচক শব্দ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। এস্থলে ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চমবেদ বলায় উভয়েরই বেদত্ব সিদ্ধ হইল। বেদ যাহা সংক্ষেপে বা অস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন ইতিহাস ও পুরাণ তাহাই সুবিস্তর ও সুস্পষ্টভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। বেদের ঋগাদি ভাগে উদাত্ত প্রভৃতি স্বরভেদে উচ্চারণের বিধিবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। পুরাণেতিহাস পাঠে তাহার কোন বিশেষ বিধান না থাকায় উভয়ের মধ্যে ভেদ সূচিত হইয়াছে। সমস্ত নিগম-কল্পলতার সৎফল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নামে যেমন জাতি-নির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে সেইরূপ এই পুরাণেতিহাস বেদের অঙ্গবিশেষ হইলেও ইহাতে সকলেরই অধিকার আছে। পুরাণও ইতিহাস অপৌরুষত্ব বিষয়ে যে ঋগাদির তুল্য, বৈদিক সাহিত্যেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা মাধ্যন্দিন শ্রুতি—

" অরেঽস্য মহতোভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্
ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস-
ইতিহাসঃ পুরাণমিত্যাদি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২।৪।১০)

অর্থাৎ ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদআঙ্গিরস, ইতিহাস ও পুরাণ এই সকল পরমেশ্বরের নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আবার ছান্দোগ্যোপনিষদেও কথিত হইয়াছে—

" স হোবাচ ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং
সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাস পুরাণং পঞ্চমং
বেদানাং বেদমিত্যাদি।" ৭।১।২

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়ে—

" যদ্ ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্
নারাশংসীর্মেদাহুতয়ঃ।"

পুনশ্চ শতপথব্রাহ্মণ, অশ্বমেধ প্রকরণে—

"অথ নবমেঽহন্ তানুপদিশতি পুরাণং বেদঃ।

সোঽয়মিতি কিঞ্চিৎ পুরাণমাচক্ষীতৈবমেবাধ্বর্য্যুঃ সম্প্রেষ্যতি।"

পুনশ্চ অথর্ববেদীয় গোপথ-ব্রাহ্মণে—

"ইমে সর্ব্বে বেদাঃ নির্ম্মিতাঃ-সকল্পাঃ

সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ

সেতিহাসাঃ সান্বাখ্যানাঃ স পুরাণা ইত্যাদি।"

এই সকল শ্রৌত-প্রমাণ দ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে, পুরাণ ও ইতিহাস বেদেরই অঙ্গবিশেষ। সুতরাং যাঁহারা উপন্যাসের কল্পনা-কুসুম বলিয়া পৌরাণিক সিদ্ধান্তকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, তাঁহারা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পৌরাণিক উপাসনার কাল হইতেই সাম্প্রদায়িক উপাসকের সৃষ্টি হইয়াছে। তন্মধ্যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যে সকলের আদি এবং সম্পূর্ণ বৈদিক তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

অন্যান্য উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।

বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবার পরবর্ত্তীকালে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সৌর, শাক্ত, গাণপত্যাদি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বেদে সূর্য্য, গণেশাদি দেবতার নামযুক্ত মন্ত্র দৃষ্ট হইলেই বুঝিতে হইবে যে সৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রদায়ও বৈদিক কাল হইতে প্রবর্ত্তিত, তাহা কদাপি স্বীকার করা যায় না। শুক্ল যজুর্ব্বেদে—

"গণনাং ত্বা গণপতি হবামহে প্রিয়ানাং ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে"—২৩।১৯। এই যে একটী মন্ত্র আছে, ইহাকে অনেকে গাণপত্য সম্প্রদায়ের মূল সূত্র বলিয়া মনে করেন। বস্তুতঃ তাহা নহে; সত্যযুগে এই মন্ত্র ভগবৎ-স্তব স্বরূপ ছিল; ত্রেতায় এই মন্ত্র অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্বাভিধানী গ্রহণে বিনিযুক্ত হয়, পরে দ্বাপরে এই মন্ত্র স্মার্ত্তকর্ম্মে গণেশ পূজায় বিনিযুক্ত হইয়াছে। আবার ঋগ্বেদের ২য় মণ্ডলে, ২৩ সূক্তে—২।৬।১৯, "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে, কবিং কবীনামুপমশ্রব

সন্তমমিত্যাদি " যে ঋক্ টী পরিদৃষ্ট হয়, ইহাও শ্রীভগবানেরই স্তুতিবাচক। সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপরে যে সৌর-গাণপত্যাদি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

উপাসনা প্রণালীতেও দেখিতে পাওয়া যায়, সর্ব্ববিধ বৈধকর্ম্মের প্রারম্ভে " ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদমিত্যাদি " বৈদিক বিষ্ণুমন্ত্রে আচমন করিয়া পরে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিতে হয়। সূর্য্যার্ঘ্যের পরই গণেশ পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, সর্ব্বাগ্রে বিষ্ণু-উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, পরে সূর্য্যোপাসনা, তৎপরে গণেশ উপাসনা বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহার বহু পরে শৈব ও শাক্তসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম্মের প্রাবল্যে বেদোক্ত সনাতনধর্ম্ম যে সময় নষ্ট-শ্রী ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িক উপাসনার উৎপত্তি। সে যাহা হউক, এই সময় হইতেই যে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় আরম্ভ হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতার ফলেই প্রথম " শাক্তধর্ম্ম " পরে এই শাক্তধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইয়াই " স্মার্ত্তধর্ম্ম " হইয়াছে।

তৃতীয় উল্লাস।

—:০:—

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিযোগী স্মার্ত্তধর্ম্ম।

সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, "স্মার্ত্ত" শব্দ কোন্ সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। বৈদিক সময়ে কোথাও "স্মার্ত্ত" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। যেহেতু বেদের কোন স্থানে ধর্ম্মের বিশেষণরূপে "স্মার্ত্ত" শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের কোনস্থানে "স্মার্ত্ত" শব্দ এমন ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কি?—যাহার অর্থ "স্মার্ত্ত ধর্ম্ম" বুঝাইয়া থাকে কিম্বা স্মার্ত্তধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে বুঝাইয়া থাকে?—তবে কোন কোন স্থানে কর্ম্মের বিশেষণরূপে "স্মার্ত্ত" শব্দের উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায় বটে; যথা—"স্মার্ত্তবদাজ্য সংস্কারঃ", "স্মার্ত্তযজ্ঞোপবীতঃ", "স্মার্ত্তপ্রায়শ্চিত্তঃ" ইত্যাদি। এই সকল "স্মার্ত্ত" শব্দের কেবল গৃহ্যসূত্রোক্ত কর্ম্মের তাৎপর্য্য সূচিত হয়—আজকালকার অভিনব স্মার্ত্তধর্ম্মের তাৎপর্য্য প্রকাশ পায় না। আজকাল যাহা স্মার্ত্তধর্ম্ম নামে পরিচিত, উহা কেবল শ্রুতি-প্রতিপাদিত নহে, উহাতে তন্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের মত মিশ্রিত আছে।

আবার বেদের কোথাও "মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি" স্মৃতির নামোল্লেখ দেখা যায় না। তবে কল্পগ্রন্থে গৃহ্যকর্ম্মের বিষয়ে স্মার্ত্তশব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি উহা স্মৃতির বাচক হইতে পারে? "মূলং নাস্তি কুতঃ শাখা"? যখন বেদের সময়ে স্মৃতির প্রচলনই ছিল না, তখন বেদে স্মার্ত্তধর্ম্মের উল্লেখ কিরূপে সম্ভব হইবে? তাণ্ড মহাব্রাহ্মণ, ২৪ অধ্যায়, ১৬শ খণ্ডের এক স্থানে লিখিত আছে—

"যদ্বৈ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্ভেষজম্।"

এই বাক্যোক্ত ' মনু ' শব্দের অর্থ আধুনিক কোন কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিত স্বায়ম্ভুব মনু ' করিয়া লইয়াছেন এবং ' অবদৎ ' পদের অর্থ ' কহিয়াছিলেন '— সুতরাং মনু কি কহিয়াছিলেন ?—' মনুস্মৃতি '। অতএব তাঁহাদের মতে বেদে মনুস্মৃতির ইহাই প্রমাণ হইয়া গেল। যদি " তুষ্যতু দুর্জ্জনো ন্যায়েন "—উক্ত প্রকারে মনুস্মৃতিকে বেদ-প্রতিপাদিত বলিয়া মানিয়াই লওয়া যায়, তাহা হইলে সেই মনুস্মৃত্যুক্ত পঞ্চদেবোপাসনার বিধান (যাহা হইতে স্মার্ত্ত হওয়া যায়) কোথায় ? কোথায় রুদ্রাক্ষ ? কোথায় ভস্ম ? কোথায় তির্য্যক্ পুণ্ড্র ? মনুস্মৃতিতে এ সকল ব্যবহারের বিধান ত পরিদৃষ্ট হয় না ?

বেদার্থ-নির্ণায়ক ও বেদশাখাসমূহের বিভাগকর্ত্তা ভগবান্ ব্যাসদেব স্বয়ং ' ব্রহ্মসূত্রে ' (বেদান্তদর্শনে) স্মার্ত্তমতের নিন্দা করিয়াছেন—

" ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ শারীরশ্চ।" ১।২।২০

অর্থাৎ স্মার্ত্ত—স্মৃতি-প্রতিপাদিত প্রধান এবং শারীর—শরীরাধিষ্ঠিত জীব কদাচ অন্তর্যামী হইতে পারে না। যেহেতু অন্তর্যামীর সর্ব্বদ্রষ্টৃত্বাদি গুণ কথিত হইয়াছে কিন্তু প্রধান ও জীবের পক্ষে সে গুণ থাকা অসম্ভব।

এস্থলে ' স্মার্ত্ত ' শব্দ জড় প্রকৃতিরই গ্রহণ সূচিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে স্মৃতিশাস্ত্রের লক্ষণ এইরূপ ছিল—যে শাস্ত্রে জড় প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহার নাম স্মৃতিশাস্ত্র। অতএব যাঁহারা জড়-প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি মানিয়া থাকেন, " স্মার্ত্ত " শব্দে তাঁহাদিগকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু জড়-প্রকৃতি হইতে জগতের সৃষ্টি, এই সিদ্ধান্ত বেদবিরুদ্ধ। সেই জন্য ভগবান্ বাদরায়ণ ইহা ব্রহ্মসূত্রের পূর্ব্বপক্ষ মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।

বেদে ঈশ্বরকেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা এবং প্রকৃতিকে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি বলা হইয়াছে। এই প্রকৃতি ঈশ্বরের অধীনা ও একান্ত বশবর্ত্তিনী। সুতরাং প্রকৃতিকে জগতের কারণ এবং পরতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করা সম্পূর্ণ বেদ-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত।

শ্রীবৈষ্ণব ধর্ম্ম, হিংসা-মদ্য মাংস-স্ত্রীসঙ্গশূন্য—নিবৃত্তিপ্রধান ধর্ম্ম। যদি বলেন গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ত স্ত্রী-সঙ্গ-বর্জ্জিত নহেন? তদুত্তর এই যে, গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ ঋতুগামী স্বদার-নিরত বলিয়া ব্রহ্মচারী রূপে পরিগণিত। এই বৈষ্ণব ধর্ম্মে—এই নিবৃত্তিমার্গে সংসারে সকল লোকই অনুরাগী হইতে পারে না। যেহেতু এই প্রবৃত্তি-প্রলোভনময় সংসারে অধিকাংশ জীবই হিংসা, মদ্য, মাংস ও স্ত্রীসঙ্গাসক্ত পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল প্রবৃত্তিপরায়ণ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া "শাক্ত ধর্ম্ম" নামে এক ধর্ম্ম গড়িয়া তুলেন এবং সেই সঙ্গে 'তন্ত্র' নামে এক শ্রেণীর পুস্তক রচিত হয়। এই তন্ত্র ও শাক্তধর্ম্মের 'দোহাই' দিয়া দেশে তখন মদ্য, মাংস, হিংসা ও ব্যভিচারের এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল।

এইরূপে যখন শাক্ত ধর্ম্মের আচার ব্যবহারে সমাজ ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং সমাজে ভয়ানক অশান্তি দেখা দিল তখন জন-সমাজ সেই শাক্ত ধর্ম্ম ও তন্ত্রকে পুনরায় হেয় দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

শাক্ত ধর্ম্ম বৈষ্ণব ধর্ম্মের এবং তন্ত্র বেদের প্রতিযোগীরূপে প্রচারিত। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম, যাহা বর্জ্জন করিয়াছে—শাক্তধর্ম্ম তাহা সাদরে অঙ্গীকার করিয়াছে; শাক্ত ধর্ম্ম ও তন্ত্র কেবল হিংসা-স্ত্রী-মদ্য-মাংস লইয়াই ব্যস্ত, বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐ সকলকে দূরে রাখিয়াও সন্ত্রস্ত। বিশেষতঃ তন্ত্র ও শাক্তধর্ম্ম বেদবিরুদ্ধ জড়বাদেরই প্রচারক অর্থাৎ উঁহারা পুরুষ (ঈশ্বর) হইতে জগতের সৃষ্টি না মানিয়া শক্তিকে (প্রকৃতিকে) জগতের কর্ত্রী ও পরতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। জড়বাদই স্মার্ত্তমত। এইরূপে সমাজ যখন শাক্তধর্ম্ম ও তন্ত্রের প্রচারে ব্যাকুল হইয়াছিল, সেই সময়ে শাক্তধর্ম্মাবলম্বিগণই সমাজের বিশ্বাস-স্থাপনের জন্য আপনাদের 'শাক্ত' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "স্মার্ত্ত" নামে পরিচয় প্রদান করেন। যেহেতু, ঐ সময় উঁহারা আপনাদিগকে "বৈষ্ণব," বলিয়া পরিচয় দিতেও পারে না, অথচ সমাজের ভয়ে 'শাক্ত' বলিতেও সঙ্কুচিত হন; সুতরাং তখন স্মার্ত্ত নামে অভিহিত করা একরূপ যুক্তি-সঙ্গতই হইয়াছিল।

শাক্ত-জড়বাদ এবং জড়-দর্শন প্রতিপাদক গ্রন্থই "স্মৃতি" নামে কথিত। এই লইয়াই তখন উহারা "স্মার্ত্ত" নামে পরিচিত হইলেন। ধর্ম্ম শব্দের সহিত এই স্মার্ত্ত নামের যে হইতে সংযোগ আরম্ভ হয়, ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ তৎসম্বন্ধে নানা অনুমান করিয়া থাকেন। শাক্তের স্বভাব ছিল কি?—বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা করা। বৈষ্ণব মদ্য-মাংস-হিংসা-ব্যভিচার আদি বর্জ্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু উহাদের পক্ষে ঐ গুলি পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল; কাজেই তাঁহারা তখন 'স্মার্ত্ত' রূপ ধারণ করিয়া ঐ সকলের প্রতি কিঞ্চিৎ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন। যথা—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥ ।মনু ৫।৫৬।

অর্থাৎ মাংস ভক্ষণে দোষ নাই, মদ্য পানেও দোষ নাই, স্ত্রী-সঙ্গমেও দোষ নাই, কেন না, এই গুলি জীবের প্রবৃত্তি; সুতরাং ইহাতে দোষ কি আছে? তবে নিবৃত্তিতে মহাফল লাভ হয়।

শাক্তধর্ম্ম যখন আপনার নিজ মূর্ত্তিতে ছিল; তখন মদ্য মাংসাদির অবাধ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, পরে স্মার্ত্ত আকারে পরিণত হইয়া এইরূপ তটস্থ ভাব ধারণ করিল।—"মদ্যপান কর, মাংস ভক্ষণ কর, কোন দোষ নাই, পরন্তু যদি না কর, ভালই হয়।" যে মদ্যাদি পানের বিধান প্রথমে করা হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সম্পূর্ণ নিষেধ কিরূপেই বা করা যাইতে পারে? এবং নিষেধ করিলেই বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতা থাকে কই? কাজেই ঐ সকল বিধানের প্রতি ঔদাসীন্য মাত্র প্রকাশ করিয়া শাক্তধর্ম্ম পরে 'স্মার্ত্ত' আকারে পরিবর্ত্তিত হইল।

এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন, আমি স্মার্ত্ত ধর্ম্মের নিন্দাবাদ করিতেছি, কি স্মার্ত্তম্মন্য মহাত্মাগণের হৃদয়ে ক্লেশ প্রদান করিতেছি। বেদ-বেদান্তে স্মার্ত্তধর্ম্মের কি সিদ্ধান্ত আছে, তাহা প্রতিপাদন করাই আমার উদ্দেশ্য। বেদে ত কোথাও স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের নাম পাওয়া যায় না। বেদান্তসূত্রে উক্ত মতের নাম স্মৃতি-প্রতিপাদিত মত

কথিত হইয়াছে। এই মতে বেদবিরুদ্ধ জড়প্রকৃতিকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যদি মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতায় ঈশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি স্বীকৃত হয় এবং উহাদিগকে জড়বাদের কলঙ্কমুক্ত করা যায়, তাহা হইলে ভগবান্ বাদরায়ণের লক্ষণানুসারে উহাদিগকে স্মৃতি নামেই অভিহিত করা যায় না। স্মার্ত্তধর্ম্ম অর্ব্বাচীন হইবার আরও এক প্রমাণ এই যে, উহা পরস্পর স্বার্থবিরোধ-বিজড়িত।

"মন্বর্থ-বিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে॥"

অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর অর্থের বিপরীত ভাব প্রকাশ করে, সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, ঐ সময় মনুস্মৃতির বিরুদ্ধ-অর্থ-প্রকাশিকা আরও বহু স্মৃতি বিদ্যমান ছিল। মনু, আপনিই আপনার স্মৃতির প্রশংসা এবং আপনার মত-বিরুদ্ধ স্মৃতি-সমূহের অপ্রাশস্ত্য অর্থাৎ নিকৃষ্টতা ঘোষণা করিয়াছেন। যেরূপ আজকালকার বিজ্ঞাপন-দাতৃগণ আপনার পুস্তকের শতমুখে প্রশংসা করিয়া অন্যের পুস্তকের হেয়তা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। মনু যেন নিজমুখে আপনার স্মৃতির প্রশংসা করিয়া উক্ত পথেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

মনুস্মৃতির আধুনিকতা।

"ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্‌গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥" মনু।

অর্থাৎ সৃষ্টির আদিকালে এই শাস্ত্র রচনা করিয়া ব্রহ্মা কেবল আমাকেই পড়াইয়াছিলেন, পরে আমিই মরীচ্যাদি মুনিগণকে পড়াইয়াছি।

সে যাহা হউক, প্রচলিত অন্যান্য স্মৃতি অপেক্ষা মনুস্মৃতিরই অধিক সমাদর দৃষ্ট হয়। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য বর্ত্তমান আকারে আমরা যে মনুস্মৃতি দেখিতে পাই উহা আসল মনুস্মৃতি নয়। উহা একখানি আধুনিক পুস্তক। পণ্ডিতগণের মতে উহা খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দিতে রচিত। মনুসংহিতা অপেক্ষাও অতি প্রাচীন ব্যবহার শাস্ত্র আছে—যেমন 'আপস্তম্ব সূত্র, বৌধায়ন সূত্র, আশ্বলায়ন সূত্র প্রভৃতি, এ সকল গ্রন্থও খৃষ্টীয় অব্দের ২০০ হইতে ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। এই

অনুষ্টুপছন্দে রচিত মনুসংহিতা প্রাচীন সূত্র শাস্ত্রের পরিবর্ত্তিত আধুনিক সংস্করণ বিশেষ। ইহা কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদান্তর্গত মৈত্রায়ণ শাখার উপরিভাগ মানব-সূত্রাচরণের ধর্ম্মসূত্র হইতে পদ্যে রচিত হইয়াছে। মহর্ষি ভৃগুই ঐ মানবীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে সংহিতা-রূপে নিবদ্ধ করেন এবং পর্য্যায়ক্রমে আচার, ব্যবহার ও প্রায়শ্চিত্ত এই তিন কাণ্ডে বিভক্ত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এই ভৃগু-সঙ্কলিত মনুস্মৃতিই মনুর রচিত বলিয়া কথিত। ইহাও আবার লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। মেধাতিথিভাষ্য পাঠে জানা যায়—আসল ভৃগুপ্রোক্ত মনুস্মৃতিও লোপ পাইয়াছিল, নানাস্থান হইতে সাহারণ সুত মদন উহা সঙ্কলিত করিয়া বর্ত্তমান আকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

শাক্তধর্ম্মের অভ্যাস ছিল—বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিযোগিতা করা। যখন এই শাক্তধর্ম্ম মদ্য-মাংসাদির প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া "স্মার্ত্ত" রূপ ধারণ করিল, তখন কি লইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করিবে, ইহা একটা চিন্তার বিষয় অবশ্য হইয়াছিল। বহু অনুসন্ধানের পর "তির্য্যক্‌পুণ্ড্র" ও "বেধ" লইয়া স্মার্ত্ত আকারেও, বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত এক প্রবল বিরোধের সূত্রপাত হইল।

বৈষ্ণবজন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উঠিয়া ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করেন। এই কারণ "অরুণোদয়বিদ্ধা" একাদশী পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীব্রত করিয়া থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্তজন এই মতের বিরুদ্ধ 'সূর্য্যোদয়-বেধ" উল্লেখ করিয়া বিরোধে প্রবৃত্ত হন।

বৈষ্ণবজন ঊর্দ্ধগতিকে লক্ষ্য করিয়া "ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র" তিলক ধারণ করেন। কিন্তু স্মার্ত্তধর্ম্মমতে 'তির্য্যক্‌পুণ্ড্র' প্রকাশ করিয়া স্মার্ত্তজন আপনাদের হঠকারিতা পূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলে বলা আবশ্যক, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি স্মৃতিগ্রন্থে ত কোথাও "সূর্য্যোদয়বিদ্ধা" 'একাদশীর ত্যাগ এবং 'তির্য্যক্ পুণ্ড্রের" নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। সুতরাং জানি না স্মার্ত্তগণ অন্য কোথা হইতে এই সকল বিধানের ডঙ্কা বাজাইতেছেন।

"নির্ণয়-সিন্ধু" আদি নিবন্ধ গ্রন্থে একাদশীর বেধ-প্রকরণে বৈষ্ণব ও স্মার্ত্ত মতের বিভিন্নতা কথিত হইয়াছে। অরুণোদয়-বেধ লইয়া একাদশীর বচন সকল

বৈষ্ণবপর এবং সূর্যোদয়-বেধ লইয়া একাদশীর বচন সকল স্মার্ত্তপর লিখিত হইয়াছে। এইরূপেই উহাতে উভয়মতের সমন্বয় করা হইয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও শ্রীএকাদশী তত্ত্ব প্রভৃতি বিচারে বৈষ্ণব মত ও স্মার্ত্ত মত পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন—

"ইত্যবিশেষাদত্র বৈষ্ণবেনাপি পূর্ব্বোপোষ্যেতি। অরুণোদয়বিদ্ধা তু দ্বাদশ্যাং পারণস্যালাভেঽপি বৈষ্ণবৈর্নোপোষ্যা" ইত্যাদি।

সাধারণতঃ প্রত্যেক ধর্ম্ম-মতই এক একটী দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। দর্শনশাস্ত্র ব্যতিরেকে কোন মতই বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং "স্মার্ত্ত" বলিয়া যখন একটী ধর্ম্মমত মানিয়া লওয়া হইয়াছে, তখন উহার একটী দর্শন থাকা চাই। এইজন্যই বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ মায়াবাদ-দর্শনকেই স্মার্ত্তসুধিগণ আপনাদের স্মার্ত্তমতের দর্শন মানিয়া লইয়াছেন।

যে হইতে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত একাদশী ও ঔর্দ্ধ্বদৈহিক প্রভৃতি লইয়া বিতর্কবাদ উপস্থিত হইয়াছে, সেই হইতেই জগৎ মিথ্যা বলিয়া ঝগড়াও বাধিয়াছে। যে স্মৃতি-সমূহ লইয়া স্মার্ত্তধর্ম্ম গঠনের দাবী করা হইয়া থাকে, ঐ সকল স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে কোথাও "অদ্বয়বাদের" নাম পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়াও কোথাও উল্লিখিত হয় নাই।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্য আসুরী জীবগণের বিমোহনার্থই মায়াবাদ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে ব্যামোহকর অদ্বয়বাদের সহিত জগৎ মিথ্যা, পাপপুণ্য ভ্রম মাত্র কহিয়াছেন। ইহা উচিতই হইয়াছে,—ইহা না বলিলে জীব মোহিত হইবে কিসে? কিন্তু স্মার্ত্ত মহাশয় ইহাতে বড়ই গোলযোগে পড়িলেন। যখন পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক সবই মিথ্যা, তখন স্মার্ত্তকর্ম্মের বিজয়-ভেরী কিরূপে বাজিতে পারে? আর যদি ঐ সকলকে সত্যই বলা যায়, তাহা হইলে ত মায়াবাদ, অদ্বৈতমত হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এই উভয় শঙ্কটে পড়িয়া স্মার্ত্তসুধিগণ বিচার পূর্ব্বক দুইটা মার্গের সৃষ্টি করিলেন।

যথা—১ম, ব্যবহার মার্গ, ২য়, পরমার্থ মার্গ। ব্যবহার মার্গে—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক সবই সত্য, আর পরমার্থ মার্গে—সব মিথ্যা!

কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত! পাঠক বিচার করিয়া দেখুন দেখি! এক ব্যক্তির নিকট একখানি 'জাল নোট' আছে, সে ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গাইতে গিয়া বলিতেছে—"যতক্ষণ তুমি আমার মত ধোঁকায় (অন্ধবিশ্বাসে) থাকিবে, ততক্ষণ এ নোট 'আসল', তারপর যখন বুঝিতে পারিবে, তখন ইহা 'জাল নোট'—তা যাই হউক তুমি কিন্তু আমাকে টাকা দিয়ে দাও।" স্মার্ত্ত ধর্ম্ম ঠিক্ এইরূপ ধরণের বলিয়াই বোধ হয় না কি? ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, স্বর্গ-নরক সবই সত্য অথচ ঐ সবই মিথ্যা; এক্ষণে সামান্য বিচার-দৃষ্টিতে দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, যে ধর্ম্ম পরমার্থমার্গে মিথ্যা, সে ধর্ম্ম কিরূপ সারবান্? এবং উহার অনুষ্ঠানেই বা কি প্রয়োজন আছে? মিথ্যা স্বর্গের নিমিত্ত, মিথ্যা দানপুণ্য করা কি জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলা উদ্দেশ্য নহে?

মনু লিখিয়াছেন—"যেস্থলে শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিরোধ দৃষ্ট হয়, সেস্থলে শ্রুতিরই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে।" "শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" পরন্তু এস্থলে এই আশঙ্কা হইতে পারে, যখন শ্রুতির অর্থ লইয়াই স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তখন শ্রুতির সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? টীকা এবং মূলের বিরোধ কোথায়? কোথায় অর্থের সহিত মূল পাঠের বিরোধ দৃষ্ট হয়? জানি না, ইহা কিরূপ স্মৃতিশাস্ত্র, যাহা শ্রুতি-বিরুদ্ধ।

স্মৃতির সহিত বিরোধ ঘটিলে শ্রুতিরই মান্য করিতে হইবে, এই লইয়াই মনুর গৌরব; কিন্তু আজকালকার স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ এই মতের আদৌ অনুসরণ করেন না।

শিখা রহস্য।

বেদে এক শ্রুতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে শিখা-মুণ্ডনের বিধান লিখিত আছে এবং শিখাকে পাপরূপ বলা হইয়াছে। যথা—সামবেদ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ—

"শিখা অনুপ্রবপস্তে পাপ্মানমেব তদপঘ্নতে
লঘীয়াং সঃ স্বর্গলোকময়ামেতি।" ৪ অঃ ১০ খণ্ড।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিখা-মুণ্ডন করে, সে আপনার পাপরাশিকে নাশ করে, এবং লঘু হইয়া স্বর্গলোক গমন করিয়া থাকে।* এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন বেদে ত শিখামুণ্ডনের কথা লিখিত আছে, তবে স্মার্ত্তমহাশয়দের শিখা ধারণ সম্বন্ধে এরূপ উৎকট আগ্রহ কেন? যাহার শিখা নাই, তাহাকে হিন্দু বলিতেও সঙ্কোচ প্রকাশ করিয়া থাকেন। আরও স্মার্ত্তগ্রন্থে কিরূপ প্রবল আগ্রহের কথা লিখিত আছে, দেখুন—

"খল্বাটত্বাদি দোষেণ বিশিখশ্চেন্নরো ভবেৎ।
কৌশীং তদা ধারয়ীত ব্রহ্মগ্রন্থিযুতাং শিখাম্॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি টাক-রোগাদি দোষের কারণ বিশিখ অর্থাৎ শিখাশূন্য হয়, তাহারও মস্তকে ব্রহ্মগ্রন্থিযুক্ত কুশের শিখা সংলগ্ন করিয়া দিবে।

ধন্য, স্মৃতিশাস্ত্রে শিখা ধারণের আগ্রহ! ধন্য শ্রুতিস্মৃতির বিরোধে শ্রুতির মান্য! শ্রুতি বলিতেছেন—"মুড়াইয়া ফেল শিখা—পাপ। স্মৃতি বলিতেছে—

* এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল বহিঃসূত্র ও মস্তকে এক গোছা কেশ শিখা স্বরূপ ধারণ করিলেই ব্রহ্মবাদী বা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না। যেহেতু

"শিখা জ্ঞানময়ী যস্য উপবীতঞ্চ তন্ময়ং।
ব্রাহ্মণং সকলং তস্য ইতি যজুর্বিদোবিদুঃ॥" ব্রহ্মোপনিষৎ।

বেদজ্ঞ সুধীগণ বলিয়া থাকেন—যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ও জ্ঞানময় সূত্র ধারণ করিয়াছেন, তিনিই নিখিল ব্রাহ্মণের অবলম্বন।

সুতরাং—

"অগ্নিরিব শিখামান্যা যস্য জ্ঞানময়ী শিখা।
স শিখীত্যুচ্যতে বিদ্বানিতরে কেশধারিণঃ॥

অগ্নির ন্যায় জ্ঞানময়ী শিখাই মান্যা, যিনি জ্ঞানময়ী শিখা ধারণ করেন, তিনিই প্রকৃত শিখাধারী নামের যোগ্য। কেবল বাহ্য শিখা ধারণ করিলে কেশরাশি মাত্র ধারণ হয়।

না না, কদাচ মুড়াইওনা, কেশ না থাকে, কুশের শিখাও লাগাইয়া লও—শিখা ছাড়া থাকিও না।"

এই শিখা-রহস্য হইতেও আর একটী বড় রহস্য আছে। যে গায়ত্রী মন্ত্রকে মূল মনে করিয়া স্মার্ত্তভ্রাতৃগণ 'সাম্প্রদায়িক' মন্ত্রকে নিন্দা করিয়া থাকেন, বেদে লিখিত হইয়াছে,—সেই গায়ত্রী দ্বারা স্বর্গলাভ হয় না। যথা—সামবেদ—তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে—

গায়ত্রী রহস্য।

"দেবা বৈ চ্ছন্দাংস্যব্রুবন্ যুষ্মাভি স্বর্গ-
লোকময়ামেতি তে গায়ত্রীং প্রাযুঞ্জত তয়া
ন ব্যাপ্নুবন্॥" ৭ অঃ ৫ খণ্ড।

অর্থাৎ দেবতারা মন্ত্রাত্মিকা, তাই, দেবতারা ছন্দ বা মন্ত্রের প্রতি কহিলেন "আমরা তোমাদের দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করিব।" এই বলিয়া দেবতারা গায়ত্রীর প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু গায়ত্রী দ্বারা সেই দেবতাদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিল না।

এক্ষণে পাঠকগণ! বিচার করিয়া দেখুন, স্মার্ত্তধর্ম্মে গায়ত্রীর কি মহিমা এবং বেদে উহার কিরূপ অকিঞ্চিৎকরতা! ইহাই শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরোধ। আপনি মনুস্মৃতির বচন অনুসারে যদি শ্রুতিকেই প্রবল মান্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে গায়ত্রীর প্রতি আপনার শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না, আর গায়ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা রাখিতে গেলে, বেদের সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। পরন্তু গায়ত্রী দ্বারা স্বর্গবাসী দেবতাগণেরও যখন স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে না, তখন তোমার-আমার ত কথাই নাই—আমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে না।

আরও এক বড় কৌতুকের বিষয়, যখনই ব্যবস্থা লইয়া ঝগড়া হয়,—তখনই "বৈষ্ণব ব্যবস্থা" আর "স্মার্ত্ত ব্যবস্থা" লইয়া, কিন্তু কখন শুনা যায় না যে, শৈব ব্যবস্থা আর স্মার্ত্ত ব্যবস্থা কি শাক্ত ব্যবস্থা আর স্মার্ত্ত ব্যবস্থা লইয়া কোন বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছে অথবা অন্য কোন ব্যবস্থার সহিত স্মার্ত্ত ব্যবস্থার ঝগড়া উপস্থিত হইয়াছে।

শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য কি জন্য স্মার্ত্তধর্ম্মের বিপ্রতিপত্তি অর্থাৎ বিরুদ্ধ-জ্ঞান হয় না, কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিতই প্রতিযোগিতা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং ইহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত বিরোধ করিবার নিমিত্ত যে "শাক্তধর্ম্মের" সৃষ্টি হইয়াছিল, ,স্মার্ত্তধর্ম্ম' তাহারই রূপান্তর মাত্র। পাঠকজনই বিচার করিয়া দেখুন, স্মার্ত্তমতালম্বী ব্যক্তিগণ যেরূপ বৈষ্ণবগণের উপর দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেরূপ শৈব কি শাক্তগণের উপর দ্বেষ প্রকাশ করেন না; অবশ্য ইহার কোন কারণ আছে ত? যখন স্মার্ত্তধর্ম্ম জড়বাদ, তখন চৈতন্যবাদের সহিত অবশ্য ঝগড়া থাকিতে পারে। বৈষ্ণবধর্ম্ম চৈতন্যবাদ বলিয়াই স্মার্ত্তধর্ম্মের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

অন্যবিধ কারণ এই যে, শৈব, শাক্ত, গাণপত্যাদি ধর্ম্ম, সাম্প্রদায়িকরূপে প্রচলিত হইলেও পৃথক পৃথক সমাজবদ্ধ হয় নাই; এই জন্যই উহাদের উপর তাদৃশ দৃষ্টি পতিত হয় নাই। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্ম চারি সম্প্রদায় ও উহাদের শাখা-প্রশাখায় বর্দ্ধিত হইয়া পৃথক সমাজবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ঠিক পাশাপাশি ভাবে অবস্থিত আছেন; বিশেষতঃ পারমার্থিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বৈষ্ণব মহিমার উৎকর্ষ শাস্ত্রে ভূরি ভূরি বর্ণিত হওয়ায় সকলের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ইহার উপর পতিত এবং অনেকেরই চক্ষুতে অসহ্য।

স্মার্ত্তধর্ম্মের এই এক শ্রুতির সহিত বিরোধ দেখা যায় যে, স্মার্ত্তধর্ম্ম ভস্মধারণ অর্থাৎ বিভূতি ধারণ সম্বন্ধে বড় আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রুতি (বেদ) ভস্মকে পাপরূপ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

"যচ্চ রাত্রোপসমাদধাতি তস্যান্নস্য জগ্ধস্যৈষ
পাপ্মা সীদতি ভস্ম, তেনৈন মেতদ্ব্যাবর্ত্তয়তি॥"

শতপথ ব্রাহ্মণ ৬ কাঃ ৬ অঃ ৪ প্রপাঃ

যে ব্যক্তি রাত্রিতে সমিধ অর্পন করে, তাহার অন্নের পাপস্বরূপ সেই ভস্ম হয়; এজন্য ভস্ম অবশ্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। পাপের তাৎপর্য্য মল। যেরূপ

ভোজন করিলে অন্নের মল ত্যজ্য ও অপবিত্র হয়, সেইরূপ অগ্নির সমিধ্ ভোজনের পর সমিধের মল—ভস্ম হয়, সুতরাং উহা পরিত্যাগ করা উচিত। এরূপ বুঝিবেন না, আমি নিজের মতলবে ভস্ম শব্দের —'মল' অর্থ খ্যাপন করিতেছি ? বেদের এক শ্রুতিতেই ভস্মকে মল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যথা—

"অগ্নের্ভস্মাস্যগ্নেঃ পুরীষমসীতি।"

শতপথ ৭ কা ১ অঃ ১ প্রঃ।

অগ্নি হইতেই ভস্ম হয়—উহা অগ্নির পুরীষ (মল)।

এই জন্যই বৈষ্ণবজন শ্রীগোপীচন্দনাদি ধারণ করিয়া থাকেন। বেদানুসারে ভস্মকে পাপ ও পুরীষস্বরূপ মনে করিয়া পরিহার করিয়াছেন। তবে স্মার্ত্তধর্ম্মের উদ্দেশ্য এই, যাহা বৈষ্ণবজন করেন না, উহাই স্মার্ত্তজনকে করিতে হইবে, তাই ভস্মধারণ প্রথা প্রচার করিয়া দিলেন। কিন্তু বেদ ভস্মকে যে পাপ ও পুরীষ স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা কেহই আর দেখিলেন না। উহাঁদের সিদ্ধান্তই এইরূপ—বৈষ্ণব যাহাকে ভাল বলিতেছেন, তাহা উহাঁদের পক্ষে মন্দ—আর বৈষ্ণব যাহাকে মন্দ বলিতেছেন তাহাই উহাঁদের ভাল,— ইহাই শাস্ত্র, আর ইহাই বেদ।

অনন্তর মনুস্মৃতির মধ্যে পরস্পর কিরূপ বিরুদ্ধভাবের সমাবেশ আছে, তাহার দুই চারিটী উদাহরণ এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"উদ্ববর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্।
মনসশ্চাপ্যহঙ্কার মভিমন্তারমীশ্বরম্"॥ ১৪॥

অর্থাৎ ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে তৎস্বরূপ সদসদাত্মক মনের সৃষ্টি করিলেন এবং মন হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন করিলেন।

কি আশ্চর্য্য! পরমাত্মা স্বয়ং কি মনকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ ছিলেন না? তাই ব্রহ্মা স্বয়ং পরমাত্মা হইতে মন উৎপন্ন করিলেন এবং মন হইতে অহঙ্কার সৃষ্টি করিলেন?

এস্থলে মন হইতে অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু এই অধ্যায়ের ৭৫ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—

ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া মনকে সৃষ্টি করিতে নিয়োগ করেন। মন সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলে প্রথম সেই মন হইতে—

" আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দ-গুণং বিদুঃ।"—

আকাশ জন্মে—শব্দই ঐ আকাশের গুণ।

মনুই যদি সকলের স্রষ্টা হইলেন, আর মনুই যদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাহইলে ত ব্রহ্মার মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি অসত্য হইয়া পড়ে?

" অহং প্রজা সিসৃক্ষুস্তু তপস্তপ্ত্বা সুদুশ্চরম্।
পতীন্ প্রজানামসৃজং মহর্ষীনাদিতো দশ॥
মরীচিমত্র্যাঙ্গিরসৌ পুলস্তং পুলহং ক্রতুম্।
প্রচেতসং বসিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥" মনু ১।৩৪।৩৫

মনু বলিয়াছেন—আমিও প্রজাসৃষ্টির মানসে সুদুশ্চর তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ দশ জন মহর্ষি প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম সেই দশ জন যথা,—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

মনু এই দশ মহর্ষিকে আপনার পুত্র বলিয়া লিখিয়াছেন। কিন্তু এই মনুর বচন বেদবিরুদ্ধ। যেহেতু ঋগ্বেদ ৯ম, ৬৫ সূক্তে ভৃগু, বরুণের পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

আবার যজুর্ব্বেদ, শতপথব্রাহ্মণেও লিখিত হইয়াছে—

" ভৃগুর্হ বৈ বারুণির্বরুণং পিতরং
বিদ্যয়াতিমেনে।" ১১কা, ৩প্রপা, ৪ব্রা, ১কং।

অর্থাৎ বরুণের পুত্র ভৃগু আপনার পিতা বরুণকে বিদ্যার নিমিত্ত অতি মান্য করিয়াছিলেন। ইহাতেও ভৃগুকে বরুণের পুত্র বলিয়া লেখা হইয়াছে। সুতরাং এই শ্রুতির দুইটী বচন দ্বারা মনুস্মৃতির বচন বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

মনুস্মৃতির ৩ অধ্যায় ১৬ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"শূদ্রবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্য তয়া ভৃগোঃ॥"

অর্থাৎ অত্রি ও উতথ্যতনয় গোতম ঋষির মত এই যে, শূদ্রবেদী অর্থাৎ শূদ্রাকে বিবাহ করিলে দ্বিজ পতিত হইয়া থাকে। শৌনকের মত এই যে, শূদ্রার সহিত বিবাহ হইলেই যে পতিত হইতে হইবে, তাহা নহে, শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পতিত হইতে হয়। ভৃগুর মত এই যে, শূদ্রাকে বিবাহ করিলে বা শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদন করিলে পাতিত্য হয় না, শূদ্রার পুত্রের পুত্র হইলে পতিত হইতে হয়। অর্থাৎ যখন শূদ্রের বংশ হইয়া পড়ে তখনই পতিত হইয়া থাকে, নতুবা অন্য কোন সময়ে পতিত হইবে না। এই মতভেদ লইয়া অধিক আলোচনা করিতে আমি নিরস্ত হইলাম। আমি এই শ্লোকটীর সম্বন্ধে সামান্য মাত্র আলোচনা করিতেছি। যদি আলোচ্য শ্লোকটী স্বয়ং মনুরই রচিত হয়, তাহা হইলে তিনি নিজ পুত্রের মত পৃথক সংগ্রহ করিলেন কেন? তবে কি ভৃগু, মনুর মত মানিতেন না?

যদি বলেন, মনু প্রীতিবশতঃ আপনার পুত্রের আগ্রহে এ বিষয়ে আপনার মত কিছু প্রকাশ করেন নাই! হইতে পারে,—ইহা অবশ্য মানিয়া লইতে পারা যায়? কিন্তু এই শ্লোক মূল মনুস্মৃতিতে কিরূপে থাকিতে পারে? যেহেতু মনু মূলস্মৃতি ভৃগুকে পড়াইয়াছিলেন এবং যাহার বিষয় স্মৃতির ১ম, অধ্যায় ৫৯ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

"এতদ্বোঽয়ং ভৃগুঃ শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যত্যশেষতঃ।
এতদ্ধি মত্তোঽধিজগে সর্ব্বমেষোঽখিলং মুনিঃ॥"

অর্থাৎ মহর্ষি ভৃগু আপনাদিগকে এই শাস্ত্র আদ্যোপান্ত শ্রবণ করাইবেন, যেহেতু ভৃগুই নিখিল শাস্ত্র আমার নিকট সম্যক্ প্রকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখন কথা হইতেছে, মনুস্মৃতি যদি ভৃগু অধ্যয়ন করিলেন, তবে ভৃগুর মত মনু-স্মৃতিতে কোথা হইতে আসিল?

আর যদি ঐ শ্লোকটী ভৃগুই পরে মনুস্মৃতিতে লিখিয়া দিয়া থাকেন, এই কথা মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভৃগু যদি পরবর্ত্তীকালেই লিখিতেন, তাহা হইলে " ইহা আমার মত " এই কথাই লিখিতেন, " ইহা ভৃগুর মত " কদাচ লিখিতেন না। সুতরাং ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই বচনটী অবশ্য কোন নূতন মনু কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছে।

আরও দেখুন—মনুস্মৃতিতে কিরূপ একটী অদ্ভুত সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে—

" ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্রস্তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ "॥
৪ অ, ১২৪ শ্লোক।

অর্থাৎ ঋগ্বেদের দেবতা দেবগণ, যজুর্ব্বেদের দেবতা মনুষ্যগণ এবং সামবেদের দেবতা পিতৃগণ। এ কারণ সামবেদের ধ্বনি ঋক্ যজুর ধ্বনি অপেক্ষা অপবিত্র। বাঃ! কি সিদ্ধান্ত? যে সামবেদকে গীতায় শ্রীভগবান্ আপনার স্বরূপ কহিয়াছেন, —" বেদানাং সামবেদোঽস্মি "। মনুস্মৃতি সেই সামবেদের ধ্বনিকে অশুদ্ধ বলিয়াছেন।

অতএব পূর্ব্বকালে বৈদিক সম্প্রদায়িদের মধ্যেও পরস্পর বিদ্বেষ ও নিন্দা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঘোরতর বাদ-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। ভক্তিবাদী সাত্বতগণের সহিত জড়কর্ম্মবাদী স্মার্ত্তগণের কি ভক্তি-বিহীন পাষণ্ডগণের যে চির-বিরোধ, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িক অসামঞ্জস্যতা ও বিদ্বেষিতার ফল বুঝিতে হইবে। এই জন্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবে চির-দ্বন্দ্ব। উল্লিখিত মনুর উক্তিতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের স্পষ্ট আভাস পরিস্ফুট। আরও দৃষ্ট হয় যজুর্ব্বেদ দুই ভাগে বিভক্ত; শুক্ল যজুঃ ও কৃষ্ণ যজুঃ। শুক্ল যজুর্ব্বেদিরা নিজে অধ্বর্য্যু আখ্যা গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণযজুর্ব্বেদিদিগকে চরকাধ্বর্য্যু নাম দিয়া তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ নিন্দা করিয়াছেন। এমন কি দুষ্কৃত

স্থানে বলিদান দিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—" দুষ্কৃতায় চরকাচার্য্যম্।" ৩০।১৮
(বাজসনেয়ি-সংহিতা)

অর্থাৎ দুষ্কৃতের নিকট চরকাচার্য্যকে বলিদান দিবে।

অথর্ব্ববেদীরা কিরূপ ত্রয়ী-ঋত্বিকগণকে নিন্দা করিতেছেন, দেখুন—

"বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রং অধ্বর্য্যুর্নাশয়েৎ সুতান্।
ছান্দোগো ধনং নাশয়েত্তস্মাদাথর্ব্বণো গুরুঃ॥"
অথর্ব্বপরিশিষ্ট—১১২ অঃ।

আবার অনেক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি অপর তিন বেদের তুলনায় অথর্ব্ববেদের উপযোগিতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন। এমন কি ইহাকে হিন্দুর পবিত্র বেদের মধ্যে গণ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিয়া থাকেন।

যজ্ঞাদিকার্য্যে "ত্রয়ী" অর্থাৎ ঋক্-সাম-যজুঃ এই তিন বেদই প্রশস্ত, এজন্য বেদের নাম "ত্রয়ী"। কিন্তু বস্তুতঃ বেদের মধ্যে পদ্যাংশ (ঋক্), গদ্যাংশ (যজুঃ) ও গান (সাম) এই তিনই আছে বলিয়া বেদ সাধারণের নাম ত্রয়ী। অথর্ব্ববেদের মধ্যেও ঐরূপ পদ্য, গদ্য, গান (ঋক্-যজুঃ-সাম) তিনই আছে; সুতরাং পরস্পর অবিচ্ছেদ নিত্য সম্বন্ধ।

যজ্ঞের অঙ্গ চারিটী। হোতৃ কর্ম্ম, উদ্গাতৃ, অধ্বর্য্যু এবং ব্রহ্ম কর্ম্ম। এই চারিটী কর্ম্ম যথাক্রমে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ ও অথর্ব্ববেদ দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। প্রথম তিনবেদের দ্বারা যজ্ঞের অর্দ্ধেক সম্পন্ন হয়, এবং অথর্ব্ববেদের ব্রহ্মকর্ম্ম দ্বারাই যজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে।

" যথৈকপাৎ পুরুষো যন্ অনুভয়চক্রো বা
রথো ভ্রেষং ন্যেতি এবমেবাস্য যজ্ঞো ভ্রেষং ন্যেতি।"
গোপথ-ব্রাহ্মণ ৩।২

একপদ-বিশিষ্ট পুরুষ যেমন গমন বিষয়ে অশক্ত অথবা একটী মাত্র চক্রযুক্ত রথ যেমন গমনে অশক্ত সেইরূপ ব্রহ্মহীন অর্থাৎ অথর্ব্ব মন্ত্রহীন যজ্ঞও নিষ্ফল বলিয়া জানিবে।

আরও উক্ত হইয়াছে—

"প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত। স ঋচৈব হৌত্রমকরোৎ, যজুষাধ্বর্য্যবং সাম্নৌদ্গাত্রং অথর্ব্বাঙ্গিরোভি র্ব্রহ্মত্বং" ইতি প্রক্রম্য "স বা এস ত্রিভির্ব্বেদৈ র্যজ্ঞস্যান্যতরঃ পক্ষঃ সংস্ক্রিয়তে। মনসৈব ব্রহ্মা যজ্ঞস্যান্যতরং পক্ষং সংস্করোতি।"
গোপথ-ব্রাহ্মণ ৩।২।

প্রজাপতি একটী যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি ঋকের দ্বারা হৌত্রকর্ম্ম, যজুর্ব্বেদ দ্বারা আধ্বর্য্যব কর্ম্ম, সামের দ্বারা ঔদ্গাত্র কর্ম্ম এবং অথর্ব্ববেদ দ্বারা ব্রহ্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতএব ত্রয়ী দ্বারা যজ্ঞের এক পক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন আর ব্রহ্মা (আথর্ব্বণ্) মনের দ্বারা অন্যপক্ষ সংস্কার করিয়াছিলেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও উক্ত হইয়াছে—

"তদ্ বাচা ত্রয্যা বিদ্যয়ৈকং পক্ষং সংস্কুর্ব্বন্তি,
মনসৈব ব্রহ্মা সংস্করোতি"। ৫।৩৩।

তবে যেখানে শ্রেষ্ঠ অথর্ব্ববিদ্ ব্রাহ্মণের অভাব হয়, সেই স্থলেই সেই সেই শাখাতে যেরূপ ব্রহ্মকর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে, এই অভিপ্রায়েই "স ত্রিভির্বেদৈর্বিধীয়তে"—এই স্মৃতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

ত্রয়ীতে (ঋক্ যজু সাম) কেবল পারত্রিক বিষয়ই অভিব্যক্ত হইয়াছে— অথর্ব্ববেদে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় কল্যাণকর তত্ত্বসমূহ বিন্যস্ত থাকাই উহার বিশেষত্ব। অথর্ব্বা নামক ব্রহ্মা এই বেদের দ্রষ্টা বলিয়া এই বেদের নাম অথর্ব্ববেদ হইয়াছে। পুরাকালে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টির নিমিত্ত তপস্যা আরম্ভ করিলে তাঁহার লোমকূপ হইতে ঘর্ম্মধারা নিঃসৃত হয়। সেই স্বেদজ বারি মধ্যে স্বকীয় ছায়া অবলোকন হেতু তাঁহার বীর্য্যপাত হয়। সেই রেতঃপাতে জল দ্বিবিধ রূপবিশিষ্ট হয়। তন্মধ্যে একত্রস্থিত সেই রেতঃ ভৃজ্জামান হইয়া ভৃগু নামে মহর্ষি হইলেন। ভৃগু স্বীয় জনক ব্রহ্মার দর্শন জন্য ব্যাকুল হইলে—এইরূপ দৈববাণী হইল—"অথার্ব্বাগেনং এতাস্বেবাপ্স্বন্বিচ্ছ"। গোঃ ব্রাঃ ১।৪।

অর্থাৎ তুমি যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহাকে এই জলের মধ্যে দেখিতে চেষ্টা কর। দৈববাণী দ্বারাই তিনি "অথর্ব্ব" আখ্যালাভ করেন। অনন্তর অবশিষ্ট রেতোযুক্ত জল দ্বারা ব্রহ্মার মুখ হইতে "বরুণ" শব্দ উচ্চারিত হইল এবং সমস্ত অঙ্গ হইতে রস ক্ষরিত হইয়াছিল, সেই ব্রহ্মার অঙ্গরস হইতে "অঙ্গিরস" নামক মহর্ষি উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর সৃষ্টির নিমিত্ত ব্রহ্মা এই অথর্ব্বা ও অঙ্গিরাকে তপস্যা করিতে বলিলেন। তাঁহাদের তপস্যা-প্রভাবে একর্চাদি মন্ত্র সমূহের দ্রষ্টা বিংশতি সংখ্যক অথর্ব্বা ও অঙ্গিরা উৎপন্ন হন। এই ঋষিগণ সকাশে ব্রহ্মা যে মন্ত্র সমূহকে দেখিয়াছিলেন, তাহাই "অথর্ব্বাঙ্গির" বেদ নামে অভিহিত। একর্চ্চাদি ঋষিগণ বিংশতি সংখ্যক বলিয়া, এই বেদও ২০ শ, কাণ্ড-বিশিষ্ট। অতএব সকল বেদের সারভূত বলিয়াই অথর্ব্ববেদ শ্রেষ্ঠ বেদ।

"শ্রেষ্ঠো হি বেদ স্তপসোঽধিজাতো ব্রহ্মজ্ঞানং হৃদয়ে সম্বভূব।" গোঃ ব্রাঃ ১।৯।

তপস্যা দ্বারা সমুৎপন্ন এই শ্রেষ্ঠ বেদই ব্রহ্মজ্ঞদিগের হৃদয়ে বিরাজিত হয়।

ইহা সকলের সারভূত ব্রহ্মাত্মক কর্ম্মনির্ব্বাহক বলিয়া ইহার অপর নাম ব্রহ্মবেদ—

"চত্বারো বা ইমে বেদা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ব্রহ্মবেদঃ। গোঃ ব্রাঃ ২।১৬

এই অথর্ব্ববেদের মন্ত্র, সিদ্ধ মন্ত্র ইহাতে তিথি, নক্ষত্রাদি বিচারের আবশ্যকতা নাই। অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্ররাজ যে "গোপাল-তাপনী" শ্রুতিতে বর্ণিত আছেন, সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অবলম্বনীয় তাপনী-শ্রুতি এই অথর্ব্ববেদ বা ব্রহ্মবেদের পিপ্পলাদ শাখার অন্তর্গত। কলি-পাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রুতিকেই সর্ব্বোত্তম জানিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং কলির জীবকে অল্পায়ু ও দুর্ব্বল বোধে করুণা করিয়া এই শ্রুত্যুক্ত সিদ্ধ-মন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন।

"ন তিথি র্ন চ নক্ষত্রং ন গ্রহো ন চ চন্দ্রমাঃ।
অথর্ব্ব মন্ত্র সংপ্রাপ্ত্যা সর্ব্বসিদ্ধি র্ভবিষ্যতি॥" পঃ ২।৫।

অথর্ব্ববেদের সংপ্রাপ্তি ঘটিলে, তিথি, নক্ষত্র, গ্রহ ও চন্দ্রশুদ্ধ্যাদির কোন প্রয়োজন হয় না; এই মন্ত্র দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। তাই

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীমন্ত্ররাজ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও প্রসঙ্গতঃ এস্থলে লিখিত হইতেছে। যথা—

বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রে—

" সর্ব্বেষাং মন্ত্রবর্য্যাণাং শ্রেষ্ঠো বৈষ্ণব উচ্যতে।
বিশেষাৎ কৃষ্ণমনবো ভোগমোক্ষৈক সাধনং ॥"

অগস্ত্যসংহিতা বলেন—

" সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং বৈষ্ণব মুচ্যতে।
গাণপত্যেষু শৈবেষু শাক্ত সৌরেষ্বভীষ্টদং ॥"

অতএব—

" শ্রীমদ্গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্ শক্তিষু মন্ত্রেষু ন হি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥"

তথা শ্রীকেশবাচার্য্য-বিরচিত ক্রমদীপিকায়—

" সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু, নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানা নভিবাঞ্ছিতানাং দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ ॥"

আরও স্কন্দপুরাণে কমলালয়খণ্ডে উক্ত হইয়াছে—

" যস্তত্রাথর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জপেচ্ছ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
তেষামর্থোদ্ভবং কৃৎস্নং ফলং প্রাপ্নোতি স ধ্রুবং ॥"

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অথর্ব্ববেদের মন্ত্র সমূহকে জপ করে সে নিশ্চয়ই সেই বেদমন্ত্র-কথিত সম্যক্ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মৎস্যপুরাণে কথিত হইয়াছে—

" পুরোহিতং তথাথর্ব্বমন্ত্র ব্রাহ্মণ-পারগং। "

অথর্ব্বমন্ত্র-ব্রাহ্মণ-কাণ্ডাভিজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত পুরোহিত পদবাচ্য।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত আছে—

" অভিষিক্তোঽথর্ব্বমন্ত্রৈর্মহীংভুঙ্‌ক্তে সসাগরং।" অর্থাৎ রাজা অথর্ব্বমন্ত্র দ্বারা অভিষিক্ত হইলে সসাগরা ধরণীর অধিপতি হন।

শান্তি-পৌষ্টিকাদি কর্ম্ম, বাস্তুসংস্কার, গৃহ-প্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, জাতকর্ম্ম, বিবাহ প্রভৃতি সকলই অথর্ব্ববেদের অনুসরণ। অতএব যাঁহারা বৈদিক তত্ত্ব না জানিয়া অথর্ব্ববেদকে—'যবনের বেদ'—যজ্ঞাদি কর্ম্মে অথর্ব্ব অর্থাৎ অনুপ-যোগী ইত্যাদি নিন্দা করেন তাঁহারা কতদূর ভ্রান্ত—কত বিদ্বেষপর তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ এই অথর্ব্ব বা ব্রহ্মবেদের মন্ত্রভাগের অনুসরণ করেন বলিয়া শাক্ত বা স্মার্ত্তগণ এই বেদকে এতটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই চারি বেদের* মধ্যে সাম ও অথর্ব্ববেদই বৈষ্ণব বেদ। বৈষ্ণবদিগের দশকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডে এই দুই বৈদিক মতেরই অনুসরণ করা হইয়া থাকে। শ্রীঅষ্টা-দশাক্ষর গোপালমন্ত্রাশ্রিত বৈষ্ণবমাত্রেরই বেদ—অথর্ব্ববেদ, শাখা—পিপ্পলাদ শাখা।

বহ্বৃচ অর্থাৎ ঋগ্বেদী ঋত্বিক যজমানের রাজ্য নাশ করেন, অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক যজমানের পুত্র নাশ করেন, ছন্দোগ অর্থাৎ সামবেদী ঋত্বিক যজমানের অর্থনাশ করেন; অতএব আথর্ব্বণ ঋত্বিকই প্রকৃত গুরু।

বৈদিক কালে—সেই সত্যাদি যুগেও যখন এরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব দৃষ্ট হয়, তখন বর্ত্তমান কলিকালে এই বৈষ্ণব-প্রধান যুগে কর্ম্মবাদী স্মার্ত্তগণ অসূয়া বশতঃ বিদ্বেষপরবশ হইয়া বৈষ্ণবগণকে নিন্দা ও অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

---

*চারিবেদের ভাষ্য সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য নামক দুই সহোদরে মিলিয়া রচনা করেন, এজন্য এই ভাষ্য সায়ণ-মাধবীয় নামে প্রচারিত। উভয়েই বিজয় নগরের রাজা বুক্ক নরপতির সভাসদ ছিলেন। এই বুক্ক নরপতির বংশধর শ্রীহরিহর। ইনি অথর্ব্ববেদের ভাষ্য রচণা করিতে সায়ণাচার্য্যকে অনুমতি করেন। খৃষ্টীয় ১৩৭৫ অব্দে সায়ণ-মাধব দুই ভ্রাতা বিজয়নগরের রাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। অতএব সায়ণাচার্য্য প্রায় ৫৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

আরও দেখুন—

" যো যস্য মাংস মশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।

মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মাৎ মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫অঃ ১৫।

অর্থাৎ যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে তন্মাংসাদ কহা যায়, যেমন বিড়ালকে মুষিকাদ, নকুলকে সর্পাদ বলে; সুতরাং মৎস্যভোজীকে সর্ব্বমাংসাদ বলা যায়। অতএব মৎস্যভোজন পরিত্যাগ করিবে।

যাহাতে মৎস্যভোজনের এইরূপ কঠিন নিষেধ লিখিত হইয়াছে, আবার সেই গ্রন্থের ৪র্থ, অধ্যায়ে উহার প্রতি কিরূপ অবাধ আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে দেখুন—

" ধানান্ মৎস্যান্ পয়ো মাংসং শাকং চৈব ন নির্ণুদেৎ। ৪।২৫০

অর্থাৎ ধানা (ভৃষ্ট যবতণ্ডুল), মৎস্য, দুগ্ধ, মাংস ও শাক অযাচিতভাবে উপস্থিত হইলে গ্রহণ করিবে—প্রত্যাখ্যান করিবে না। অর্থাৎ যে দিবে তাহার নিকট হইতেই লইবে। মৎস্য এবং মাংসের এমনই মাহাত্ম্য কি যে, কাহাকেও মানা করিও না, যে দিবে, তাহার নিকট হইতেই লইবে?—বাঃ! কি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত!!

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্॥"

মনু ৫অঃ, ৩৫।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে বা মধুপর্কে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভোজন না করে, সে মৃত হইয়া ক্রমে একবিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

ধন্য! মাংস-ভক্ষণের মাহাত্ম্য,—মাংস-ভক্ষণে কি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-গৌরব লাভ! মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পশু হইতে হইবে। ইহা যে সন্ধ্যাবন্দনা অপেক্ষাও বড় ধর্ম্ম! যেহেতু সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে শূদ্রের সমান হইতে হয়, পরন্তু মাংস না খাইলে একুশ জন্ম পর্য্যন্ত পশু হইতে হইবে। অতএব উহাই একটা বড় ধর্ম্ম—যাহাতে মাংস না খাইলে পশু হইতে হয়। এই বাক্যানুসারেই স্মার্ত্ত মহাশয়গণ,

বৈষ্ণবের প্রতি এতদূর 'নারাজ' হইয়াছেন। বৈষ্ণব মাংস ভক্ষণ ত দূরের কথা, কদাপি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। স্মার্ত্ত মাংসভোজন না করিলে ২১ জন্ম নরকে পড়িবেন। অতএব এই বাক্য অনুসারে বেশ বুঝা যায় যে, "শাক্তধর্ম্মই" স্মার্ত্ত আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং এই জন্যই উহাতে মাংস-ভক্ষণের উৎকট মহিমা এরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

আরও দেখুন—

"বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাসো যবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেব চ॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেব চ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥"

মনু ৭ অঃ। শ্লোক ৪১।৪২।

অর্থাৎ বেণ, নহুষ রাজা, সুদাস, যবন, সুমুখ ও নিমি ইহাঁরা সকলেই অবিনয় জন্য বিনষ্ট হইয়াছেন। বিনয়-ধর্ম্মবলে মহারাজ পৃথু এবং মনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছেন, কুবের ধনৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং গাধি-তনয় বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রচলিত মনুস্মৃতি যে সৃষ্টির আদিতে উৎপন্ন এবং বিরাট্ পুরুষের পুত্র মনু কর্ত্তৃক বিরচিত, তাহা উল্লিখিত শ্লোক-প্রমাণে অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। ইহা সৃষ্টির বহুকাল পরে যে রচিত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। যেহেতু উহাতে বেণ, নহুষ, নিমি, পৃথু ও বিশ্বামিত্রের যখন বর্ণন রহিয়াছে তখন এই স্মৃতি যে উহাদের পরে বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্যই এই সব পুরাবৃত্ত ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। আর যদি এই স্মৃতি মনুকর্ত্তৃকই রচিত হইত, তাহা হইলে "মনু বিনয়-বলে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন"—একথা মনু স্বয়ং লিখিতে যাইবেন কেন? আবার ৯ম, অধ্যায়ের ৬৬।৬৭ শ্লোকে বেণরাজা মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী

বলিয়া স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। যথা—

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণোরাজ্যং প্রশাসতি॥
স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥"

অর্থাৎ এই বিধবা-বিবাহ পশুধর্ম্ম বলিয়া সুবিদ্বান্ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বেণরাজার রাজ্যশাসনকালে এই ধর্ম্ম মনুষ্যসমাজে প্রচলিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই রাজর্ষিপ্রবর পুরাকালে সমস্ত ধরণীর অধীশ্বর হইয়া কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই এই বিধি-প্রচলন পূর্ব্বক বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি করেন।

এক্ষণে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই বিধি মনুর পূর্ব্ববর্ত্তীকালে প্রচলিত হইয়াছিল। সুতরাং বেণ রাজার রাজ্যশাসন-সময়ে বিধবা-বিবাহের প্রচার, এই মনুস্মৃতির যে বহুপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই বচনেই সিদ্ধ হইতেছে। (১)

অতএব এই স্মৃতির যে বচন প্রথম অধ্যায়ের ৫৮ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে, তাহ অভ্রান্ত-সত্য বলিয়া কিরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে?—

---

(১) বৈদিক কালেও স্ত্রীলোকেরা প্রথমে একপতির পাণিগ্রহণ করিয়া পুনরায় অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারিতেন। যথা অথর্ব্ববেদ-সংহিতায়—

"যা পূর্ব্বং পতিং বিত্ত্বাথান্যং বিন্দতেঽপরং।
পঞ্চৌদনং চ তাবজং দদাতো ন বি যোষতঃ॥
সমান লোকো ভবতি পুনর্ভুবাপরঃ পতিঃ।
যোঽজং পঞ্চৌদনং দক্ষিণা জ্যোতিষং দদাতি॥ ৯।৫।২৭।২৮।

যে রমণী পূর্ব্বপতি সত্ত্বে অন্যপতি গ্রহণ করেন, অজ-পঞ্চৌদন দান করিলে তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটে না। দ্বিতীয় পতিও যদি দক্ষিণা দ্বারা দীপ্তিমান অজ পঞ্চৌদন দান করেন তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার পুনরুদ্বাহিতা পত্নী উভয়ে একলোকে গমন করেন।

"ইদং শাস্ত্রং তু কৃত্বাহসৌ মামেব স্বয়মাদিতঃ।
বিধিবদ্‌গ্রাহয়ামাস মরীচ্যাদীংস্ত্বহং মুনীন্॥"

অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্বয়ং আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছেন এবং আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি।

এই প্রমাণের দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী-গ্রহণ কেবল দৈব ঘটনা নয়, তাহা শাস্ত্রীয় বিধান ও সামাজিক প্রথারই অনুগত। আবার তৎকালে বিধবা-বিবাহও যে প্রচলিত ছিল, এই মন্ত্রটী পাঠ করিলে তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্যাদিধিষোস্তমেতৎ পত্যুর্জনিত্বমভিসংবভূব॥"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৬ প্রপা, ১অনু, ১৪ মন্ত্র।

সায়ণাচার্য্য ইহার ভাষ্য এইরূপ করিয়াছেন—

"তাং প্রতি গন্তঃ সব্যে পাণাবভিপদ্যোত্থাপয়তি। হে নারি! ত্বং ইতাসুং গতপ্রাণং এতং পতিং উপশেষে উপেত্য শয়নং করোষি, উদীর্ষ্ব অস্মাৎ পতি-সমীপাদুত্তিষ্ঠ, জীবলোকমভি জীবন্তং প্রাণিসমূহং অভিলক্ষ্য এহি আগচ্ছ। ত্বং হস্তগ্রাভস্য পাণিগ্রাহবতঃ দিধিষোঃ পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ পত্যুঃ এতৎ জনিত্বং জায়াত্বং অভিসংবভূব অভিমুখেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি।"

অর্থাৎ ঋত্বিক মৃতপতির সমীপে শায়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বাম হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"হে নারি! তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ কেন? উহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তোমার পুনর্ব্বার পাণিগ্রহণাভিলাষী পুরুষের পত্নীত্ব প্রাপ্তি তোমার সম্যগ্‌রূপে সম্ভব হইয়াছে।

এই ব্যাখ্যানুসারে বিধবা-বিবাহ বেদবিহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে এবং বেদব্যাখ্যাতা সায়ণাচার্য্যেরও যে নিঃসংশয় অভিমত, তাহাও পরিব্যক্ত হইয়াছে।

যদি সৃষ্টির আরম্ভেই এই শাস্ত্র-রচিত হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির অন্ততঃ লক্ষবর্ষ পরে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত উহাতে সংগৃহীত হইল কিরূপে? অতএব ইহাতে এই সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রচলিত মনুস্মৃতি আসল মনুস্মৃতি নহে—যাহা ব্রহ্মা মনুকে এবং মনু, মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে পড়াইয়াছিলেন। দশম অধ্যায়ে বামদেব, ভরদ্বাজ ও বিশ্বামিত্র আদি ঋষির কথা লিখিত থাকায় এই গ্রন্থের আধুনিকতা সহজেই সিদ্ধ হইতেছে। যথা—

"শ্বমাংসমিচ্ছন্নার্ত্তোঽত্তুং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ।
প্রাণানাং পরিরক্ষার্থং বামদেবো ন লিপ্তবান্॥
ভরদ্বাজঃ ক্ষুধার্ত্তস্তু সপুত্রো বিজনে বনে।
বহ্বীর্গাঃ প্রতিজগ্রাহ বৃধোস্তক্ষ্ণো মহাতপাঃ॥
ক্ষুধার্ত্তশ্চাত্তুমভ্যাগাদ্বিশ্বামিত্রঃ শ্বজাঘনীম্।
চণ্ডালহস্তাদাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ ঋষি বামদেব ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ কুক্কুর-মাংস ভোজনাভিলাষী হইয়াও পাপলিপ্ত হন নাই। সপুত্র মহাতপস্বী ভরদ্বাজ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বিজন বনে বৃধুনামক সূত্রধরের বহু গো গ্রহণ করেন। তাহাতে তাঁহার পাপ হয় নাই। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচক্ষণ ঋষি বিশ্বামিত্র ক্ষুৎকাতর হইয়া চণ্ডাল হস্ত হইতে কুক্কুর-মাংস লইয়া ভোজন করিলেও পাপে লিপ্ত হন নাই।

আবার একাদশ অধ্যায়ের ১২শঃ হইতে ১৫শঃ শ্লোকে আরও এক বড় কৌতুকের কথা লিখিত হইয়াছে যে, যদি যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন জন্য ধনের অভাব হয়, তবে বৈশ্য ও শূদ্রের নিকট হইতে সহজে না হয়, বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসিবে। বাঃ! কি সুন্দর অনুশাসন! মনুস্মৃতি কি তবে ডাকাতের "ওস্তাদ"? বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে এইরূপ শত শত বিরোধ ও অসঙ্গতি এই আধুনিক মনুস্মৃতিতে স্থান পাইয়াছে। কয়েকটী উদাহরণ দেখান হইল মাত্র।

এইরূপ বিরোধ ও অসঙ্গতি অন্যান্য স্মৃতিতেও যথেষ্ট আছে। সর্ব্বস্মৃতি-চক্রবর্ত্তিনী মনুস্মৃতিরই সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র করিয়া "যথা রাজা তথা প্রজা" এই ন্যায়কেই নিমিত্ত করা হইল। বুদ্ধিমান্ জন উহা দেখিয়া অবশ্য বিচার করিবেন। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্বাদি স্মৃতিতে শত শত উত্তম সিদ্ধান্ত আছে, দেহাভিমানী কর্ম্মজড়জন তদনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অবশ্য লাভবান্ হইতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু যে সকল স্মার্ত্তম্মন্য মহোদয় আপনাদের উচ্চ জ্ঞানবত্তা প্রকাশ করিতে গিয়া বৈষ্ণবের উপর অযথা আক্রোশ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিজের ঘর-উল্লাস করিয়া দেখাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশের প্রয়াস, নতুবা স্মৃতির মত খণ্ডন বা স্মার্ত্ত-জনের নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে।*

মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগই অপৌরুষেয়—ভগবদ্‌বাক্য। কল্পসূত্র ও অপরাপর যাবতীয় শাস্ত্র পৌরুষেয় অর্থাৎ মনুষ্য-রচিত। মন্ত্র-ব্রাহ্মণের নাম শ্রুতি, উহা স্বতঃ-প্রমাণ। উহাতে ভ্রমপ্রমাদাদি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব কল্পসূত্র ও মনুস্মৃতি প্রভৃতির যে যে অংশ শ্রুতিমূলক তাহাই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রামাণ্য, শ্রুতি-বিরুদ্ধ অংশ অপ্রামাণ্য। যথা—

"শ্রুতিস্মৃতি বিরোধেষু শ্রুতিরেব গরীয়সী।"

শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে পরস্পর বিরোধ দৃষ্ট হইলে শ্রুতিকেই প্রধান বলিয়া মানিতে হইবে। এ বিষয়ে স্বয়ং মনু-সংহিতাও বলিয়াছেন—

"যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥"

১২ অঃ ৯৫।

---

*এই উল্লাসটীর প্রায় অধিকাংশ শ্রীধামবৃন্দাবনবাসী শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাইত শ্রীপাদ মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম কৃত "স্মার্ত্তধর্ম্ম" নামক হিন্দী পুস্তিকা হইতে সঙ্কলিত।

যে সকল স্মৃতি ও তর্ক বেদ-বিরুদ্ধ সে সমুদয় নিষ্ফল জানিবে, এবং সে সকল তমোনিষ্ঠ বা নরক-সাধন বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, অধিকাংশ স্মৃতি বেদ হইতে সঙ্কলিত বা বেদ-সম্মত নহে। পরবর্ত্তি-ঋষিদের স্বকপোল-কল্পিত ও সমাজ-শাসনের অনুকূলে স্বার্থ-প্রণোদিত শাসন-শাস্ত্র বিশেষ। আবার কোন কোন অংশ পরম্পরাগত লোকাচার অবলম্বন করিয়াও লিখিত হইয়াছে। কুমারিল ভট্ট-প্রণীত 'তন্ত্রবার্ত্তিকে' লিখিত আছে—

"তত্র যাবদ্ধর্ম্ম মোক্ষ সমন্ধি তদ্বেদপ্রভম্। যত্বর্থ সুখবিষয়ং তল্লোকব্যবহার পূর্ব্বক মিতি বিবেক্তব্যম্। এষৈবেতিহাস পুরাণয়ো রপ্যুপদেশ বাক্যানাং গতিঃ।"

উহার মধ্যে যে যে অংশ ধর্ম্ম ও মোক্ষ সম্বন্ধীয়, তাহা বেদ হইতে সঙ্কলিত, আর যে যে অংশ অর্থ ও সুখবিষয়ক তাহা লৌকিক আচার-ব্যবহার দৃষ্টে সংগৃহীত হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। ইতিহাস ও পুরাণের উপদেশ বাক্যেরও এইরূপ গতি জানিবে।

চতুর্থ উল্লাস।

——:০:——

পৌরাণিক প্রকরণ।

——:০:——

সাত্বত সম্প্রদায়।

সাত্বত সম্প্রদায়।

বৈদিক বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই সাত্বত নামে অভিহিত। ইতিহাস ও পুরাণাদিতে এই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি-প্রবর্ত্তক সাত্বতগণের বিশেষ পরিচয় ও লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবতে কেশবম্।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্বং সত্বগুণোপেতং ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥
মুকুন্দপাদ-সেবায়াং তন্নাম শ্রবণেঽপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভোক্তা নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥
বন্দনার্চ্চনয়োর্ভক্তি রনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ।
রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানন্যস্য সাত্বতঃ॥"

অর্থাৎ সত্ব ও সত্বের আশ্রয়, সত্বগুণস্বরূপ শ্রীহরিকে যে ব্যক্তি অনন্যমনে সেবা করেন, তিনিই সাত্বত নামে অভিহিত। যিনি কাম্য-কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্বগুণাবলম্বনে সত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্‌কে একান্ত ভক্তি পূর্ব্বক ভজনা করেন তাঁহাকে সাত্বত বলিয়া জানিবে। শ্রীমুকুন্দের পাদপদ্ম সেবায়, তদীয় নাম শ্রবণ-কীর্ত্তনে, তাঁহার স্মরণে, অর্চ্চনে, দাস্যে, সখ্যে ও আত্মসমর্পণে যাঁহার দৃঢ়া রতি বা অনুরাগ তিনিই সাত্বত।

এই প্রমাণে বৈদিককালের সাত্বত-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের ভগবদ্ভজন প্রণালীর ভাব স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট আছে। ফলতঃ এই সাত্বিক-বিধানই যে প্রাচীন বৈষ্ণব-মত তাহা মহাভারতপাঠে নিঃসন্দেহরূপে অবগত হওয়া যায়।

" ভক্ত্যা পরময়া যুক্তৈর্ম্মনোবাক্ কর্ম্মভিস্ততঃ।
নারায়ণপরো ভূত্বা নারায়ণ-জপং জপন্॥" শান্তিপর্ব্ব।

অর্থাৎ পরমাভক্তির সহিত মন, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা নারায়ণপরায়ণ হইয়া নারায়ণমন্ত্র জপ করিবে।

বৈদিক-সাহিত্যে বিষ্ণু ও নারায়ণের নাম যথেষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। সেই প্রাচীনযুগে বিষ্ণুই যে সত্ব নামে অভিহিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রাজা উপরিচর বসু বৈদিক দেবতা, ইন্দ্রের সমসাময়িক ও তাঁহার সখা।

বৈদিককালে সাত্বত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক।

এই উপরিচর বসু সাত্বত ধর্ম্মে দীক্ষিত ছিলেন। সুতরাং বৈদিককালে বৈষ্ণব বা সাত্বত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব সহজেই উপলব্ধ হইয়াছে। যথা, মহাভারতে—

" রাজোপরিচরো নাম বভূবাধিপতি ভুবাঃ।
আখণ্ডলসখঃ খ্যাতো ভক্তো নারায়ণং হরিং॥
ধার্ম্মিকো নিত্যভক্তশ্চ পিতুর্নিত্যমতন্দ্রতঃ।
সাম্রাজ্যং তেন সম্প্রাপ্তং নারায়ণবরাৎ পুরা।
সাত্বতবিধি মাস্থায় প্রাক্সূর্য্য মুখনিঃসৃতম্।
পূজয়ামাসদেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্।" মোক্ষধর্ম্ম।

রাজা উপরিচর বসু যে বৈদিককালের সম্রাট তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি ধার্ম্মিক ও হরিভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নারায়ণের বরেই সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি সূর্য্য-মুখনিঃসৃত সাত্বত-বিধান অনুসারে নিত্য সুরেশ্বর বিষ্ণুর পূজা করিতেন। সুতরাং অতি প্রাচীন যুগেও যে সাত্বত-সম্প্রদায়ের

প্রভাব ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। অধিকন্তু রাজা উপরিচর বসুর বহু পূর্ব্বেও যে সাত্বত বা বৈষ্ণব বিধানের প্রচলন ছিল তাহা "প্রাক্ সূর্য্য-মুখ-নিঃসৃতম্" এই বাক্যে প্রমাণিত হইতেছে। ফলতঃ সাত্বত বিধির আদিম প্রবর্ত্তকই সূর্য্য। কিন্তু সাত্বত ধর্ম্ম অনাদি; ইহার পূর্ব্বেও যে সাত্বত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং এই সাত্বত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক; কালের কুটিল আবর্ত্তে এই ধর্ম্ম কখন প্রকট, কখন বা অপ্রকট হয়। মহাভারত মোক্ষধর্ম্ম পর্ব্বে এই সাত্বত ধর্ম্মোৎপত্তির এক বিস্তৃত ইতিহাস পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ যথা—

"যদাসীন্ মানসং জন্ম নারায়ণ মুখোদ্গতম্।
ব্রহ্মণঃ পৃথিবীপাল তদা নারায়ণঃ স্বয়ং॥
তেন ধর্ম্মেণ কৃতবান্ দৈবং পৈত্রঞ্চ ভারত।
ফেনপা ঋষয়শ্চৈব তং ধর্ম্মং প্রতিপেদিরে॥"

ভগবান্ নারায়ণের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মা, তাঁহার মুখ হইতে আবির্ভূত হইয়া এই ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়া ছিলেন। ব্রহ্মার আবির্ভাবের সময়ে নারায়ণ স্বয়ং এই সাত্বিক ধর্ম্ম প্রকটন করেন। পরে ব্রহ্মার মানস পুত্র ফেনপা ও বৈখানস নামক ঋষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। অনন্তর চন্দ্র ইহাদের নিকট হইতে এই ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে ভগবদিচ্ছায় এই ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অতঃপর ব্রহ্মার দ্বিতীয়বার চাক্ষুষ জন্ম পরিগ্রহের কালে অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের চক্ষু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া সোমের নিকট হইতে এই সাত্বিক ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরে রুদ্রদেবকে উহা প্রদান করেন। তৎপরে বালখিল্য ঋষিগণ সেই যোগারূঢ় মহাদেব হইতে উহা প্রাপ্ত হয়েন। অবশেষে নারায়ণের মায়া প্রভাবে সেই সনাতন সাত্বত ধর্ম্ম আবার তিরোহিত হইয়া যায়।

অনন্তর তৃতীয়বার ব্রহ্মার বাচিক জন্মের পরে অর্থাৎ ব্রহ্মা শ্রীনারায়ণের বাক্য হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ স্বয়ং উহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণ প্রভাবে নারায়ণ হইতে ঐ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যহ তিন বার উহার আবৃত্তি করিতেন। ঐ ধর্ম্ম ঋগ্বেদের মধ্যে কীর্ত্তিত আছে, এজন্য তিনি এতৎ সংক্রান্ত ঋগ্বেদ প্রত্যহ তিনবার পাঠ করিতেন। এই নিমিত্ত কেহ কেহ এই সাত্বত ধর্ম্মকে ত্রিসৌপর্ণ নামে অভিহিত করেন। যথা—

"ত্রিঃ পরিক্রান্তবানেতং সুপর্ণো ধর্ম্মমুত্তমম্।
যস্মাত্তস্মাদ্ ব্রতং হ্যেতৎ ত্রিসৌপর্ণ মিহোচ্যতে॥"

পরে সুপর্ণ হইতে বায়ু এই সনাতন ধর্ম্ম লাভ করিয়া বিঘসাশী মহর্ষিগণকে এবং মহর্ষিগণ উহা মহাসমুদ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে এই ধর্ম্ম পুনরায় নারায়ণে লীন হইয়া যায়।

চতুর্থবার ব্রহ্মা, বিষ্ণুর কর্ণ-বিবর হইতে প্রাদুর্ভূত হইলে, তাঁহার বদন নিঃসৃত আরণ্যকের সহিত সরহস্য এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়েন। তখন ব্রহ্মা সেই নারায়ণের মুখোদিত ধর্ম্মানুসারে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া ঐ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাত্মা স্বারোচিষ মনুকে উহা প্রদান করেন। অনন্তর মনু স্বীয় পুত্র শঙ্খপদকে এবং শঙ্খপদ আপন পুত্র সুবর্ণাভকে এই ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। পরে ত্রেতাযুগ উপস্থিত হইলে আবার ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর পঞ্চম বারে ব্রহ্মা ভগবানের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার নিকট এই ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মা এই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া পরে সনৎকুমারকে উহা প্রদান করেন। অনন্তর সনৎকুমার হইতে প্রজাপতি বীরণ প্রাপ্ত হয়েন। তৎপরে বীরণ স্বীয় পুত্র রৈভ্যকে এবং রৈভ্য স্বীয় পুত্র দিকপতি কুক্ষিনামাকে প্রদান করেন। পরিশেষে সেই ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

ষষ্ঠ বারে ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে পুনরায় ঐ ধর্ম্ম সমুদ্ভব হয়। ব্রহ্মা বিধি পূর্ব্বক ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বর্হিষদ নামক ঋষিগণকে প্রদান করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ নামক এক সামবেদ-পারাদর্শী ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের নিকট উহা লাভ করিয়া মহারাজ অবিকম্পীকে প্রধান করেন। পরিশেষে ঐ সনাতন ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

অনন্তর সপ্তম বার ব্রহ্মা, নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে জন্মগ্রহণ করিলে, শ্রীভগবান্ পুনরায় ঐ ধর্ম্ম তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করেন। তৎপরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ স্বীয় দৌহিত্র আদিত্যকে এবং আদিত্য বিবস্বানকে প্রদান করেন। অতঃপর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান মনুকে এবং মনু, লোক-প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীয় পুত্র ইক্ষাকুকে প্রদান করিলে, তিনি ত্রিলোক মধ্যে উহা প্রচার করিলেন। তদবধি সেই সাত্বত ধর্ম্ম অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে পুনরায় উহা নারায়ণে বিলীন হইবে। ফলতঃ সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ এই বেদ-সম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্ম বা সাত্বত ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং উহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। দেবর্ষি নারদও নারায়ণের নিকট হইতে এই সাত্বত ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই সনাতন সত্যধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুর্লভ। এই সাত্বত ধর্ম্ম যে সম্পূর্ণ ও বেদসম্মত, তাহা মহাভারতে পুনঃপুন লিখিত হইয়াছে—

"তৈরেকমতিভি র্ভূত্বা যৎ প্রোক্তং শাস্ত্রমুত্তমং।
বেদৈশ্চতুর্ভি সমিতং কৃতং মেরৌ মহাগিরৌ॥
প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যস্মাদেতদ্ভবিষ্যতি।
ঋক্ যজুঃ সামভির্জুষ্ট মথর্ব্বাঙ্গিরসৈ স্তথা॥"

আধুনিক পুরাবিদ্‌গণ এই সাত্বত ধর্ম্মের বিপুল ইতিহাস বিশ্বাস করুন বা না করুন, কিন্তু যিনি বেদ বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বেদব্যাস স্বয়ং যখন বলিতেছেন, সাত্বতধর্ম্ম বৈদিক, তখন শাস্ত্রপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই এই শাস্ত্রবাক্যে যে বিশ্বাস স্থাপন করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

সে যাহা হউক, কুর্ম্মপুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, দ্বাপর যুগে যদুবংশীয় সত্বত নরপতি দ্বারা এই সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। যথা—

সাত্বত ধর্ম্মের প্রচারক।

"অথাংশো সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্ত প্রতাপবান্।
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চ্চনা,রতঃ।
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্॥
তস্য নাম্নাতু বিখ্যাতং সত্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্।
সাত্বত স্তস্যপুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহারাজ স্তেন চৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
সাত্বতঃ সত্বসম্পন্নঃ কৌশল্যান্ সুষুবে সুতান্।
অন্ধকং বৈদেহং ভোজং বিষ্ণুং দেবাবৃধং নৃপম্॥" অঃ ২৪।

অর্থাৎ যদুবংশীয় অংশু নৃপতির পুত্র মহাত্মা সত্বত পরম বিষ্ণুভক্ত ও দানশীল ছিলেন। তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বাসুদেব অর্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি কুণ্ডগোলাদি দ্বারা সাত্বত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহার পুত্রের নাম সাত্বত। তিনি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ও পুণ্যশ্লোক নৃপতি ছিলেন। ইহার দ্বারাও সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রচার হইয়াছিল।

(আবার বেদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্থ-নির্ণায়ক ও বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত পুরাণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম এবং সাত্বতী শ্রুতি বা বৈষ্ণবীশ্রুতি নামে অভিহিত। এই শ্রীমদ্ভাগবতেও আমরা বৈষ্ণব-সাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হই। এক শ্রেণীর পণ্ডিতম্মন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তি এই সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ-রচয়িতা বোপদেবের লিখিত বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ

শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব কৃত নহে।

করেন। তাঁহাদের এই অসার মন্তব্য ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত। তাঁহাদের জানা ছিল না যে, বোপদেব হিমাদ্রির সভাপণ্ডিত ছিলেন। হেমাদ্রি-কৃত "চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি" গ্রন্থের দানখণ্ডে পুরাণ-দান প্রস্তাবে, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রশংসাসূচক মৎস্য-পুরাণীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত হেমাদ্রি-কৃত গ্রন্থের পরিশেষ খণ্ডে কালনির্ণয়ে কলিযুগ-ধর্ম্ম-নির্ণয় স্থলে "কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্যাঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদিত ধর্ম্মই কলি কালের জন্য অঙ্গীকৃত করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন "বোপদেব নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরি (দৌলতাবাদ) স্থিত মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্মাধিকরণের পণ্ডিত ছিলেন। আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ১২৬০ অব্দ। ইহাঁর পিতার নাম কেশব কবিরাজ। ইনি পণ্ডিত ধনেশ্বরের ছাত্র। বোপদেব একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্তমাল গ্রন্থে তদ্বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যের যুক্তিতে কাশীরাজ শূর নানা স্থান হইতে ভাগবত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলে পর বোপদেব বহু কষ্টে তাহার উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক তিন খানি টীকা বা সমন্বয় গ্রন্থ রচনা করেন। যথা— হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংস-প্রিয়া। তদ্ভিন্ন মুগ্ধবোধ, কামধেনু প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ফলতঃ বোপদেব ভাগবত-সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা ও ভাগবতোদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়াই ভাগবত বোপদেবকৃত বলিয়া লোকের এক ভ্রান্ত ধারণা উৎপন্ন হইয়াছে।"* ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামীপাদ এ আশঙ্কা নিরাশ করিয়া দিয়াছেন— "ভাগবতং নাম অন্যৎ ইত্যপি—নাশঙ্কনীয়ং" অর্থাৎ ইহা ছাড়া অপর ভাগবত মহাপুরাণ আছে বলিয়া কেহ যেন আশঙ্কা না করেন। এই শ্রেণীর অজ্ঞদের ইহাও বুঝা উচিত ছিল যে, শ্রীভাগবত যদি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের বিরচিত না হয়, তবে ব্যাসদেবের গৌরব কোথায়? যদি শ্রীভাগবত, বেদব্যাসের ভক্তি-সাধনার মধুময় ফল না

* এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ বোম্বায়ে মুদ্রিত—"ভাগবত-ভূষণ" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

হইবে, তবে শতাধিক সুবিখ্যাত প্রাচীন পণ্ডিত ইহার টীকা করিবেন কেন? শত শত প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়া স্ব স্ব নিবন্ধগুলিকে সমলঙ্কৃত করিবেন কেন? এবং ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণখানি শ্রীভগবৎ-বিগ্রহ স্বরূপে সাদরে সম্পূজিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া আসিতেছেন কেন? কি প্রসন্ন গম্ভীর ভাষায়, কি প্রশান্ত সমুন্নত ভাবচ্ছটায়, কি উচ্চতম কাব্য-প্রতিভায়, কি দার্শনিক বিচার মহিমায়, কি সর্ব্বোপরি ভগবৎ-প্রেরিত-শক্তি সাহায্যে ভগবত্তত্ত্ব বিচার-নৈপুণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত ভারতের সমগ্র স্মৃতি, সাহিত্য ও দর্শনাদি গ্রন্থের মধ্যে চিরগৌরবার্হ। শুধু তাহা নহে, অন্যান্য মহাপুরাণেও শ্রীমদ্ভাগবতের মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা।

যথা, মৎস্যপুরাণে—

" যথাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণতে ধর্ম্মবিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর-বধোপেতং তদ্ভাগবত মিষ্যতে॥

* * * * *

লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহাসনান্বিতম্।
প্রৌষ্ঠপদ্যাং-পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমাং গতিম্॥ অঃ ৫৩।

অর্থাৎ গায়ত্রীকে আশ্রয় করিয়া যাহাতে ধর্ম্মের বিভাগ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, যাহাতে বৃত্রাসুরের নিধন-বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসী তিথিতে স্বর্ণসিংহাসনের সহিত দান করেন, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন।

পুনশ্চ স্কন্দপুরাণে—

" শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ।
জাগরে তৎপদং যাতি কুলবৃন্দ-সমন্বিতঃ॥"

অর্থাৎ যিনি ভক্তি পূর্ব্বক হরিবাসরে শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, তিনি কুলবৃন্দের সহিত ভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।

আবার পদ্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে—

"অম্বরীষ শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।

পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভব-ক্ষয়ম্॥"

অর্থাৎ হে অম্বরীষ! যদি সংসার-বন্ধন বিমোচনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া নিত্য এই শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ শ্রবণ কর কিম্বা নিজমুখে পাঠ কর।

এই শ্রীমদ্ভাগবত অতিশয় পূর্ণ অর্থাৎ ইহা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন হওয়ায় ইহার পূর্ণত্বের আতিশয্য উক্ত হইয়াছে। যথা, গরুড় পুরাণে—

"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।

গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ॥

পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, ভারতার্থের নির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ বেদার্থের বিস্তারক সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্ত্তৃক গ্রথিত এবং বেদের মধ্যে সামবেদের ন্যায় পুরাণ সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ফলতঃ পূর্ব্বে বেদব্যাসের মনে সূক্ষ্মাকারে ব্রহ্মসূত্র-রূপে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহাই পরিশেষে সুবিস্তৃতভাবে শ্রীমদ্ভাগবতরূপে প্রচারিত হইয়াছে।

কেহ কেহ অন্যান্য পুরাণের বেদ-সাপেক্ষতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে সে সম্ভাবনা নাই। শ্রীমদ্ভাগবত স্বয়ংই সাত্বতী-শ্রুতি স্বরূপ। যথা শ্রীভাগবতে—

"কথং বা পাণ্ডবেয়স্য রাজর্ষে মুনিনা সহ।

সংবাদঃ সমভূৎ তাত যত্রৈষা সাত্বতী শ্রুতি॥" ১।৪।৭

অর্থাৎ হে তাত! কি প্রকারে এতাদৃশ শুকদেবের সহিত পাণ্ডবকুল-সম্ভূত রাজর্ষি পরীক্ষিতের সংবাদ হইল, যাহা হইতে এই সাত্বতী শ্রুতি বা বৈষ্ণবীশ্রুতি ভাগবত-সংহিতার প্রচার হইয়াছে।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারে শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া লিখিত হইয়াছে—

"রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাংগণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥" ১২।১৩ ১৪

অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত অমৃতসাগর তুল্য শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করা যায় সেই পর্য্যন্তই সাধুগণের সভায় অন্যান্য পুরাণ বিরাজিত হয়।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত যে নিখিল পুরাণাদির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরাণ এবং বৈষ্ণবজনের পরমা শ্রুতি-স্বরূপ তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং এই শ্রীমদ্ভাগবত যে প্রাচীন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাণাদপি প্রিয় ও প্রধানতম ধর্ম্মগ্রন্থ ছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন সাত্বতগণের আর একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল, তাহার নাম নারদপঞ্চরাত্র বা জ্ঞানামৃতসার। বৈষ্ণব মাত্রেই এই গ্রন্থের মান্য করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রসঙ্গতঃ ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ।

এই গ্রন্থখানি পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইল কেন? তদুত্তরে লিখিত আছে—

"রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥"

অর্থাৎ জ্ঞানোপদেশ বাক্যকে রাত্র বলে। এই জ্ঞান পঞ্চ প্রকার। যে গ্রন্থে সেই পঞ্চ প্রকার জ্ঞানের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহাই পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত। এই পঞ্চরাত্র সাত প্রকার।(১) যথা—

"পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং।
ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠ্যং কাপিলং পরং॥
গৌতমীয়ং নারদীয় মিদং সপ্তবিধং স্মৃতং॥"

(১) এতদ্ব্যতীত "ভরদ্বাজ-সংহিতা" ও একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ।

নারদপঞ্চরাত্রের কর্ত্তা নারদ মুনি। এই পঞ্চরাত্র খানি সপ্তম বা শেষ পঞ্চরাত্র বলিয়া, ইহাতে ব্রাহ্ম, শৈবাদি ছয়খানি পঞ্চরাত্র এবং বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র ও সিদ্ধ যোগিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রের সার সার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এজন্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥" ১।২।৪১

অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্র বিধি বিনা আত্যন্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের নিমিত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং পঞ্চরাত্র প্রাচীন বৈষ্ণববিধান হইলেও বর্ত্তমান মাধ্ব-গৌড়েশ্বর-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের পক্ষেও পঞ্চরাত্র-বিধি অপ্রতিপাল্য নহে। তবে এস্থলে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক অধিকার অনুসারে অনুকূল বিধিগুলিই অবশ্য গ্রহণীয়, ইহাই তাৎপর্য্য।

ফলতঃ প্রাচীন কালে বৈষ্ণব ধর্ম্ম, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ-প্রতিপাদিত ধর্ম্মমত লইয়া ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে পরিণত হইয়াছিল। সুতরাং সেই একই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তখন সাত্বত-সম্প্রদায়, ভাগবত-সম্প্রদায়, বৈখানস-সম্প্রদায়, পঞ্চরাত্র-সম্প্রদায় প্রভৃতি বহুসম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী কাল হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তাহা এতদ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হইতেছে। আবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে জানা যায় যে, শ্রীশুকদেব, সম্প্রদায়-ক্রমেই ভাগবত-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যথা—

"তস্মাদিদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণং।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ॥
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যা স্তটে নৃপ।
ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে॥ ১।৭।৪৩।৪৪

অর্থাৎ পূর্ব্বে ভগবান্ চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রথমে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া সেই ভাগবত স্বীয় পুত্র নারদের নিকট বিস্তার করিয়া বলিলেন। তৎপরে মহামুনি বেদব্যাস সরস্বতী-তটে অধ্যাসীন হইয়া যখন ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন তখন নারদ তথায় যদৃচ্ছাক্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ঐ চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করেন। এইরূপ সম্প্রদায়ক্রমে পরে আমি (শুকদেব) ঐ ভাগবত জ্ঞাত হইয়াছি।

শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকায় সাম্প্রদায়িক ভাবের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"তৎ সম্প্রদায়তো ভাগবতং ময়া জ্ঞাতমিত্যাশয়েনাহ নারদ ইতি।"

আরও তৃতীয় স্কন্ধের টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি দুই প্রকারে হইয়াছে। প্রথম শ্রীনারায়ণ-ব্রহ্মা-নারদাদিক্রমে, দ্বিতীয় শেষ-সনৎকুমার-সাংখ্যায়নাদিক্রমে,। যথা—

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

"দ্বিধা হি ভাগবত-সম্প্রদায়প্রবৃত্তিঃ। একতঃ সংক্ষেপতঃ শ্রীনারায়ণাদ্ ব্রহ্ম-নারদাদি দ্বারেণ। অন্যতস্তু বিস্তরতঃ শেষাৎ সনৎকুমার সাংখ্যায়নাদি দ্বারেণ॥"

অতএব বৈদিক সাত্বত-সম্প্রদায়ই কালে ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপিচ প্রাচীন ভক্তগণ, সাক্ষাৎ ভগবত-প্রণীত এই ভাগবত-ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ক্রমেই যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই ভাগবত ধর্ম্মই যে সর্ব্বোত্তম ধর্ম্ম এবং পরম পবিত্র, তাহা নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণে অবগত হওয়া যায়। তদ্ যথা—

"ধর্ম্মং তু সাক্ষাদ্ভগবৎ-প্রণীতং
ন বৈ বিদু ঋর্ষয়ো নাপি দেবাঃ।
ন সিদ্ধমুখ্যা অসুরাঃ মনুষ্যাঃ
কুতো নু বিদ্যাধর-চারণাদয়ঃ॥ শ্রীভাঃ, ৬।৩।১৯

অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত যে ধর্ম্ম তাহা কি ভৃগু প্রভৃতি ঋষি, কি দেবগণ, সিদ্ধ সকল, কি অসুর-নিকর, কি মানবকুল কেহই জানেন না, বিদ্যাধর চারণাদি কি প্রকারে জানিতে পারিবে? তবে যাঁহারা নামসঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহাদের নিকট সে ভাগবত-ধর্ম্ম দুর্জ্ঞেয় নহে। সগুণ স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে কি কর্ম্মী-জ্ঞানীদের অর্থবাদাদি-দোষ-দুষ্ট অন্তঃকরণেই ইহা দুর্ব্বোধ ও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া জানিবে।

ধর্ম্মরাজ আরও বলিলেন—

"স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ং॥" শ্রীভাঃ, ৬।৩।২০

অর্থাৎ হে দূতগণ! কেবল স্বয়ম্ভু, শম্ভু, সনৎকুমার, নারদ, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব এবং আমি—আমরা এই দ্বাদশজনই ভাগবত ধর্ম্ম অবগত আছি।

(অতএব বৈদিক কালে যে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় সাত্বত-সম্প্রদায় নামে প্রচলিত ছিল, তাহা পৌরাণিক কালে ভাগবত বা পঞ্চরাত্র-সম্প্রদায় নামে কথিত হয়।) ক্রমে আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া মধ্যযুগে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল প্রাচীন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভারতের কোন্ কোন্ প্রদেশে প্রবলরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। (ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলই বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম প্রচারের প্রধান ও প্রাচীন ক্রীড়াভূমি ছিল।) কিন্তু সেই প্রাচীন বৈষ্ণবগণের ইতিহাস ও তাঁহাদের ধর্ম্ম-প্রচার-কাহিনী এত অস্পষ্ট যে বহুযত্ন করিয়াও উহার আলোকরেখা অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তবে প্রাচীন সাত্বত, ভাগবত ও বৈখানস প্রভৃতি বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাচীন কালে বৈদিক ও পঞ্চরাত্র-তন্ত্র সম্বন্ধীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-কেতন বহুকাল সমুড্ডীন রাখিয়াছিলেন, তাহাতে

প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারের স্থান-নির্ণয়।

কোন সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের অমল-প্রবাহ উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইতে হইতে কালে সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি পরিপ্লুত করিয়া তুলিয়াছিল। তখন গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর পবিত্রতম তটে তটে অমল-হৃদয় বৈষ্ণবগণের কণ্ঠোত্থিত ভগবানের ভুবন-মঙ্গল নাম-গানে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে অবগত হইতে পারি, কোন সময়ে দ্রাবিড় দেশে ভাগবতগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের পূত-প্রবাহে জনসাধারণকে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী নদীতট বৈষ্ণবগণের আবাসভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। যথা—

"ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ।
তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী॥
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী।
যে পিবন্তি জলং তাষাং মনুজা মনুজেশ্বর॥
প্রায়ো ভক্তা ভগবতি বাসুদেবেঽমলাশয়াঃ॥" শ্রীভাঃ, ১১।৫

করভাজন কহিলেন—"হে মহারাজ! সত্য প্রভৃতি যুগের উৎপন্ন প্রজাগণ কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কারণ, কলিতে উৎপন্ন লোক সকল 'কোন কোন স্থানে' অবশ্যই নারায়ণপর হইবেন। এস্থলে 'কোন কোন স্থানে' বাক্যে গৌড়দেশকেও সূচিত করিয়াছে। কিন্তু হে মহা রাজ! দ্রবিড়দেশে ভূরি ভূরি ভগবদ্ভক্ত লোক জন্মগ্রহণ করিবেন। সেই দ্রবিড়ে তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী, কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী নদী বিদ্যমান রহিয়াছে। হে মনুজেশ্বর! যাঁহারা সেই সকল নদীর জল পান করেন, তাঁহারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া প্রায় ভগবান্ বাসুদেবের ভক্ত হয়েন। আরও লিখিত আছে—

"স্কন্দং দৃষ্ট্বা যযৌ রামঃ শ্রীশৈলং গিরিশালয়ং॥
দ্রবিড়েষু মহাপুণ্যং দৃষ্ট্বাদ্রিং কেকটং প্রভুঃ।
কামকেশীং পুরীং কাঞ্চীং কাবেরীঞ্চ সরিদ্বরাং॥

শ্রীরঙ্গাখ্যং মহাপুণ্যং যত্র সন্নিহিতো হরিঃ।
ঋষভাদ্রিং হরেঃ ক্ষেত্রং দক্ষিণাং মাথুরং তথা॥”

শ্রীভাঃ, ১০।৭৯ অঃ।

অনন্তর শ্রীবলরাম স্কন্দতীর্থ দর্শন করিয়া গিরিশালয় শ্রীশৈলে যাত্রা করিলেন। পরে তথা হইতে দ্রবিড় দেশে মহাপুণ্য কেকট পর্ব্বত দর্শন করিয়া কামকেশী, কাঞ্চীপুরী, সরিদ্বরা কাবেরী ও মহাপুণ্য শ্রীরঙ্গাখ্য তীর্থ দর্শন করিলেন। এই শ্রীরঙ্গাখ্যতীর্থেই শ্রীহরি সন্নিহিত আছেন। অনন্তর হরিক্ষেত্র ঋষভাদ্রি দর্শন করিয়া দক্ষিণ-মথুরা গমন করিলেন। সুতরাং দাক্ষিণাত্য প্রদেশেই যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের লীলাভূমি স্বরূপ হইয়াছিল, তাহা এতদ্দ্বারা সহজেই অনুমিত হইতে পারে।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠে জানা যায়, কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ করিয়া বহুল প্রাচীন বৈষ্ণবতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন এবং দক্ষিণ দেশ হইতেই ভগবত্তত্ত্বপূর্ণ “ব্রহ্ম-সংহিতা” ও ভগবন্মাধুর্য্যের অমৃত-উৎস স্বরূপ “শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃত” নামক শ্রীগ্রন্থ অতীব যত্নের সহিত আনয়ন করিয়া এদেশে প্রচারিত করিয়াছিলেন। ফলতঃ শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্যের প্রাদুর্ভাবের বহু বহু বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অমৃত-নিষ্যন্দিনী ভক্তি-মন্দাকিনী-স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

যে সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে পরস্পর স্বার্থ বশতঃ শান্তিভঙ্গ উপস্থিত হইল, ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্ববিষয়ে ব্রাহ্মণের শাসনে থাকিতে অনিচ্ছুক হইয়া নিজেদের প্রাধান্য ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মণগণও আপনাদের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কখন স্বার্থপর শাস্ত্র রচনা করিয়া, কখন বা প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ করিয়া ক্ষত্রিয়দিগকে পুনরায় আয়ত্তাধীনে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; জানি না শ্রীভগবানের কিরূপ ইচ্ছা, ঠিক সেই সময়েই বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। ক্ষত্রিয়গণ সেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশ করিতে গিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের মূলে

কুঠারাঘাত করিয়া বসিলেন—ব্রাহ্মণ-শক্তির প্রাধান্য হ্রাস করিতে গিয়া বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইলেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পাপমাত্ম-প্রপীড়নম্।"—প্রধানতঃ এই নীতিবাদের উপরই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত হইল—বেদোক্ত যাগযজ্ঞে পশুবলিদানাদি অবৈধ—সুতরাং পাপজনক বলিয়া ঘোষিত হইল। বেদ অপৌরুষেয় নহে—ঋষিবাক্য মাত্র বলিয়া প্রচারিত হইল।

বৌদ্ধনীতি ও বৈষ্ণবধর্ম্ম।

আর প্রচারিত হইল —"জীবে দয়া ও সাম্যভাব।" শ্রীভগবদ্ভাব-বর্জ্জিত জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা আত্মশক্তি লাভই চরমা সিদ্ধি। বৌদ্ধ মতে পুনর্জ্জন্ম স্বীকার আছে; কিন্তু আত্মার নিত্যতা স্বীকার নাই। আত্মার নিত্যতা স্বীকার না করিলে পুনর্জ্জন্ম-বাদের ভিত্তি থাকে কোথায়? সে যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের ঘোর ঘন-ঘটায় যখন ভারতের সনাতন ধর্ম্ম-রবি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছিল, সেই সময় ভারত-গগনে আর একখানি মেঘের উদয় হয়,—তাহা জৈনধর্ম্ম। একদিকে ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার, অন্যদিকে বণিক-স্বভাববিহীন বৈশ্যগণ কর্ত্তৃক জৈনধর্ম্ম প্রচার হইতে লাগিল। ভারতে ঘোরতর ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল। বৈরাগ্য, জীবে দয়া, শম ও সাম্য প্রভৃতি গুণগুলি বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অমূল্য উপদেশ;—এই সাত্ত্বিক ভাবগুলি বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ইহা বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন "অহিংসা পরম ধর্ম্ম," এই ভাবটী বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা বাতুলের প্রলাপ বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু বেদে হিংসা করিতে স্পষ্ট নিষেধ আছে। যথা—

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি।"

অর্থাৎ সমস্ত ভূতমাত্রকে হিংসা করিবে না। অতএব অহিংসারূপ সাত্ত্বিক ভাবটী বেদ হইতেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

ভারত যুদ্ধের পর অজ্ঞান-তমস দ্বারা ভারতের ধর্ম্মাকাশ সমাচ্ছন্ন হইয়া

পড়িলে বেদের জ্ঞান-কাণ্ডের আলোচনা একবারে হ্রাস হইয়া যায়, মাত্র কর্ম্ম-কাণ্ডের অনুষ্ঠানের ফলে লোকের জীবহিংসা-প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। ফলতঃ এই সময় হইতেই ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের অধোগতি আরম্ভ হয়। এই সুযোগে বৌদ্ধ ও জৈনগণ বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের গভীর তত্ত্বের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিয়া বেদমূলক সকল প্রকার ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিতে থাকেন। তদানীন্তন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন কেহ না থাকায় সেই নব অভ্যুদিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারিলেন না। কাজেই জন-সাধারণ সেই অভিনব ধর্ম্মের মোহন-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে সেই জৈন-বৌদ্ধাদি বেদ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সময়েই বৌদ্ধাচার ও বেদাচার এই উভয় আচার সংমিশ্রণে এক অভিনব তান্ত্রিকধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে। পঞ্চ-মকার সমন্বিত এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-মূলক সাধন-ব্যাপার বিশেষ। নব অভ্যুদিত বৌদ্ধ, জৈন, তান্ত্রিকাদি ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে সাত্বত, বৈখানস, পাঞ্চরাত্রাদি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়স্থ বহু অজ্ঞ ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া সেই সকল ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। অধিকন্তু বৈদিক ধর্ম্মের শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় এই সময়ে বেদমূলক বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও যে ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে তখনও বৈষ্ণবধর্ম্ম ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের বিলোপ ঘটে নাই— প্রভাব হ্রাস হইয়াছিল মাত্র।

পঞ্চম উল্লাস।

——:০:——

তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

প্রবৃত্তিপর জীবকে তাহার প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া নিবৃত্তির পথে—শেষে আনন্দরাজ্যে পঁহুছাইয়া দেওয়াই তন্ত্রসাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই তন্ত্রমতের প্রচারক দেবদেব পরমযোগী মহাদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রমত নিতান্ত আধুনিক নহে এবং ইহা কুলবধূর ন্যায় অতি গোপনীয় শাস্ত্র। কলিতে তন্ত্রমতই বলবান্ উক্ত হইয়াছে।

"আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।"

এই তন্ত্রমতে—

পঞ্চ-মকার অর্থাৎ পঞ্চতত্ত্ব—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। সপ্ত-আচার—বেদাচার ১, বৈষ্ণবাচার ২, শৈবাচার ৩, দক্ষিণাচার ৪, বামাচার ৫, সিদ্ধান্তাচার ৬ ও কৌলাচার ৭। ভাবত্রয়—দিব্যভাব ১, বীরভাব ২ ও পশুভাব ৩। বৈদিকাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচার পশুভাবের অন্তর্গত; সিদ্ধান্তাচার ও বামাচার বীরভাবের অন্তর্গত আর কৌলাচার দিব্যভাবের অন্তর্গত।

এই তন্ত্রমত বা আগম শাস্ত্র কল্পিত। জীবকে ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ করিয়া প্রবৃত্তির অবাধ মোহময় হিল্লোলে ভাসাইবার নিমিত্তই ইহার সৃষ্টি। শ্রীভগবান্ জগতে সৃষ্টিধারা বৃদ্ধি করিবার জন্যই মহাদেবকে এই আগমশাস্ত্র প্রচার করিতে আদেশ করেন। মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণাদি, অভিচার ও সকাম বিবিধ কর্ম্মের আপাতমনোরম ফল দর্শন করিয়া স্বাভাবিক রজঃতম-স্বভাবের জীব উহার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। নিবৃত্তিপ্রধান নিষ্কাম বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি সহজে কাহারও চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচরিতামৃতে

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভগবান্ সম্বন্ধ, ভক্তি অভিধেয় হয়।
প্রেম প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়॥
আর যে যে কহে কিছু সকলি কল্পনা।
স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্যে কল্পেন লক্ষণা।
আচার্য্যের দোষ নাই ঈশ্বর আজ্ঞা হৈল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কৈল॥"

এই সকল কল্পিত তন্ত্রকে নাস্তিক শাস্ত্র বলিয়া কেবল শ্রীমন্মহাপ্রভুই যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে,—অবশ্য এই উক্তি আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হেতু অমাদের নিকট বেদবাক্য অপেক্ষাও অধিক মাননীয় ও প্রামাণ্য; কিন্তু যাঁহারা এই বাক্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে সঙ্কুচিত, যাঁহারা ইহাকে বৈষ্ণবদিগের বিদ্বেষ-প্রণোদিত গোঁড়ামী বলিয়া উপহাস করেন, তাঁহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবদিগের কোন সিদ্ধান্ত স্বকপোল কল্পিত নহে— সুদৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের জন্য পৌরাণিক প্রমাণেরও অভাব নাই। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ডে ৬২ম, অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে বলিতেছেন—

" স্বাগমৈঃ কল্পিতৈ স্তঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥ ৩১॥

হে দেব! তুমি কল্পিত আগমশাস্ত্র সমূহ রচনা করিয়া তদ্দ্বারা জীবগণকে আমার প্রতি বিমুখ করিয়া দাও এবং আমাকেও গোপন করিয়া রাখ। তাহাতে আমার এই সৃষ্টি-প্রবাহ উত্তরোত্তর অবিচ্ছিন্ন ভাবে বাড়িয়া চলিবে।

অতএব তন্ত্রমার্গ নিবৃত্তি-প্রধান মার্গ নয়—বরং জীবকে প্রবৃত্তির দাস করিয়া জন্মজন্মান্তর প্রবৃত্তির পথে প্রধাবিত করায়। সৃষ্টি-প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখিবার সহায়তা করে। তাই, শ্রীভক্তমাল গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে—

" প্রকৃতি খণ্ডেতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে।
ভগবান্ কহিলা ঐ মত পঞ্চাননে॥

তোমার শক্তির আরাধনা আদি মন্ত্র।
আমারে গোপন করি কর নানা তন্ত্র॥"

অতএব বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত প্রতিযোগিতার ফলে যে স্মার্ত্তধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে সেই স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তন্ত্র। এই তন্ত্রও জীবের মোহকর এবং কল্পিত বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আবার স্মার্ত্তধর্ম্ম যে দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই শাঙ্কর ভাষ্যও আবার বৌদ্ধ বিমোহনের নিমিত্ত বেদান্তের কল্পিত ভাষ্য।

" ভগবৎ আজ্ঞায় শিব বিপ্ররূপ ধরি।
বেদার্থকল্পিত কৈল মায়াবাদ করি॥"

যথা, পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ২৫শ, অধ্যায়ে মহাদেব ভগবতীকে বলিতেছেন—

" মায়াবাদ মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধ মুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি! কলৌ ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিনা॥"

অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত বেদান্তভাষ্য বা মায়াবাদ অসৎ শাস্ত্র। উহা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মত বলিয়া কল্পিত। কলিকালে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আমিই উহার প্রচার করিয়াছি।

অতএব তন্ত্র ও মায়াবাদ উভয়ই বৈদিক বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্য বৈষ্ণবগণ তান্ত্রিক ও মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সংস্রব হইতে দূরে অবস্থান করেন। স্মার্ত্তধর্ম্মও, মায়াবাদ ও তন্ত্রের মতবাদ লইয়া অভিনব আকারে রূপান্তরিত বলিয়া উহাও বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরোধী। এই জন্যই স্মার্ত্ত বা শাক্ত এবং বৈষ্ণবে চির-বিরোধ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই তান্ত্রিক মত কতকটা বৌদ্ধমতেরই রূপান্তর মাত্র। বৌদ্ধাচার যেরূপ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও বেদ-বিরোধী, তন্ত্রের আচারও সেইরূপ বেদশাস্ত্র, সমাজ ও সদাচার বিরুদ্ধ। এই জন্যই অতি গোপনে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া তান্ত্রিক সাধন-প্রণালী অনুসৃত হইয়া থাকে; নতুবা প্রকাশ্যভাবে অন্ন-বিচার না করা কি অবাধে পরনারী-গ্রহণ করা সমাজের চক্ষে অতীব দূষণীয় বোধ হয়।

অবশ্য তন্ত্রমত প্রথমতঃ মহদুদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়াছিল। শেষে অনধিকারীর হস্তে পড়িয়া এবং বৌদ্ধ মতের সহিত মিলিত হইয়া এক বীভৎস ব্যাপারে পরিণত হয়। মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের (খৃষ্টীয় ১২শ, শতাব্দের প্রারম্ভ) সময় হইতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত প্রায় সার্দ্ধ তিনশত বৎসর কাল এই তান্ত্রিক ধর্ম্মের অবাধ প্লাবনে গৌড়বঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছিল। ফলতঃ ঐ সময় তান্ত্রিক সাধনাই সমগ্র বাঙ্গলার হিন্দুসমাজকে একরূপ গ্রাস করিয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে এই তান্ত্রিক ধর্ম্ম-সাধনার ফলে একদিক দিয়া একটা জাতিবর্ণের অতীত সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতেছিল। তন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ ঘোষণাবাণী—

"প্রবর্ত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ দ্বিজোত্তমাঃ।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্॥" কুলার্ণব তন্ত্র।

হাড়ী মুচি, হীন শূদ্র, চণ্ডাল হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি যে কোন বর্ণের বা যে কোন জাতির লোক, ভৈরবী চক্রের মধ্যে আসিলেই তিনি ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবেন। কিন্তু চক্রের বাহির হইলেই তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হন। ফলতঃ তন্ত্রের চক্রমধ্যে জাতিভেদ সম্পূর্ণ বর্জ্জনীয়। যথা—

"যে কুর্ব্বন্তি নরা মূঢ়া দিব্যচক্রে প্রমাদতঃ।
কুলভেদং বর্ণভেদং তে গচ্ছন্ত্যধমাং গতিম্॥"

যে মূঢ় মনুষ্য দিব্যচক্রে ভ্রমবশতঃ কুলভেদ ও বর্ণভেদ বিচার করে সে নিশ্চয়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

তন্ত্রের এই সার্ব্বজনীন উদারভাব ততটা বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু উহা অতি অন্তরঙ্গ সাধনার অঙ্গ ছিল। পঞ্চ মকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—ইহাই তান্ত্রিক সাধনার উপকরণ।

" মদ্যং মাংসং তথা মীনং মুদ্রা মৈথুন মেব চ।
এতে পঞ্চ মকারাঃ স্যু র্মোক্ষদা হি যুগে যুগে ॥" কালীতন্ত্র।

তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব।

মদ্যপান সম্বন্ধে তন্ত্রের উপদেশ এই যে, মদ্যপান করিতে করিতে যে পর্য্যন্ত নেশার ভরে ভূতলে পতন না হয়, তাবৎ মদ্যপান করিবে। পরে উঠিবার শক্তি হইলে উঠিয়াও পান করিবে—তাহা হইলে আর পুনর্জন্ম হইবে না। যথা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

" পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।
পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥"

এই সকল তন্ত্রবাক্যের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া অধুনা অনেকেই সমাজকে ভুলাইবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে, এই সকল তন্ত্রমত বৌদ্ধাচার-দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী লোকদিগকে সংযত করিবার জন্যই যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইবে। তাহাদের সেই তামস স্বেচ্ছাচারের প্রবাহে ধর্ম্মভাবের বাঁধ দিয়া বাধা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদিগকে সংযত করিয়া বৈদিক আচারের দিকে উন্মুখ করাই তান্ত্রিক ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মদ্যপানের উপকরণ মাংস, মৎস্য ও মুদ্রা বা চাট্; এ সকলের বিষয় বর্ণন, বাহুল্য মাত্র। শেষতত্ত্ব মৈথুনের সম্বন্ধে তন্ত্র কি ভয়ানক উপদেশ দিয়াছেন দেখুন—যথা, জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র—

" মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু।"

কেবল গর্ভধারিণী মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া তারপর বধূ, কন্যা, ভগিনী হইতে আচণ্ডাল সকল বর্ণের সকল স্ত্রীলোককেই সম্ভোগার্থ গ্রহণ করিবে। বেদশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে এরূপ ভাবে পরস্ত্রীহরণ মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাই উক্ত তন্ত্র বলিতেছেন—" দূর করিয়া দাও ঐ সকল শাস্ত্রের কথা—ঐ সকল শাস্ত্র ত সাধারণ বেশ্যার ন্যায়!—

" বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্যা গণিকা ইব।
একৈব শাম্ভবী মুদ্রা গুপ্তা কুলবধূরিব ॥"

একমাত্র শিবপ্রোক্ত তান্ত্রিক ক্রিয়াই কুলবধূর ন্যায় অতি গোপনীয়। ভৈরবী চক্রে যে সকল নরনারী লইয়া চক্র গঠিত হয়, তন্মধ্যে পরস্পর বিবাহ প্রথাও আছে। তবে তাহাদের বর্ণ-বিচার নাই। যথা, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে—

"বয়োবর্ণবিচারোঽত্র শৈবোদ্বাহে ন বিদ্যতে।
অসপিণ্ডাং ভর্ত্তৃহীনা মুদ্বহেচ্ছম্ভু শাসনাৎ॥"

অর্থাৎ শৈবোদ্বাহে বয়স বা বর্ণ-বিচার নাই। ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডাকেও বিবাহ করা যাইতে পারিবে, ইহাই শম্ভুর শাসন। ইহাদের মধ্যে আবার সন্তানও হইত এবং তাহারা নিম্নলিখিত বিধানে জাতিবর্ণের মধ্যে পরিগণিত হইত। যথা—

"শৈবো ভার্য্যোদ্ভবাপত্য মনুলোমেন মাতৃবৎ।
সমাচরেদ্বিলোমেন তত্তু সামান্য জাতিবৎ॥" ঐ

অনুলোমক্রমে বিবাহিতা ভার্য্যার গর্ভজাত পুত্র মাতৃতুল্য বর্ণ প্রাপ্ত হইবে, বিলোমক্রমে বিবাহ হইলে তদ্‌গর্ভজ পুত্র সামান্য জাতির ন্যায় হইবে।

দিব্যভাব-প্রাপ্ত সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধকের আচরণ সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিয়াছেন শুনুন। যথা জ্ঞানসঙ্কলনী তন্ত্র—

"হালাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে সুপ্তো নিশায়াং গণিকাগৃহেষু
বিরাজতে কৌলব-চক্রবর্ত্তী।"

যিনি মদ্য-বিক্রেতার দোকানে মদ্যপান করিয়া রাত্রিতে বেশ্যালয়ে অবস্থান করেন—অর্থাৎ যিনি সমস্ত শাস্ত্র, সদাচার ও সমাজের শাসনকে পদ-দলিত করিয়া ঐরূপ যথেচ্ছ আচরণ করেন, তিনিই কৌল-রাজচক্রবর্ত্তী।

তান্ত্রিক সাধকগণ, এইরূপে যে কোন পরনারীকে বা যে কোন আত্মীয়াকেও শৈবমতে বিবাহ করিয়া তাহাকে স্বকীয়া পত্নীরূপে—সাধনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। সুতরাং তাহাদের সহিত স্ত্রীরূপে ব্যবহার করিলে কোনরূপ পাতকের আশঙ্কা নাই। কেবল মাতৃযোনিই বিচার আছে; কিন্তু লিখিতে হস্ত কম্পিত হয়,—মাতঙ্গী বিদ্যার

তন্ত্রে বীভৎস আচার।

উপাসকগণ সে বিচারও মানেন না। তাঁহাদের চক্রমধ্যে স্বীয় জননী আসিলেও "মাতরমপি ন ত্যজেৎ"—তাহাকেও ত্যাগ করেন না। ইহা অপেক্ষা নারকীয় বীভৎস কাণ্ড—ইহা অপেক্ষা পাশব-প্রবৃত্তির পরিচয় আরও আছে কি না জানি না। পশুদের মধ্যে মহিষও স্বীয় মাতৃযোনি বিচার করে, শুনিয়াছি, ইহারা যে তদপেক্ষাও অধম! হউক তন্ত্রের উদ্দেশ্য প্রবৃত্তির মধ্য দিয়া জীবকে নিবৃত্তির পথে উন্নীত করা—হউক, শেষতত্ত্বে জীবের সর্ব্বত্র নারীজাতির মধ্যে মাতৃত্বের বিকাশ সাধন; কিন্তু ধর্ম্মের নামে এরূপ জঘন্য নারকীয় দৃশ্য একবারেই অসহ্য!

তন্ত্রে সতীধর্ম্মের আদৌ আদর নাই। বরং নীচ-জাতীয়া স্ত্রী-সংসর্গে অধিক পুণ্য-সঞ্চয় হয়—পবিত্র তীর্থকৃত্যের ফল লাভ হয়। যথা, রুদ্রযামল তন্ত্রে—

"রজঃস্বলা পুষ্করং তীর্থং চাণ্ডালী তু স্বয়ং কাশী।
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা॥"

অর্থাৎ রজঃস্বলা স্ত্রী পুষ্কর-তীর্থ-স্বরূপা, চণ্ডাল-রমণী কাশী-তীর্থ-স্বরূপা, চামার বা মুচির মেয়ে প্রয়াগ-তীর্থ-স্বরূপা, রজকের রমণী মথুরা-তীর্থ-স্বরূপা। বোধ হয়, এই জন্যই বৈষ্ণব-তান্ত্রিক চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া গেলে, বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্ম্মের অবাধ প্রচারে বাঙ্গলা দেশে কিরূপ বীভৎস আচার প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা উপরোক্ত বর্ণনার আভাসেই বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিয়া লইবেন। তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারের এই পশুবৎ ঘৃণ্য আচরণের ফলেই এই গৌড়বঙ্গের বহুতর সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আর্য্য-অনার্য্যের সংমিশ্রণে ঐ সঙ্কর জাতির পুষ্টি-প্রবাহ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই ত গেল তন্ত্রের কথা, তারপর যে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদের উপর স্মার্ত্ত-ধর্ম্মের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, সেই মায়াবাদও কিরূপ ভাবে ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতেছে। পৌরাণিক যুগে নিয়োগ-প্রথানুসারে স্বামীর অভিমতে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদনের বিধি ছিল। ইহার প্রমাণ

স্বরূপ নিম্নোদ্ধৃত শ্রৌতবাক্য উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা ছান্দোগ্যে—

"উপমন্ত্রয়তে স হিঙ্কারো, জ্ঞাপয়তে স প্রস্তাবঃ, স্ত্রিয়া সহ শেতে স উদ্‌গীথঃ, প্রতি স্ত্রী সহ শেতে স প্রতিহারঃ কালং গচ্ছতি তন্নিধনং পারং গচ্ছতি, তন্নিধনমেতদ্বামদেব্যং মিথুনে প্রোতম্।

স য এবমেতৎ বামদেব্যং মিথুনে প্রোতং বেদং মিথুনী ভবতি। মিথুনান্মিথুনাৎ প্রজায়তে সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্‌ জীবতি মহান্‌ প্রজয়া পশুভির্ভবতি মহান্‌ কীর্ত্ত্যা ন কাঞ্চন পরিহরেৎ তদ্‌ব্রতম্॥" ২য় প্রপাঃ ১৩ খণ্ড।

কোন রমণী অপত্যলাভের অভিলাষে কোন ব্রহ্মচারীর সমাগমার্থিনী হইলে, তাহার বাক্যের দ্বারা সঙ্কেত করণের নাম হিঙ্কার, জ্ঞাপনের নাম প্রস্তাব, স্ত্রীর সহিত শয়ন উদ্‌গীথ, স্ত্রীর অভিমুখে শয়ন প্রতিহার, কালযাপন নিধন, এই বামদেব্য নামক সাম মিথুনে সন্নিবিষ্ট।

যিনি এই বামদেব্য সামকে মিথুনে সন্নিবিষ্ট জানেন, তিনি মিথুনীভাব লাভ করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যেক মিথুনে প্রজা লাভ করেন, পূর্ণায়ু লাভ করেন, প্রোজ্জ্বল জীবন লাভ করেন, প্রজা, পশু ও কীর্ত্তিতে মহান্‌ হয়েন। সুতরাং কোন স্ত্রীকেই পরিত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত।"

বেদ-বিভাগকর্ত্তা স্বয়ং ব্যাসদেবও যখন ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন উক্ত প্রমাণ, এই বিধানের পোষক হইতে পারে; সমাগমার্থিনী স্ত্রীলোক সুন্দরী, কুৎসিতা, যুবতী কি প্রৌঢ়া, কি উচ্চবর্ণা কি নীচবর্ণা এরূপ বিচার করিয়া কিম্বা পরাঙ্গনা-গমন-পাপ ভয়ে তাহাকে ত্যাগ করিবে না, ইহাই ব্রত।

অতি প্রাচীন কালে—যে সময়ে বিবাহের তাদৃশ বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নাই—কি জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয় নাই, সেই সময়ের জন্যই এই বিধি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।* ব্রহ্মচারীর ব্রতভঙ্গের আশঙ্কায় "জীবনং বিন্দুধারণং মরণং

* মহারাজ বল্লালসেনের সময় পর্য্যন্ত এই প্রথা অক্ষুণ্ণ ছিল। পরে পোষ্যপুত্র গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এই কুৎসিত প্রথা রহিত হইয়া যায়।

বিন্দুপাতনাৎ" —এই নিধন আশঙ্কায় স্ত্রী-সংসর্গ হইতে দূরে থাকিতেন, জীব-সৃষ্টি প্রবাহে বাধা প্রদান করিতেন, তাঁহাদের জন্যই এই শ্রৌতবাক্য লিপিবদ্ধ হইয়াছিল—" সমাগমার্থিনী কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না।"

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই শেষ বাক্যাংশের কিরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুন—

"ন কাঞ্চন কাঞ্চিদপি স্ত্রীয়ং স্বাত্মতল্পপ্রাপ্তং ন পরিহরেৎ. সমাগমার্থিনীং বামদেব্যং সামোপাসনাঙ্গত্বেন বিধানাদেতদন্যত্র প্রতিষেধ স্মৃতয়ঃ বচন-প্রামাণ্যাচ্চ শাস্ত্রেণাস্য বিরোধঃ।" শাঙ্করভাষ্য।

কোন স্ত্রীলোককে নিজতল্পে সমাগম-প্রার্থিনীরূপে প্রাপ্ত হইলে তাহাকে সাম উপাসনার অঙ্গ হেতু পরিত্যাগ করিবেনা। পরাঙ্গনাগমন-নিষেধ-সূচক স্মৃতির প্রমাণ অপেক্ষা উপনিষদের শ্রৌত-প্রমাণ অধিক প্রামাণ্য।

মায়াবাদে ব্যভিচার।

আবার আনন্দগিরি শ্রীশঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যকে আরও বিকৃত ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"কাঞ্চিদপীতি পরাঙ্গনাং নোপগচ্ছেদিতি স্মৃতিবিরোধ মাশঙ্ক্যাহ। বামদেব্যেতি বিধি-নিষেধয়োঃ সামান্য বিষয়ত্বেন ব্যবস্থা প্রসিদ্ধেতি ভাবঃ। কিঞ্চ শাস্ত্র প্রামাণ্যাদত্র ধর্ম্মোবগম্যতে। ন কাঞ্চন পরিহরেদিতি চ শাস্ত্রাবগমত্বাদবাচ্য মপি কর্ম্ম ধর্ম্মো ভবিতুমর্হতি। তথা চ শ্রৌতার্থ দুর্ব্বলায়া স্মৃতের্ন প্রতিস্পর্দ্ধতেত্যাহ বচনেতি। যথোক্তোপাসনাবতো ব্রহ্মচর্য্য নিয়মাভাব ব্রতত্বেন বিবক্ষিত তন্ন প্রতিষেধ-শাস্ত্রবিরোধাশঙ্কেতি ভাবঃ।"

স্মৃতিশাস্ত্রে পরাঙ্গনাগমন-নিষেধসূচক বিধি দৃষ্ট হয়, সুতরাং কিরূপে পরাঙ্গনাগমন করিবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন " বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা সামান্য বিশেষ লইয়া হইয়া থাকে। এস্থলে পরাঙ্গনাগমন-নিষেধের ব্যবস্থা সামান্য বিধিমাত্র। সুতরাং এই শাস্ত্রোক্ত পরাঙ্গনাগমন বিশেষ-বিধি হওয়ায় ইহার নিষেধ হইতে পারে না। বরং শাস্ত্র-প্রামাণ্য হেতু, ইহাতে ধর্ম্মই হইবে। অতএব

কোন স্ত্রীলোককেই পরিত্যাগ করিবে না। বেদশাস্ত্রে যখন এরূপ বিধান আছে, তখন এই অবাচ্য কর্ম্মও ধর্ম্ম হইতে পারে। যেহেতু শ্রুতিবাক্যের তুলনায় স্মৃতির বিধান দুর্ব্বল। যদি বলেন, এই ভাবে পরাঙ্গনা-বিলাস ব্যভিচার-দোষ-দূষিত না হইলেও সাধকের ব্রহ্মচর্য্য-ভ্রংশ্য ত অবশ্য হইতে পারে? না তাহা হইতে পারে না। যথোক্তরূপে উপাসনাভাবে পরাঙ্গনা-বিলাসে দণ্ডী, সন্ন্যাসী কি ব্রহ্মচারিদিগের ব্রহ্মচর্য্যব্রত ভঙ্গ হয় না। অতএব কোন প্রতিষেধ শাস্ত্রের নিষেধাশঙ্কা করিবে না।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং অমরক রাজার মৃতদেহে যোগবলে প্রবেশ করিয়া তাঁহার রাণীদের সহিত কন্দর্প-ক্রীড়াসুখ-সম্ভোগ করিয়াছিলেন। মাধবীয় "শঙ্কর-বিজয়" গ্রন্থের ১০ম, অধ্যায়ে—"অধরদংশং বাহ্বাবাহ্বং মহোৎপলতাড়নং রতিবিনিময়ং" ইত্যাদি কত আদিরসের কথা লিখিত হইয়াছে।

অহো! এই ত মায়াবাদ সিদ্ধান্ত!! এই ত ব্যভিচারের প্রবল প্রশ্রয়! এই ব্যভিচারদুষ্ট মায়াবাদসিদ্ধান্ত ও তান্ত্রিক মত লইয়াই ত স্মার্ত্তমতের সৃষ্টি!! যে সম্প্রদায়ে পরাঙ্গনা-বিলাস বৈদিক উপাসনাঙ্গ বলিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই সম্প্রদায়ের অনুগত লোকেরা যদি বিশুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে ব্যভিচারদোষে দূষিত বলেন,—তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর হাসির বিষয় কি হইতে পারে? অহো! যে পবিত্র বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে একটী অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধার নিকট হইতে তণ্ডুল ভিক্ষা করা অপরাধে শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে গুরুতর অপরাধিজ্ঞানে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, প্রাণান্তেও তাঁহাকে ক্ষমা করেন নাই এবং মেঘমন্দ্রে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥" শ্রীচৈঃ চঃ। অন্তঃ।

সেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ব্যভিচার-দুষ্ট! কি সর্ব্বনাশ! ইহা যেন "চালুনীর

সূচের নিন্দার " মত উপহাসাস্পদ ! মায়াবাদ ভাষ্যে এই সকল অপসিদ্ধান্ত আছে বলিয়াই শ্রীচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—" মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" সত্য বটে, আজ কাল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউল, ন্যাড়ানেড়ী, সাঁঞি, দরবেশ প্রভৃতি কতকগুলি পরাঙ্গনা-বিলাসী উপসম্প্রদায় দৃষ্ট হয়, উহাঁরা ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতানুবর্ত্তী নহেন; উহাদের মতবাদ যে সেই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও মায়াবাদিদের বেদ-বিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তের বৈষ্ণবাকারে রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নয়! তান্ত্রিক ও মায়াবাদিগণ আচার-ব্যবহার দ্বারা যে কেবল আপন সম্প্রদায়কেই বেদ-বিরোধী করিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু উহার প্রবল প্রভাব বিশুদ্ধ বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কেও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং তাহারই ফলে বাউল, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি বৈষ্ণব বামাচারী তান্ত্রিকদলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাঁদের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের এবং গৌড়াদ্য-ব্রহ্ম-বৈষ্ণব জাতির কি আচারে কি ব্যবহারে কি সিদ্ধান্তে কোনরূপ সম্বন্ধ-সংস্রব নাই। অথচ উহাঁরা সমাজ-শরীরের দুষ্টক্ষত রূপে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে কলুষিত করিতেছেন।

মায়াবাদ-সিদ্ধান্তে পরবনিতা-বিনোদন যেরূপ শ্রৌত-বিধি বলিয়া উদ্ঘোষিত হইয়াছে, তন্ত্রের মদ্য-মাংসাদি তত্ত্ব সেবনের তেমন প্রকাশ্য বিধি না থাকিলেও ঐ সম্প্রদায়ে গুপ্তভাবে উহার প্রচলন যথেষ্টরূপেই আছে। প্রাণতোষিণী, দণ্ডী-প্রকরণে লিখিত আছে—

" পঞ্চতত্ত্বং সদা সেব্যং গুপ্তভাবে জিতেন্দ্রিয়ঃ।"

ফলতঃ শাক্তদের যেমন 'পশ্বাচারী' ও 'বীরাচারী' নামে দুই সম্প্রদায় আছে, ইহাদেরও সেইরূপ দুইদল আছে শুনিতে পাই। কোন কোন দণ্ডী অতি সঙ্গোপনে মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করেন, অপর কেহ কেহ করেন না।

ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়।

এই সন্ন্যাসী মহোদয়গণের দণ্ডাগ্রভাগে যেরূপ মহামায়া অবস্থান করেন,

তদ্রূপ অন্তরঙ্গ গোষ্ঠীতে মহাবিদ্যা অবস্থিতি করেন। এই মহাবিদ্যার পরিচয় শুনুন—

"কুলাচার-পরায়ণ দণ্ডী ও পরমহংসেরা যেরূপ চক্র করিয়া সুরাপানাদি করেন তাহার নাম মহাবিদ্যা। কিন্তু সকল দণ্ডী বা পরমহংস এরূপ আচরণ করেন না।" (ভাঃ উঃ সঃ।)

এইরূপে যে সমাজের পুরুষেরা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া—ভৈরব বা দণ্ডী আখ্যা ধারণ করিয়া পরদার-গ্রহণ করিয়াও দোষী হয়েন না এবং স্ত্রীলোকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভৈরবী বা শক্তি নামে অভিহিতা হইয়া পরপুরুষের সহিত বিবিধ লীলাখেলা করিলেও হিন্দুজনসাধারণের চক্ষে দূষণীয় হন না; বরং সসম্মানে পূজা লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বৈষ্ণব-বামাচারী তান্ত্রিকদের ঐরূপ কোন কদাচার দর্শন করিয়া বিশুদ্ধ বেদাচার-সম্মত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং এমন কি গৃহস্থ গৌড়াদ্য-বৈষ্ণবজাতি-সমাজের নামেও সাধারণ বর্ণাশ্রমী স্মার্ত্ত-সম্প্রদায় ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। চিরাচরিত সংস্কারবশে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবজাতি-সমাজের অযথা কুৎসা রটনা করিয়া রসনা-কণ্ডুতি-নিবৃত্তি করিবার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে আমরা বলি, প্রথমতঃ স্ব স্ব গৃহ-ছিদ্র পর্য্যবেক্ষণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

তান্ত্রিক বীরাচার-সাধন কোন্ সময়ে বৈষ্ণব-রস-সাধনে রূপান্তরিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি এই মতের সাধক ভক্ত ছিলেন। কবি বিদ্যাপতি খৃষ্টীয় ১৩৭৪ অব্দে এবং চণ্ডীদাস খৃষ্টীয় ১৩৮৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং জয়দেব খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সভাসদ্ ছিলেন। সুতরাং ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে বাঙ্গলা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, সেই সময়েই বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও হিন্দু তান্ত্রিকগণ স্ব স্ব তন্ত্রমতকে বৈষ্ণবধর্ম্মে রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং তন্ত্রের

মতে নায়িকা লইয়া অর্থাৎ পরনারীসঙ্গ করিয়া—অবশ্য বিশুদ্ধ প্রেমভাবে সাধন-ভজনে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তন্ত্রেও অষ্ট নায়িকা, বৈষ্ণবমতেও অষ্টসখী, তন্ত্রমতে পঞ্চতত্ত্ব, বৈষ্ণবমতেও পঞ্চরস, পঞ্চতত্ত্ব ইত্যাদি। এইভাবে রূপান্তরিত করিয়া উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে তাই, বাউল, দরবেশ, সহজীয়া প্রভৃতি বৈষ্ণব-উপসম্প্রদায়িদের মধ্যে তন্ত্রোক্ত অধিকাংশ সাধন-পদ্ধতি ও আচার মন্ত্রও অধিকাংশ তন্ত্রোক্ত। এই জন্যই বেদাচারী বিশুদ্ধ গৃহী-বৈষ্ণবগণের আচার পরিদৃষ্ট হয়। ব্যবহারের সহিত ঐ সকল বামাচারী বৈষ্ণবদের আচার-ব্যবহারের কোনই সামঞ্জস্য নাই। গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহার যে সম্পূর্ণ বৈদিক তাহা পরে আলোচিত হইবে।

ষষ্ঠ উল্লাস।

——:o:——

ঐতিহাসিক প্রকরণ।

(বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রাদুর্ভাবে ভারতের ধর্ম্মাকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের সেই ঘোর দুর্দ্দিনে—সনাতন ধর্ম্মের সেই শোচনীয় অবস্থার সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা ভারতে বৌদ্ধ ও জৈনাদি ধর্ম্মের প্রভাব খর্ব্ব করিয়া দেন। অতঃপর ভারতে সনাতন ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় আরম্ভ হইল। ইহাঁর বহুপূর্ব্বে খৃষ্টীয় ৭ম, শতাব্দিতে দাক্ষিণাত্যবাসী কুমারিলভট্ট অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে বিকৃত বৌদ্ধধর্ম্মের বিপক্ষে তর্কযুদ্ধ করিয়া স্বদেশকে নাস্তিক্যবাদ হইতে উদ্ধার করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, ইনিই সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনে যত্নপর হন। ইনি বৌদ্ধদিগকে নির্য্যাতিত করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের রাজগণকেও উত্তেজিত করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রণীত 'পূর্ব্ব-মীমাংসা'র ভাষ্য এবং বৈদিক-দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কুমারিলের পর খৃষ্টীয় ৭৮৮ অব্দে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কেরল দেশস্থ চিদম্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অসামান্য প্রতিভাবলে ইনি অল্পবয়সেই সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। শঙ্কর বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা পুনরুড্ডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠস্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও শাস্ত্রালোচনার পথ সুগম করিয়া দিলেন।

শঙ্করের ধর্ম্মমত বেদান্তের উপর স্থাপিত বটে, কিন্তু তিনি সাধারণের জন্য শৈবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত ৪টী মঠ, শিষ্য-পরম্পরা আজ পর্য্যন্ত চালিত হইতেছে। সেই চারিটী প্রধান মঠের নাম, দ্বারকায়—সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, এবং বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। শঙ্করাচার্য্য

শিবাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সৌর পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈশ্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি"। ইনি কেদারনাথতীর্থে মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যে অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন তাহা বৌদ্ধ-বিমোহন মায়াবাদ মাত্র। অর্থাৎ বৌদ্ধাদি বেদ-বিরোধী ধর্ম্মবাদকে নিরসন পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবদাজ্ঞা ক্রমে ভগবত্তত্ত্ব গোপন করিয়া মায়াবাদ অবলম্বনে উপনিষদের ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন। কিন্তু বিচারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইতে অবশেষে তাঁহার মায়াবাদ বৌদ্ধমতের দিকে এত অধিক অগ্রসর হইয়া পড়িল যে, মায়াবাদে ও বৌদ্ধমতে প্রভেদ অতি কমই রহিল। ফলতঃ শঙ্করের মায়াবাদ দ্বারা শ্রৌত স্মার্ত্তধর্ম্ম রক্ষা বিষয়ে সহায়তার পরিবর্ত্তে অনিষ্টই অধিক হইল। এইজন্যই পদ্ম পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ।

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।"

অতএব মায়াবাদ সিদ্ধান্ত যে বেদ-বিরুদ্ধ এবং উহা যে বৌদ্ধ মতাবলম্বিগণের মত নিরসন-উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য্য কি উদ্দেশ্যে এই মায়াবাদ প্রচার করিলেন এবং বৈদিক সনাতন ধর্ম্মের কোন্ স্তরে মায়াবাদ স্থান পাইবার যোগ্য, বৌদ্ধ-সংস্কারগ্রস্ত জনসাধারণের হৃদয়ে সে তত্ত্ব বদ্ধমূল হইবার পূর্ব্বেই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার শিষ্যগণ তদীয় অভিপ্রায় ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া এক অদ্বৈতবাদের নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন।

এই শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবের সময়ও বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিজয়-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য জিগীষা-পরবশ হইয়া তদানীন্তন বহু বৈষ্ণবাচার্য্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণবদিগকে স্বীয়মতে আনয়ন করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার হইয়াছিল। তবে অনেকেই যে শঙ্করের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ

শঙ্করাচার্য্যের সময় যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল শঙ্কর-শিষ্য আনন্দ গিরি, "শঙ্কর-দিগ্বিজয়" গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন—তদ্‌যথা—

"ভক্তাঃ ভাগবতাশ্চৈব বৈষ্ণবাঃ পঞ্চরাত্রিণঃ।
বৈখানসাঃ কর্ম্মহীনাঃ ষড়্‌বিধা বৈষ্ণবা মতাঃ॥
ক্রিয়াজ্ঞান বিভেদেন ত এব দ্বাদশাভবন্॥" ষষ্ঠ প্রঃ।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।

অর্থাৎ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে ভক্ত, ভাগবত, বৈষ্ণব, পাঞ্চরাত্র, বৈখানস ও কর্ম্মহীন এই ছয়টী সম্প্রদায় ছিল। ক্রিয়া ও জ্ঞানভেদে তাঁহারাই দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। আনন্দগিরি উক্ত প্রধান ছয় সম্প্রদায়ের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এস্থলে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

১ম, ভক্ত-সম্প্রদায়।—এই সম্প্রদায়ের উপাস্য বাসুদেব। ইহারা শ্রীভগবানের অবতার স্বীকার করেন এবং শ্রীভগবানের উপাসনা দাস্যভাবে করিয়া থাকেন। স্মার্ত্ত কর্ম্ম ইহাদের মতে অপ্রামাণিক। জ্ঞান ও ক্রিয়াভেদে ইহাদের আচার দ্বিবিধ। জ্ঞানী কর্ম্ম করেন না, কর্ম্মী কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করেন।

২য়, ভাগবত-সম্প্রদায়।—শ্রীভগবানের স্তোত্রবন্দনা ও কীর্ত্তনাদি এই সম্প্রদায়ের উপাসনা। যথা—

"সর্ব্ববেদেষু যৎ পুণ্যং সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলং।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি স্তুত্বা দেবং জনার্দ্দনং॥"

পর, ব্যূহ, বিভব ও অর্চ্চা এই চারিমূর্ত্তি স্বীকৃত। পরবর্ত্তী কালে শ্রীরামানুজাচার্য্য এই সম্প্রদায়কে উজ্জ্বল করেন।

৩য়, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়।—শ্রীনারায়ণ-বিষ্ণুই এই সম্প্রদায়ের উপাস্য। ইহারা বাহুমূলে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" এই মন্ত্রে উপাসনা করেন। গতি—শ্রীবৈকুণ্ঠধাম।

৪র্থ, পঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়।—ইঁহারা শ্রীভগবদর্চ্চামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। মহাভারত রচনার পূর্ব্বে এই পাঞ্চরাত্র বিধান প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র, শাণ্ডিল্য-সূত্র প্রভৃতি এই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ।

৫ম, বৈখানস-সম্প্রদায়।—বিষ্ণুই উপাস্য। ইঁহারা তিলক মুদ্রাদি চিহ্ন ধারণ করেন। "ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" ইত্যাদি মন্ত্রই শ্রুতিপ্রমাণ। নারায়ণোপনিষদ্ ইঁহাদের মতে প্রামাণিক বেদান্ত-শ্রুতি।

৬ষ্ঠ, কর্ম্মহীন-সম্প্রদায়।—এই সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবেরা একমাত্র বিষ্ণুকেই গতিমুক্তি মনে করিয়া এককালে অশেষ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-উপাসকের অপর কোন কর্ম্মাঙ্গ-যাজনের আবশ্যকতা নাই। যেহেতু বিষ্ণুই সর্ব্বকারণের কারণ।

মহাভারত-রচনার বহুপূর্ব্বে কৃষ্ণ, বাসুদেব-অর্চ্চনা প্রচলিত ছিল, ইহা মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়। অতএব "শঙ্কর-বিজয়ের" বর্ণিত উল্লিখিত ছয়টী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভিন্ন আরও ছয়টী সম্প্রদায় ছিল এবং তাহাদের শাখা প্রশাখায় আরও যে বহু বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। ফলতঃ এই সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে আচার-বিচার বিষয়ে সামান্য সামান্য প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য-তত্ত্ব যে শ্রীবিষ্ণু, এবং উপাসনা যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব বাহ্যতঃ আচার-বিচারে সাম্প্রদায়িক ভেদ লক্ষিত হইলেও, ঐ সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ই তত্ত্বতঃ এক—এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মই বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম্ম।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তৎসহচর বহু উপধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে অদ্বৈতবাদরূপ মহাবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমবেত করিতে চেষ্টা করেন। ইহার ফলে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের পথ একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু নষ্ট-শ্রী ও বিলুপ্ত-প্রায় বৈদিক

ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট রূপ অভ্যুদয়ের পরিবর্ত্তে পঞ্চোপাসক সম্প্রদায়ের পূর্ণ-প্রতিপত্তিতে উহা ভিন্নাকারে অভ্যুদিত হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর একেইতো শ্রীভগবত্তত্ত্ব গোপন করিয়া বৌদ্ধ-বিমোহন মায়াবাদ প্রচার করেন, সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজমতের উপরে বিরাজমান জানিয়া বেদান্তের অপৌরুষেয় ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতকেও বিধিভঙ্গ ভয়ে গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে তাঁহার পরবর্ত্তী শিষ্যগণ সেই অসুর-মোহকর ভগবদ্ভাবশূন্য মায়াবাদকে এরূপ বিকৃত করিয়া তুলেন যে, বৈদিক সনাতন ধর্ম্ম আবার লোপ পাইবার উপক্রম হয়। বেদ-প্রতিপাদিত ভগবত্তত্ত্বপূর্ণ ভক্তির ধর্ম্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া উঠে। এই সময়ে বহু বৈষ্ণবাচার্য্য বিবিধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা ও প্রচার দ্বারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রাখিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বোপদেব গোস্বামী শ্রীশঙ্করাচার্য্যেরই সমসাময়িক। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে অনেক বৈষ্ণব মহাত্মা বঙ্গের বাহিরে ভক্তিধর্ম্ম প্রচারক্ষেত্রে যশস্বী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের "ভাবার্থ-দীপিকা" নাম্নী টীকাকার শ্রীধর স্বামী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি টীকা দ্বারা গীতা ও বিষ্ণুপুরাণ চর্চ্চার পথও সুগম করিয়া দেন। পরবর্ত্তী গোস্বামিগণ এই স্বামীপাদের টীকাকে মীমাংসা গ্রন্থ মধ্যে প্রামাণ্যরূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই টীকা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যে স্বামী না মানে সে ভ্রষ্টা।" "ব্রজবিহার" নামক কাব্যখানি শ্রীধর স্বামিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি গুর্জ্জর দেশে বলভী নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং শ্রীপরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীভাগবত ও গীতার টীকা লইয়া বিদ্বৎ-সমাজে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত টীকাদ্বয় শ্রীবেণীমাধবের শ্রীচরণে অর্পণ করা হয়। শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রসাদে শ্রীধরস্বামীর টীকাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বপ্নাদেশ হয়। যথা—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ॥"

সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্যের প্রণেতা ভট্টিকবিকে 'ভক্তমাল গ্রন্থে' শ্রীধর স্বামীর পুত্র

বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ম্যাক্সমুলার বলেন— "১৩৮০ সম্বতে ভট্টি বা ভট্ট নামক কবি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা গুর্জ্জরপতি বীতরাগের পুত্র প্রশান্তরাগ কর্ত্তৃক খোদিত নন্দীপুরীর সনন্দপত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহারাও সপ্তম শতাব্দিতে বর্ত্তমান ছিলেন।" সুতরাং ন্যূনাধিক ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধরস্বামীর পুত্র ভট্টি বর্ত্তমান ছিলেন।

তারপর খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-প্রেমিক বিল্বমঙ্গলের আবির্ভাব। কোন কোন মতে "শান্তিশতক" প্রণেতা শিহ্লন মিশ্রই বিল্বমঙ্গল। দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণবেণ্বা নদী তীরস্থ পাণ্ডুরপুর সন্নিহিত কোন গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। চিন্তামণি নাম্নী এক বেশ্যার উপদেশ মতে সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই বৈরাগ্যের ফল "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত"। দক্ষিণ দেশের তীর্থভ্রমণকালে শ্রীমহাপ্রভু এই গ্রন্থের প্রথম শতক সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করেন। এই গ্রন্থের আরও দুইটী শতক সংগৃহীত হইয়াছে।* বিল্বমঙ্গলের অপর গ্রন্থের নাম— "গোবিন্দ-দামোদর স্তোত্র"। মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন— "বিল্বমঙ্গল দ্বিতীয় শুকদেব", সুতরাং উহাঁর নাম লীলাশুক।—

"কর্ণামৃত সম বস্তু নাহি ত্রিভুবনে।
যাহা হৈতে হয় শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম জ্ঞানে॥
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য কৃষ্ণলীলার অবধি।
সে জানে যে কর্ণামৃত পড়ে নিরবধি॥"

বিল্বমঙ্গলের গুরু পুরুষোত্তম ভট্ট। সোমগিরি নামক সন্ন্যাসী তাঁহার বৈরাগ্য-পথের গুরু।

এই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমরসিক বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সতীর্থ "ছন্দোমঞ্জরী"-প্রণেতা

*এই শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের ২য়, ও ৩য়, শতক মূল, অন্বয়, ও বঙ্গানুবাদ সহ "শ্রীভক্তি-প্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কবি গঙ্গাদাসও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র, জননীর নাম সন্তোষ। এই পরম কৃষ্ণভক্ত কবির দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্যের মহান্ উপকার সাধিত হইয়াছে। "অচ্যুত-চরিতম্" নামক মহাকাব্য ও 'কংশারি-শতকম্' প্রভৃতি কাব্য ইঁহারই বিরচিত। "ছন্দোমঞ্জরী" উৎকৃষ্ট ছন্দ গ্রন্থ—প্রত্যেক লক্ষণের উদাহরণ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক এবং রচনাও সুমধুর।

এইরূপ শত শত বৈষ্ণব-মহাত্মা অপূর্ব্ব ভক্তি-প্রতিভা-লে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন। ইহার পর বৈষ্ণবগণের যে চারিটী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়, তাহা বহুশাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আজও বিদ্যমান রহিয়াছে।

——:o:——

সপ্তম উল্লাস।

——:o:——

গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব।

বাঙ্গলার বৈষ্ণব-সমাজের অভ্যুদয় কেবল ৪০০ শত বৎসর মাত্র নয়। অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভু যখন জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে, হরিনাম প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে একই সাধন-পথে প্রবর্ত্তিত করিয়া এক মহান্ উদারতা ও সাম্যের বিজয়-নিশান তুলিয়া আভিজাত্যের অভিমানকে খর্ব্ব করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই যে বৈষ্ণব-জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহা নহে। এই সময় হইতেই এই অনাদি-সিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব-জাতি-সমাজের গৌরব-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-পুষ্টির সুবর্ণ-সুযোগ হইয়াছে।

বঙ্গবাসী স্মরণাতীত কাল হইতে ধর্ম্ম-প্রেমিক। ভক্তি-প্রেমিক (বৈষ্ণব) ও জ্ঞান-প্রেমিক (ব্রাহ্মণ)। এই বঙ্গদেশ শত শত ধর্ম্মবীরের লীলারঙ্গভূমি। মহাভারতীয় যুগে এই বঙ্গদেশেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদ্বন্দ্বী অদ্বিতীয় বীর পৌণ্ড্রক বাসুদেবের অভ্যুদয়। হরিবংশ ও পুরাণ ঘোষণা করিতেছে যে, এই বঙ্গদেশে রাজন্য-সমাজে কতশত মহাপুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান-বলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন, কেহ বা নিষ্কাম ভক্তিবলে বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেও উচ্চ সম্মানে সম্মানিত, এমন কি দেবগণেরও বন্দিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র পাঠে জানা যায়, ২২ জন জৈন তীর্থঙ্কর, তাঁহাদের পরে ভগবান্ শাক্যসিংহ ও তদনুবর্ত্তী শত শত বৌদ্ধাচার্য্য এই বঙ্গদেশে জ্ঞান ও ভক্তিমূলক নিবৃত্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৮ম, শতাব্দিতে জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ স্বামী হইতেই গৌড়বঙ্গের ঐতিহাসিক যুগের সূত্রপাত। এই পার্শ্বনাথ স্বামীর ২০০ শত বৎসর পরে তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়। তিনি এই রাঢ়-বঙ্গে অষ্টাদশ বর্ষ অবস্থান করিয়া অতি উচ্চ জাতি হইতে অতি নীচ বনের অসভ্য

জাতি পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।* এই সময়ে অনেক বৈষ্ণব এই নিবৃত্তি-প্রধান ধর্ম্মকে নিজেদের ধর্ম্মের কতকটা অনুকূল বোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহুশতাব্দিপূর্ব্বে এই গৌড়বঙ্গে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মেরও অধঃপতন ঘটিয়াছিল। যেহেতু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম উভয়ই বৈদিক। বর্ত্তমানে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে জানিতে পারা যায়— ১৭৬ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে শুঙ্গ মিত্র বংশের অভ্যুদয় ঘটে। ৬৪ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত ইহাঁদের রাজ্যকাল। ইহাঁদের সময়েই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয় হয়। এই ব্রাহ্মণ্যাভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সৌর, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র এবং পৌরাণিক

* খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে চৈত্র-কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে ক্ষত্রিয়কুণ্ড নামক স্থানে ইক্ষ্বাকু বংশে জৈন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর স্বামীর জন্ম। মহাবীরের পিতার নাম রাজা সিদ্ধার্থ ও মাতার নাম ত্রিশলা। ঋজুকূলা নদী তীরে জৃম্ভিকা গ্রামের নিকট শালবৃক্ষ মূলে দ্বাদশবার্ষিকী তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন। "মা হিংস্যাঃ সর্ব্বা ভূতানি"—কোন প্রাণীকে হিংসা করিবেনা, এই শ্রৌত-নীতিই জৈন ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। জৈনরা প্রধানতঃ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। জৈনমতে মনুষ্যমাত্রেই একজাতি; কেবল বৃত্তি-ভেদেই চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি; যথা—

"মনুষ্যজাতিরেকৈব জাতি নামোদয়োদ্ভবা।
বৃত্তি ভেদা হি তদ্ভেদা চাতুর্ব্বিধ্যমিতি শ্রিতাঃ॥" জিন-সংহিতা।

জৈনরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, অথচ জিন-প্রতিমার পূজা করেন। হিন্দুবর্ণাশ্রমীর ন্যায় অশৌচ পালন করেন। দুর্গতি হইতে আত্মাকে ধরিয়া রাখাই ধর্ম্ম, জ্ঞানাদি অভ্যাস করিয়া কর্ম্মাংশ দূর করিতে পারিলেই নির্ব্বাণ লাভ হয়।

বা সাত্বতগণের অভিনব অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল। ভাগবত, পাঞ্চরাত্র ও সাত্বত বৈষ্ণবগণই আদি বৈদিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ভুক্ত। তারপর বৌদ্ধ-বিপ্লবের ফলে পুনরায় ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণবধর্ম্মের অধঃপতন ঘটে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দিতে শকাধিপ কনিষ্কের রাজত্বকালে জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। এই সুযোগে বঙ্গের নানাস্থানে মেদ, কৈবর্ত্ত প্রভৃতি জাতি মস্তকোত্তলন করিয়া আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। সম্রাট কনিষ্কের সময়ে প্রচারিত মহাযান মতই সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কালে এই মহাযানমতই সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল। একদিন সমস্ত বঙ্গদেশ সেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিল। গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্রই সেই প্রভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়।

অনন্তর খৃষ্টীয় ৪র্থ, শতাব্দিতে বর্দ্ধন বংশে শ্রীহর্ষদেবের অভ্যুদয়ে গৌড়বঙ্গে পুনরায় বৈদিক ধর্ম্মের অভ্যুদয় ঘটে ; এই সময়ে অনেক বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ও হিন্দু-তান্ত্রিক বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৈরাগী-বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। তন্ত্রের নায়িকা-সাধন-প্রণালী বৈষ্ণব মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া—তাঁহারা সাধন-ভজন করেন। কারণ, তন্ত্র মতেও বৈষ্ণবাচার গ্রহণের বিধি দৃষ্ট হয়। তারপর খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ, শতাব্দির শেষ ভাগে গুপ্ত রাজবংশে প্রবল প্রতাপান্বিত শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের অভ্যুদয়। তাঁহার যত্নে ও উৎসাহে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্ম্মের গৌরব সর্ব্বত্রে ঘোষিত হইয়াছিল। আনুষঙ্গিক রূপে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবও যে কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ-প্রভাবই সর্ব্বত্র সমধিক রূপে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

ইহারই প্রায় শতাধিক বর্ষকাল পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দিতে বৈদিক ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শূরবংশীয় প্রথম পঞ্চগৌড়েশ্বর আদিশূর মহারাজ জয়ন্তের অভ্যুদয় হয়। ইনি গৌড়বঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের প্রাবল্যে বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের একান্ত অভাব থাকায়

তিনি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার সময় কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্ত্তমান রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদি পুরুষ এবং এই ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে যে পাঁচজন কায়স্থ রক্ষক স্বরূপ (কোন কোন মতে ভৃত্য স্বরূপে) আসিয়া বঙ্গে বাস করেন, তাহারাই বাঙ্গলার দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের আদি পুরুষ।

আবার এই সময়েই বৌদ্ধতন্ত্র ও হিন্দুতন্ত্র মিলিয়া এক নূতন তান্ত্রিক মতের প্রচলন হইয়াছিল; ইহার প্রকৃত ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় সুকঠিন হইলেও আমরা দেখিতে পাই যে, বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর শঙ্করাচার্য্য হইতে বৈদিক মতের সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক মতেরও প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ, তিনিই আধুনিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা।

পাল রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে, ধর্ম্মবীরগণের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, তাঁহাদের দেবচরিত-গাথা ও ধর্ম্মাচার্য্যগণের গুরুপরম্পরা বংশাবলি কীর্ত্তনই ধর্ম্মনৈতিক ইতিহাস আলোচনার বিষয় ছিল। মহারাজ শশাঙ্কের সময়ে জাতীয় ইতিহাস রক্ষার দিকে লোকের সামান্য দৃষ্টি পড়ে এবং মহারাজ আদিশূরের সময়, বৈদিক সমাজের সুপ্রাচীন প্রথা অবলম্বিত হইলেও সেন রাজগণের সময় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের আদর্শে সমাজ-নৈতিক-ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষাই বাঙ্গালীর চির লক্ষ্য। সুতরাং রাজনৈতিক ইতিহাস তখন রাজ-সংসারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ সমাজপতিগণ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিয়া আত্মীয় স্বজন-বেষ্টিত স্ব স্ব পল্লী মধ্যে স্ব স্ব সমাজ ও ধর্ম্ম রক্ষায় তৎপর ছিলেন। স্ব স্ব সমাজের উন্নতি, স্ব স্ব বংশের বিশুদ্ধি রক্ষা স্ব স্ব কুলধর্ম্ম প্রতি-পালন ও পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব কীর্ত্তনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

যদিও এই সময় বাঙ্গালায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব তাদৃশ বিস্তার লাভ করে নাই বটে, কিন্তু স্থানে স্থানে এক একটী ক্ষুদ্র বৈষ্ণব সমাজের সৃষ্টি হইয়াছিল। বৈদিক ও তান্ত্রিক-বৈষ্ণবাচার মতেই তাঁহাদের ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত হইত।

ব্রাহ্মণ্য সমাজের আচার বিচার হইতে অর্থাৎ স্মার্ত্ত-মত হইতে তাঁহাদের আচার ব্যবহারের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং অদ্যাপি সেই পার্থক্য বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক গোষ্ঠীর বিভিন্ন সমাজপতি বা দলপতি থাকিলেও এবং বিভিন্ন মতবাদ থাকিলেও ধর্ম্ম নৈতিক হিসাবে তাঁহাদের কোন বৈলক্ষণ্য ছিল না। এই সকল বৈষ্ণবগণের মধ্যে প্রায় কেহই বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী নহেন। শুধু বৈষ্ণব কেন, বর্ত্তমান বঙ্গের শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহের মূল পুরুষ, কেহই এই বাঙ্গলার আদিম অধিবাসী নহেন। বৈদিক, অবৈদিক, কুলীন শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতে নবশাখাদি পর্য্যন্ত প্রায় অধিকাংশ জাতিরই এই বঙ্গদেশে আদিবাস নহে। উক্ত বৈষ্ণবগণের মধ্যে কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা, কেহ কান্যকুব্জ, কেহ মগধ, কেহ উৎকল, কেহ মথুরা, কেহ বারাণসী, কেহ দাক্ষিণাত্যের শ্রীরঙ্গপত্তন প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া বাঙ্গলায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। প্রধানতঃ ইহাঁরাই **গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব** নামে পরিচিত। এই সকল বৈষ্ণবগণের সন্তানগণ বিভিন্ন স্থানে বাস ও বিভিন্ন সমাজে আশ্রয় হেতু এক্ষণে তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর অনেকটা সামাজিক মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। এই সকল বৈষ্ণব-সমাজের পরিচয় বা তাঁহাদের সামাজিক ইতিহাস অবশ্য লিপিবদ্ধ ছিল এবং চেষ্টা করিলে এখনও তাহার উদ্ধার সাধন হইতে পারে। সেই সকল সামাজিক কুলজী ধ্বংসোন্মুখ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিলে, সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে।

বাঙ্গলার ধর্ম্ম-বিপ্লবের সময়েই সনাতন সদাচারের বিসর্জ্জনে এবং অনুদার নীতির অনুকরণের ফলে অনেক শ্রেষ্ঠ জাতি-সমাজের অধঃপতন ঘটিয়াছে। মহারাজ শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সময় রাজার গ্রহ-বৈগুণ্য খণ্ডনের জন্য শাকদ্বীপী গ্রহ-বিপ্রগণ বাঙ্গলায় আসিয়া বাস করেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা-প্রভাব যথেষ্টরূপেই বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু আদিশূরের সময় হইতে সেন রাজগণের সময় পর্য্যন্ত সাগ্নিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রতিপত্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব একবারে হ্রাস হইয়া যায়। বৌদ্ধ মতাবলম্বী পালরাজগণের সভায় তাঁহাদের

প্রতিপত্তি থাকিলেও ক্রমে তাঁহারা অনাচরণীয় শূদ্রবৎ গণ্য হইতে থাকেন। এই কারণে অদ্যাপি বঙ্গের অনেক স্থানে উক্ত শাকদ্বীপিগণ, বিপ্র-সন্তান হইয়াও আশ্চর্য্যের বিষয় যে, উচ্চজাতির নিকট তাঁহাদের জল অস্পৃশ্য।

পালরাজগণের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্রাধান্য বহু বিস্তার লাভ করে। সুতরাং এই সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মাচার্য্যের পদগ্রহণ করেন। পরে সেনরাজগণের অভ্যুদয়ে প্রথমে বৈদিকাচার গ্রহণের উদ্যোগে এবং পরে তান্ত্রিক ধর্ম্মবিস্তারের সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণের দারুণ অধঃপতন ঘটে। ব্রাহ্মণবংশীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণই তখন অনন্যোপায় হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া একটী স্বতন্ত্র বৈষ্ণবজাতিতে পরিণত হন এবং তাঁহারা গৌড়বঙ্গে **জাত-বৈষ্ণব** নামে অভিহিত হন। বৌদ্ধধর্ম্মত্যাগ করিয়া বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ করিয়া একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে গণ্য হওয়ায় ইহাঁরা "জাতি-বৈষ্ণব" নামে পরিচিত অথবা বৌদ্ধ-মহাযান হইতে উৎপন্ন বলিয়া "যাত-বৈষ্ণব" নামে অভিহিত, এরূপ অনুমানও অযৌক্তিক নহে। তখন বর্ত্তমান চারি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি না হওয়ায়, এই সকল বৈষ্ণব কোন্ প্রাচীন সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে, তাঁহারা "জাতবৈষ্ণব" নামে যে একটী স্বতন্ত্র সমাজবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী কালে ইহাঁরা চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবশেষে শ্রীমহাপ্রভুর সময় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছেন। কৌলিকমত পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার কারণ ও স্ব স্ব সমাজে প্রভুত্বের ফলেই এক্ষণে অনেকেই পৃথক্ সমাজবদ্ধ হইয়াছেন।

বুদ্ধের ধর্ম্মমতে জাতিগত বিভিন্নতা নাই। অতি নীচ জাতীয় শূদ্রও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এবং সাধন-মার্গে উন্নতি লাভ করিয়া সকলেরই ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারে। বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মে ও তন্ত্রমার্গে এই উদার নীতির পথ অবাধ উন্মুক্ত থাকায় উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যগণ অনায়াসে বৈষ্ণব-সমাজে স্থানলাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সাধারণের নিকটও বিশেষ গৌরব ও শ্রদ্ধার পাত্র হন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত বৌদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহাদের

এরূপে ব্রাহ্মণ সমাজে প্রবেশ লাভের সুযোগ ঘটিল না, পরিশেষে এরূপ ঘোর অধঃপতন ঘটে যে, তাঁহাদিগকে অবশেষে ডোম জাতির সহিত মিলিতে বাধ্য হইতে হয়। তাঁহাদের বংশধরগণই এক্ষণে কেহ কেহ "ডোম-পণ্ডিত" নামে পরিচিত। কথিত আছে, বল্লালসেন এই ডোমপণ্ডিতের অর্থাৎ বৌদ্ধাচার্য্যের কন্যা বিবাহ করিয়া বৈদিক সমাজে নিন্দনীয় হইয়াছিলেন। ইহারা অদ্যাপি ব্রাহ্মণের ন্যায় দশাহাশৌচ পালন করিয়া থাকে। এই পণ্ডিতগণের গৃহে যে সকল আদি ধর্ম্ম কুলগ্রন্থ রক্ষিত ছিল, অযত্নে তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে।

আবার মুসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা হইতে জানা যায়, যে খৃষ্টীয় ১০ম, শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ভারতীয় বৈশ্যকুলকে শূদ্র জাতিতে পাতিত করিবার জন্য ঘোরতর ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে, তখন বৈশ্য-বৃত্তিক বহু সম্ভ্রান্ত জাতি বৌদ্ধ পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সুবর্ণ বণিকজাতি প্রধান। বৌদ্ধ-সংশ্রব হেতুই সেনরাজগণের সময়ে তাঁহাদের অধিকারভুক্ত গৌড়বঙ্গ মধ্যে সুবর্ণ-বণিক জাতির সামাজিক অধঃপতন ঘটে। বৌদ্ধাচার হেতু সদ্গোপ জাতিও এদেশে হিন্দু-সমাজে অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছিলেন। এই জাতি ইদানীন্তন কালেও মহাযান-মতাবলম্বী শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের কুলগ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল সদ্গোপ বলিয়া নহে—তিলি, তাম্বূলী, গন্ধবণিক, তন্তুবায় জাতির কুলগ্রন্থের উপক্রমেও শূন্য মূর্ত্তি সদ্ধর্ম্ম নিরঞ্জনের স্তবের পরিচয় পাওয়া যায়।

পশ্চিমোত্তর বঙ্গে যখন বৌদ্ধপ্রভাব অব্যাহত, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে ধীরে ধীরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতেছিল। মহারাজ হরিবর্ম্মাদেবের রাজত্ব কালে গৌড়োৎকলে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যথেষ্ট অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র, সামবেদীয়-পদ্ধতিকার ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি সাতজন পণ্ডিত ইহাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। ভুবনেশ্বরের শ্রীঅনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে এই ভবদেব ভট্টের প্রশস্তি-মূলক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১০৭২ অব্দে মহারাজ বিজয়সেন স্বপুত্র শ্যামলবর্ম্মা সহ গৌড়রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই বিজয়সেনই দ্বিতীয় আদিশূর নামে খ্যাত। ইনি রাঢ়ে ও গৌড়বঙ্গে বৈদিকাচার প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে রাঢ়-বঙ্গে অনেক বৈদিক বৈষ্ণব ও বৈদিক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আগমন করেন। বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রভাবে যে সকল দ্বিজাতিবর্গ সাবিত্রী-পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, বিজয়-সেনের গৌড়াধিকারের সঙ্গে নবাগত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের চেষ্টায় অনেকে আবার সাবিত্রী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করেন। বৈদিক সাত্বত পঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণের চেষ্টাতেও অনেক বৌদ্ধ দ্বিজাতিবর্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বৈষ্ণব সমাজের অঙ্গপুষ্টি করেন।

বিজয়সেনের পুত্র মহারাজ বল্লালসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি বৈদিক অপেক্ষা তান্ত্রিক ধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী ও অনুরক্ত হইয়া উঠেন। সুতরাং বল্লাল স্বীয় মতানুবর্ত্তী ব্যক্তিগণের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া উচ্চ সম্মান সূচক কুলবিধি প্রবর্ত্তন করেন। তন্ত্রের দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধ আচার লক্ষ্য করিয়া মহারাজ বল্লালসেন মুখ্য কুলীন, গৌণকুলীন, ও শ্রোত্রীয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম বিনিবদ্ধ করেন। যাঁহারা বল্লালের এই তান্ত্রিক রাজবিধি স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বল্লালের সমাজ হইতে স্বতন্ত্রভাবে ভিন্ন শ্রেণীতে গণ্য হইলেন।

বল্লালের পুত্র মহারাজ লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক কুলাচার দ্বারা সমাজের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভাবনা নাই জানিয়া পিতামহ বিজয়সেনের ন্যায় বৈদিক আচার প্রচারের পক্ষপাতী হন। হলায়ুধ, পশুপতি, কেশব প্রভৃতি তাঁহার সভাস্থ বৈদিক পণ্ডিত-গণ কর্তৃক তৎকালে বৈদিক আচার-প্রবর্ত্তনের উপযোগী বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিত হলায়ুধ তদানীন্তন সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত "মৎস্য-সূক্ত" নামে একখানি মহাতন্ত্র রচনা করেন। মহারাজ লক্ষ্মণসেন তান্ত্রিক ও বৈদিক সমাজের সমন্বয় ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা মৎস্য-সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়। লক্ষ্মণ

সেন বৈদিক বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষতঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলা-ধর্ম্মের প্রতি যে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কারণ, ইহাঁরই রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-কবি (১১৩০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীজয়দেব গোস্বামী শ্রীব্রজগীতি কাব্য "শ্রীগীতগোবিন্দ" রচনা করেন। পূর্ব্বোক্ত হলায়ুধ কৃত "মৎস্য-সূক্তের" অনেক বচন স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন তাঁহার "তিথিতত্ত্বাদি" স্মৃতিগ্রন্থে প্রামাণিক রূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, তান্ত্রিক-সমাজ সংস্কারের জন্য লক্ষ্মণসেন মৎস্য-সূক্তে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজও গৌড়বঙ্গের হিন্দুসমাজে প্রায় সেই ব্যবস্থাই প্রচলিত রহিয়াছে।

তাহার পর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের পৌত্র দনৌজা মাধব চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া লক্ষ্মণ সেন যাহা করিতে পারেন নাই, তাহা সংসাধন করিয়াছিলেন। তিনি সকল কুলপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া সম্মানিত করিয়া সমগ্র বঙ্গজ সমাজের সমাজপতি হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা নিবারিত হইতে থাকে এবং অতঃপর গৌড়বঙ্গে মুসলমান-অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বিভিন্ন জাতীয় হিন্দুসমাজের অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিবার সূত্রপাত হয়।

অনন্তর খৃষ্টীয় ১৪শ, শতাব্দের শেষ ভাগে রাজা গণেশের অধিকার কাল পর্য্যন্ত তান্ত্রিকতায় বঙ্গদেশ আবার প্লাবিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাব হ্রাস পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়কার অবস্থা শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবন দাস বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তান্ত্রিক-প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের গৌরব-হ্রাস হইবার উপক্রমেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন।

অষ্টম উল্লাস।

—:০:—

চতুঃ সম্প্রদায়।

সাম্প্রদায়িক ভাব বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। সুপ্রাচীন বৈদিক কাল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় পর্য্যন্ত—শুধু তাহাই নহে, আজ পর্য্যন্ত এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তাই, ভক্তমাল-গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

" সম্প্রদা সর্ব্বত্র পূর্ব্বাপর যে প্রসিদ্ধ।
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শাস্ত্রে সিদ্ধ॥
শ্রুতি-প্রবর্ত্তক ভাগবত-প্রবর্ত্তক।
যাত-প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক॥
ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সম্প্রদা।
সর্ব্বত্র প্রকট হয় স্ব স্ব সিদ্ধিপ্রদা॥
শ্রীধর গোস্বামী ভাগবতের টীকায়।
সম্প্রদায়-অনুরোধ করিয়া লিখয়॥" ১৮শ, মালা।

শ্রীধরস্বামী শ্রীভাগবতের ১ম, অধ্যায়ের ১ম, শ্লোকের টীকায় উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—

" সম্প্রদায়ানুরোধেন পৌর্ব্বাপর্যানুসারতঃ।
শ্রীভাগবতভাবার্থদীপিকেয়ং প্রতন্যতে॥"

এমন কি—

" শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য স্বামী ভাষ্যে স্থানে স্থানে।
সম্প্রদায় অনুরোধ করিয়া বাখানে॥
অন্য পরে বা কথা যে ব্রাহ্মণ-ভোজন।
সম্প্রদায়ী বিপ্রে করাইব যে বিধান॥" ১৮শ, মালা।

অতএব এই সম্প্রদায়-অনুরোধেই উক্ত হইয়াছে—

"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈর্ন সিদ্ধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি॥"

(পাদ্মে তথা গৌতমীয়ে তথা নারদ পঞ্চরাত্রে)।

সম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্র সকল ফলদায়ী হয় না। এমন কি বহু সাধনা দ্বারা শতকোটীকল্পকালেও সেই সকল মন্ত্র সিদ্ধ হয় না।

এই কারণেই বর্ত্তমান কলিকালে চারিটী সম্প্রদায় স্বীকৃত হইয়াছে। কলিতে যে চারিটী মূল বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবে, এ কথা গৌতমীয়-তন্ত্র পূর্ব্বেই ঘোষণা করিয়াছেন—

"অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীব্রহ্ম রুদ্র সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥"

অতএব কলিতে চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইবে। শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক এই চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ক্ষিতিতল পবিত্র করিবেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়ে যে সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইদানীং তাহার কোন সম্প্রদায়ই অবিকল দৃষ্ট হয় না। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে চারি সম্প্রদায় প্রবল হইয়া উঠে। এই চারি সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক যথাক্রমে রামানুজ, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণু স্বামী ও নিম্বাদিত্য। যথা—

চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

"রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যঞ্চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" প্রমেয়-রত্নাবলী।

অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী রামানুজকে, ব্রহ্মা মধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র বিষ্ণুস্বামীকে এবং চতুঃসন অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার ইঁহারা নিম্বাদিত্যকে সনাতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকরূপে স্বীকার করেন।

শ্রীমদাচার্য্য রামানুজের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ব হইতে যে সকল বৈষ্ণবাচার্য্য

সনাতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে জীবিত রাখিয়াছিলেন নিম্নে তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইল।—

মহাযোগী স্বামী, ভূযোগী, ষড়্‌যোগী, ভক্তিসার স্বামী, মধুর কবি, কুলশেখর, যোগবাহন, ভক্তাঙ্ঘ্রি-রেণু-স্বামী, রামমিশ্র, শঠকোপ, পুণ্ডরীকাক্ষ, নাথমুনি, মুনিত্রয়স্বামী, বকুলাভরণ, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি। এই সকল বৈষ্ণবাচার্য্য প্রাচীন কোন্ কোন্ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ। উল্লিখিত মহাত্মাদিগের মধ্যে মধুর কবি, কুলশেখর, নাথমুনি, বকুলাভরণ, যামুনাচার্য্য প্রভৃতি যে সকল বৈষ্ণব-গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার মধ্যে অনেক গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। বলা বাহুল্য, এই সকল বৈষ্ণব-পণ্ডিত যথাক্রমে পরে পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মগণের মধ্যে শঠকোপই (কেহ কেহ শতগোপ বলেন) প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান প্রচারক ও রামানুজাচার্য্যের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। যামুনাচার্য্যের গ্রন্থসকল যেমন রামানুজাচার্য্যকে দার্শনিক অংশে সাহায্য করিয়াছিল, শঠকোপের গ্রন্থাবলীও সেইরূপ যুক্তি ও ভক্তিতত্ত্বের পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল। পল্লবরাজবংশের শাসন সময়ে দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবগণের যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। বৈষ্ণব আলোয়ারগণ এই সময়ে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শঠকোপের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শঠকোপ কুরুকই নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। কুরুকই সহর তিনেভেলীর নিকটবর্ত্তী এবং তাম্রপর্ণী নদীতটে অবস্থিত। শঠকোপ তামিল ভাষায় বহুতর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি ভগবদ্ভক্তি-প্রভাবে ও অসামান্য প্রতিভাবলে নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া উচ্চ-বর্ণাভিমানিগণের মধ্যেও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে লিখিয়াছিলেন—"এমন এক মহাপুরুষ আবির্ভূত হইবেন, যিনি সমুদায় মানবকে বৈষ্ণব

আচার্য্য শঠকোপ বা শতগোপ।

মতে দীক্ষিত করিয়া শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে উপনীত করিবেন।" শঠকোপের এই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রীমদাচার্য্য রামানুজ হইতেই সফল হইয়াছিল। আলোয়ারগণও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তামিল ভাষায় ইঁহারা কৃষ্ণ-চরিত সম্বন্ধে এবং বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এ সময় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনেক গান তামিল ভাষায় রচিত হয়।

এই মহাত্মার পরবর্ত্তী কালে আর একজন অতি প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহার নাম শ্রীরঙ্গনাথাচার্য্য; সাধারণতঃ ইনি নাথমুনি নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষভাগে ত্রিচিনপল্লীর নিকটবর্ত্তী শ্রীরঙ্গম্ সহরে এই সুপণ্ডিত সাধু পুরুষ বাস করিতেন। ইঁহার জন্মস্থান বীরনারায়ণপুর—মান্দ্রাজ প্রদেশের চিদাম্ব তালুকের অন্তর্গত বর্ত্তমান মন্নরগুড়ি—প্রাচীন সময়ে বীরনগর নামে অভিহিত হইত। খৃষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে এই সকল অঞ্চলে ভাগবত ও পঞ্চরাত্র সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ আগমন করিয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন। সুতরাং নাথমুনি যে পাঞ্চরাত্র কি ভাগবত-সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। নাথমুনি বীরনারায়ণপুরের বিষ্ণুমন্দিরে বাস করিতেন। কোন সময়ে তিনি শঠকোপ-রচিত বিষ্ণু-স্তোত্র শ্রবণ করিয়া অতীব বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ দশটী মাত্র স্তোত্র শুনিয়া এমন বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, যে শঠকোপের রচিত এইরূপ আরও স্তোত্র আছে কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার দীর্ঘকাল চেষ্টার ফলে শঠকোপ-রচিত সহস্র সহস্র কবিতা সংগৃহীত হয়। শ্রীরঙ্গমে শ্রীমূর্ত্তির সমক্ষে এই সকল স্তোত্র আবৃত্তি করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। অদ্যাপি এই স্তোত্র-পাঠ-নিয়ম দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির সমূহে প্রচলিত রহিয়াছে। শঠকোপ অলৌকিক প্রতিভাবলে বেদের নিগূঢ় অর্থ দ্রাবিড় ভাষায় গ্রথিত করিয়া "দ্রাবিড় বেদ" প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহা একখানি প্রাচীন বৈষ্ণব-দর্শন। এই গ্রন্থের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াই শ্রীরামানুজাচার্য্যের

বৈষ্ণবাচার্য্য নাথমুনি।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। মহাত্মা নাথমুনিও "ন্যায়তত্ত্ব" এবং "যোগরহস্য" নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণে এই গ্রন্থদ্বয় প্রচলিত নাই। "ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থে এবং শ্রীভাষ্যে ন্যায়তত্ত্বের অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। "ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন" গ্রন্থের প্রণেতার নাম বেঙ্কটনাথ, ইনি সংস্কৃত ভাষায় বহুল বৈষ্ণব গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। খৃষ্টীয় ১২৭০ হইতে ১৩৭০ অব্দ পর্য্যন্ত ইনি জীবিত ছিলেন। নাথমুনির রচিত "ন্যায়তত্ত্ব" বৈষ্ণব-ধর্ম্মের দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। শ্রীরামানুজ এই গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। রামানুজ-প্রবর্ত্তিত বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাদের বহুল তর্কযুক্তি সম্বন্ধে নাথমুনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক। নাথমুনির পুত্রের নাম, ঈশ্বরমুনি, ঈশ্বর মুনির পুত্রের নাম সুপ্রসিদ্ধ যামুনাচার্য্য। কথিত আছে, নাথমুনি যখন পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থলী মথুরা নগরী দর্শনে গমন করেন, সেই সময়ে যমুনাতটে তাঁহার পৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য ইনি যমুনা নামে অভিহিত হন। যামুনাচার্য্য অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত প্রচার করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্য এই মহাত্মারই শিষ্য।

শ্রীযামুনাচার্য্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম।

সুবিখ্যাত পুণ্ডরীকাক্ষাচার্য্যের ছাত্র রামমিশ্রের নিকট যামুনাচার্য্য অষ্টম বর্ষ বয়সে উপনয়নের পর বেদ-শিক্ষা লাভ করেন। ইঁহার অসাধারণ স্মারকতা-শক্তি ও অলৌকিক প্রতিভায় পঠদ্দশাতেই ইনি শিক্ষক ও সতীর্থগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহাভাষ্য-ভট্ট উপাধিবিশিষ্ট একজন পণ্ডিতের নিকটও যামুন শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন। ইঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত কখনও কাহারও নিকট অর্থপ্রার্থী হয়েন নাই। তিনি দরিদ্রতার মধ্যেও ধর্ম্মভাব ও আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা দেখিয়া চোল-রাজার সভাপণ্ডিত অক্কি-আলোয়ান তাঁহাকে রাজসভায় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করেন। কোন কারণ বশতঃ রাজ-সভাপণ্ডিতের সহিত যামুনাচার্য্যের শিক্ষকের মনোমালিন্য উপস্থিত

হইলে, সভাপণ্ডিত সেই মহাভাষ্য-ভট্টকে বিচার-ক্ষেত্রে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে অপ্রস্তুত করিবার মনস্থ করিলেন। যথাসময়ে রাজসরকার হইতে ভট্টজীকে লইয়া যাইবার জন্য লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। যামুনাচার্য্য বিচার-আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি বলিলেন—"রাজপণ্ডিত! আমার অধ্যাপকের সহিত বিচার করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আমার সহিত বিচার করুন।" কার্য্যতঃ তাহাই স্থির হইল। যামুনাচার্য্য যথাসময়ে বিচার করিতে গেলেন। বিচারে সভাপণ্ডিত সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। চোলরাজ এই তরুণ যুবকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া প্রভূত ভূ-সম্পত্তি দান করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সদ্গুরুর কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া যামুনাচার্য্য সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি দিন-যামিনী শ্রীভগবানের অনন্ত মাধুর্য্যের সুধাস্বাদ করিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইতে লাগিলেন। ফলতঃ তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনে অবস্থান করিয়া অধিকাংশ সময় শ্রীভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতেন, অবশিষ্ট সময় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের আলোচনা করিয়া গ্রন্থাদি লিখিতেন। ভক্তির ব্যাখ্যায় যামুনাচার্য্য যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব-সমাজেই তাহা সমাদৃত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি যে সকল সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ রামানুজ সেই সকল অভিমত গ্রহণ করিয়া বেদান্ত-ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যামুনাচার্য্যের অভিমত।

যামুনাচার্য্য মায়াবাদ নিরাকৃত করিয়াছেন, শ্রীভগবানের চিদ্বিগ্রহত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন, ভক্তিকে ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন, নির্ব্বিশেষবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, ভাগবত ও পাঞ্চরাত্র মতের পোষকতা করিয়াছেন। যদিও তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন, তথাপি তাঁহার উপাসনায় প্রেমভক্তির ভাব পরিলক্ষিত হইত। এই জন্যই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যামুনাচার্য্যের গ্রন্থে স্বীয় সম্প্রদায়ের পোষক অনেক শাস্ত্র-যুক্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাঁহার গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে প্রমাণাদিও মুক্তভাবে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীচরিতামৃতকার

শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহোদয় শ্রীযামুনাচার্য্যবিরচিত স্তোত্ররত্নের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইহার কবিতার্কিত সিংহকৃত ভাষ্যধৃত শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলতঃ শ্রীচরিতামৃতে, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ও ষট্ সন্দর্ভে যামুনাচার্য্যের বহু স্তোত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। স্তোত্ররত্ন ব্যতীত তিনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্‌যথা—১। আগমপ্রামাণ্যম্, ২। পুরুষ-নির্ণয়, ৩। ত্রিসিদ্ধি—আত্মসিদ্ধি, সংবিৎসিদ্ধি ও ঈশ্বরসিদ্ধি। ৪। গীতার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি। বিশিষ্টা-দ্বৈত-ভাষ্যের প্রণেতা শ্রী-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীরামানুজাচার্য্য এই শ্রীযামুনাচার্য্যেরই শিষ্য।

বর্ত্তমান কালে বৈষ্ণবদিগের যে চারিটী প্রধান সম্প্রদায় প্রচলিত আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই চারি সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে গেলে, চারিখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ হইয়া যায়। বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধারাবাহিকতা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষ-প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সুতরাং উক্ত চারি-সম্প্রদায়ের বিবরণ এস্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়।

১ম, শ্রী-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ স্বামী। ইনি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ ৯৩৮ শকে (খৃঃ ১০১৭ অব্দে)* মাদ্রাজ প্রদেশে চেঙ্গলপৎ জেলার অন্তর্গত শ্রীপেরম্বুধুরম্ গ্রামে হারীত-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম কান্তিমতী দেবী। রামানুজ-সম্প্রদায়ী শ্রীঅনন্তা-চার্য্য কৃত "প্রপন্নামৃত" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"শালিবাহন শকাব্দানাং তত্রাষ্টত্রিংশদুত্তরে।
গতে নবশতে শ্রীমান্ যতিরাজোঽজনি ক্ষিতৌ॥" ১১৫ অঃ।

রামানুজ কাঞ্চী-নগরস্থ শাঙ্কর সম্প্রদায়ী বৈদান্তিক পণ্ডিত যাদবপ্রকাশ

* স্মৃতিকাল-তরঙ্গের মতে ১০৪৯ শকাব্দে শ্রীরামানুজ বর্ত্তমান ছিলেন।

স্বামীর নিকট অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে চোল রাজ্যের তৌণ্ডীর মণ্ডলের রাজার কন্যাকে ব্রহ্মরাক্ষস (ব্রহ্মদৈত্য) আশ্রয় করিয়াছিল। কিছুতেই ইহার প্রতিকার না হওয়ায় রাজা অবশেষে যাদবপ্রকাশ স্বামীকে আহ্বান করিয়া কন্যাকে এই ভুতাবেশ হইতে মুক্ত করিতে অনুরোধ করেন। যাদব প্রকাশ শিষ্যগণ সহ তথায় উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাক্ষস বিকট হাস্যধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত করিয়া কন্যার মুখ দিয়া তাঁহাকে তিরস্কার বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"তোমার সাধ্য কি, যাদবপ্রকাশ! আমাকে তাড়াইবে? তুমি পূর্ব্ব জন্মে কি ছিলে জান? তুমি পূর্ব্বজন্মে গোধা ছিলে? একদা এক বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-প্রসাদান্ন ভোজনের পুণ্য-ফলেই তুমি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এত বড় পণ্ডিত হইয়াছ। আর আমি কেন ভুতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছি শুনবে?—একদা আমি সস্ত্রীক এক যজ্ঞ আরম্ভ করি, সেই যজ্ঞ ঋত্বিক ও আমার অনবধানতায় অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের নিমিত্ত ক্রিয়াপণ্ড হওয়ায় আমি ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। এক্ষণে তোমার শিষ্যগণের মধ্যে ভক্তবর রামানুজ যদি আমার মস্তকে চরণার্পণ করিয়া পাদোদক প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি এই রাজকন্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি।" অতঃপর রাজার বিনীত অনুরোধে রামানুজ রাজকন্যার মস্তকে চরণস্পর্শ করিয়া পাদোদক প্রদান করিলেন। তখন বৈষ্ণবের পদরজস্পর্শে ও পাদোদক পান করিয়া ব্রহ্ম-রাক্ষসের প্রেতত্ব খণ্ডিত হইল, দিব্যদেহ ধারণ করিয়া উর্দ্ধধামে চলিয়া গেলেন। এইরূপে রামানুজের কৃপায় রাজকন্যা সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। রাজা ও রাজমহিষী বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রামানুজের মতাবলম্বী হইলেন। আবার এক বৌদ্ধ রাজা বিলাল রায়ের কন্যাকেও এইরূপ ব্রহ্মরাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত করিয়া রাজাকে বৈষ্ণবীমতে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি বিলাল রায় বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে বিখ্যাত হইলেন। এই সময় বহু বৌদ্ধ-শ্রমণ বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

তৎকালে এই দক্ষিণ খণ্ডে শৈব ধর্ম্মেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। তখন বৈষ্ণবগণ সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া বাস করিলেও তাঁহাদের বিশেষ কেহ নেতা ছিলেন না।

কাঞ্চীপূর্ণ নামক এক বৈষ্ণব মহাত্মা হীন-বংশোদ্ভব হইলেও (শূদ্র পিতার ঔরসে শবরীর গর্ভে জন্ম) স্বীয় ভক্তি-প্রতিভায় তদানীন্তন বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষ সম্মানার্হ ছিলেন। ইনি শ্রীযামুনাচার্য্যের শিষ্য। ফলতঃ কাঞ্চীপূর্ণই তৎপ্রদেশীয় সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের পরিচালক ও নেতৃস্থানীয় ছিলেন। এই সময়েই শৈবধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উদার বৈষ্ণবধর্ম্ম ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিতেছিল। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণও ভগবদ্ভক্ত শূদ্রাদি নীচবর্ণকেও ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান প্রদান করিতে থাকায়, বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি সাধারণের চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। শৈব-সম্প্রদায় বৈষ্ণবদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবরাও শৈবদের নানা মতে বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। রামানুজ শ্রীপূর্ণাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহাত্মা শঠকোপ নিম্নশ্রেণীর শূদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে শ্রুতির সারাংশ মন্থন করিয়া যে "শঠারি-সূত্র" নামে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করেন, সেই "শঠারি-সূত্র" অবলম্বন করিয়াই রামানুজ শ্রী-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদিগণ দ্বারা বৈদিক ধর্ম্মের যে বিলোপ সাধন হইতেছিল অতঃপর ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণবগণ দ্বারাই তাহার উদ্ধার সাধন হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র বৌদ্ধ-শ্রমণ ও মায়াবাদী শৈব শ্রীরামানুজের কৃপায় পঞ্চ-সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পুষ্টিবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামানুজাচার্য্য যাদবগিরিতে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চবলরায় নামে এক শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কাবেরিতীরস্থ শ্রীরঙ্গমেই শ্রীরঙ্গনাথ দেবের সেবায় শেষজীবন অতিবাহিত করেন। এই সময় এবং ইহার পরবর্ত্তী কালেও হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা দেশের হুগলী, হাবড়া, ২৪-পরগণা, বৰ্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার এবং পূর্ব্ববঙ্গের বহুস্থানে বহু শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং এদেশবাসী বহু ব্যক্তিকে শিষ্য করিয়াছিলেন। মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোণায় শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের একটী মঠ আছে।

শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের উপাস্য—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণরুক্মিণী, শ্রীরাম-সীতা অথবা কেবল শ্রীনারায়ণ শ্রীরাম বা শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীসীতা প্রভৃতি শ্রীভগবানের অবতার বা তদীয় শক্তি। শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের মধ্যে আচার-গত বিশেষ মত না থাকিলেও উপাস্য দেবদেবী লইয়া নানা মতভেদ আছে। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ গৃহী ও যতিভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গৃহস্থরাও স্ব স্ব গৃহে শ্রীশালগ্রামশিলা বা শ্রীদেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যথাবিধি অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যতিগণের পার-লৌকিক কর্ম্ম "নারায়ণ-বলি" নামক স্মৃতি গ্রন্থের মতানুসারে নির্ব্বাহিত হয়। আর গৃহস্থগণের "গরুড় পুরাণের" মতে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তিকে প্রেত ভাবিয়া কোন কার্য্য করা নিষিদ্ধ ; দেবতা ভাবিয়া সমস্ত কার্য্য করিবে, ইহাই আচার্য্য রামানুজের অনুশাসন।

বৈষ্ণবমাত্রেরই গোপীচন্দনাদি দ্বারা তিলক ধারণ একটী মুখ্য সাধনাঙ্গ। শ্রী-বৈষ্ণবদের তিলক সেবার বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা নাশামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত ২টী সমান্তর উৰ্দ্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া নাশামূলে উক্ত রেখার প্রান্তদ্বয় একটী ভ্রূ-মধ্য গত সরল রেখা দ্বারা যোজিত করিয়া দেন, এবং ঐ দুই উৰ্দ্ধরেখার মধ্যস্থলে পীত অথবা রক্তবর্ণ (হরিদ্রা ও চূণ মিশ্রিত রুলি) একটী উৰ্দ্ধরেখা অঙ্কিত করেন ; এই রক্তরেখাই লক্ষ্মী স্বরূপা। এতদ্ভিন্ন তপ্তমুদ্রাও কেহ কেহ ধারণ করেন। কণ্ঠে তুলসী মালা নিত্য ধারণ করেন। তুলসী কিম্বা পদ্মবীজের জপমালা। শ্রীভাগবত, বরাহ, গরুড়পুরাণ, পদ্ম, নারদীয় ও বিষ্ণুপুরাণই অর্থাৎ সাত্বিক পুরাণই ইহাঁদের প্রামাণিক শাস্ত্র। যথা পাদ্মোত্তর খণ্ডে—

" বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভং।
গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।
সাত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥"

শ্রীরামানুজাচার্য্যের ৫ খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে। যথা—

" বেদান্তসারো বেদান্তদীপো বেদার্থসংগ্রহঃ।
শ্রীভাষ্যঞ্চাপি গীতায়া ভাষ্যং চক্রে যতীশ্বরঃ॥"

এগুলিও সাম্প্রদায়িক প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার মধ্যে শ্রীভাষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভগবৎ-কল্পিত শাঙ্কর-ভাষ্যে যাঁহারা হতচৈতন্য হইয়াছেন, তাঁহারা যেন বেদব্যাসের প্রিয়শিষ্য মহর্ষি বৌধায়ন-কৃত বেদান্তবৃত্তি ও সেই বৃত্তির অনুগত রামানুজের বেদান্ত গ্রন্থ আলোচনা করেন। তাহাতে ব্রহ্ম সবিশেষ কি নির্ব্বিশেষ এবং নির্ব্বিশেষত্ব-বোধক শ্রৌত ও স্মার্ত্তবাক্যেরই বা তাৎপর্য্য কি, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

রামানুজ বেদান্ত-সূত্রের যে ভাষ্য করেন তাহার নাম শ্রীভাষ্য। রামানুজ শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পারম্পরিক শিষ্য বলিয়া ভাষ্যের নাম শ্রীভাষ্য। শঙ্করের কল্পিত অদ্বৈতবাদ নিরস্ত করিয়া ইহাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের মূলে, এক ধর্ম্ম, স্বভাব বা শক্তি আছে, সেই শক্তি একাই কার্য্য করে কি কোন শক্তিমান্ আছেন? এই তত্ত্ব লইয়াই নানা মতভেদ। কেহ শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ, কেহ ভেদ, কেহ বা ভেদ-অভেদ দুই স্বীকার করেন। ভেদ শব্দে দ্বৈত, অভেদ শব্দে অদ্বৈত। রামানুজ অপ্রাকৃত রূপগুণাদিযুক্ত এক বিশেষ অদ্বৈত তত্ত্ব স্বীকার করেন, এজন্য ইহাঁর মতকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বলা যায়।

এই রামানুজ ভাষ্যে প্রসঙ্গতঃ আর্হত বা জৈনদিগের মত খণ্ডিত হইয়াছে। জৈনমতে পঞ্চ, সপ্ত ও নবতত্ত্বের উল্লেখ আছে। এই তত্ত্বভেদ দর্শনে সহজেই সন্দেহ উপজাত হয়। জীবের পরিমাণ, মানবদেহের অনুরূপ এই আর্হত মতও খণ্ডিত হইয়াছে। ঘটাদি জড় বস্তুর ন্যায় জীব পরিমিত হইলে একদা নানা দেশে থাকা অসম্ভব হয় এবং ধর্ম্ম শাস্ত্র-কথিত জন্মান্তরীয় গজ ও পিপীলিকাদি শরীরেই বা মানবদেহানুরূপ জীব কিরূপে ব্যাপিয়া থাকিতে পারে?

আবার রজ্জুতে সর্পভ্রম যেরূপ মিথ্যা, ব্রহ্মে এই জগৎ তদ্রূপ মিথ্যা। ইহা অবিদ্যার কার্য্য, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, তখন জগৎ-প্রপঞ্চও নিবৃত্ত হয় ইত্যাদি শঙ্কর-মতও এই শ্রীভাষ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। শঙ্কর মতে অবিদ্যা—ভাব পদার্থ, ইহা সৎও নহে, অসৎও নহে; সুতরাং জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে। এই

অবিদ্যাসিদ্ধির নিমিত্ত যে শ্রুতি উদ্ধার করেন, তাহাতে ভাবরূপ অবিদ্যার সিদ্ধি হয় না, কারণ, শ্রুত্যুক্ত 'অনৃত' শব্দে সাংসারিক অল্প-ফলজনক কর্ম্ম এবং 'মায়া' শব্দে বিচিত্র সৃষ্টিকারিণী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বুঝাইয়া থাকে। মুক্তিতেও অবিদ্যা সিদ্ধ হয় না; কারণ, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, তাহার আশ্রয়ে অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না, ইত্যাদি নানাবিধ বিচার শ্রীভাষ্যে আছে।

রামানুজের মতে চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিন পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। চিৎ শব্দে জীবাত্মা,—ইনি কর্ম্মফলভোক্তা, নিত্য ও চেতন স্বরূপ এবং পরমাত্মার সকাশে ভিন্নরূপে প্রতীত হন। ভগবৎ-আরাধনা ও তৎপদ-প্রাপ্তিই জীবের স্বভাব। অচিৎ—প্রত্যক্ষ-গোচর যাবতীয় জড় পদার্থ—ইহা ত্রিবিধ, অন্নজলাদি ভোগ্যবস্তু, ভোজনপানাদি ভোগোপকরণ ও শরীরাদি ভোগায়তন; আর ঈশ্বর—বিশ্বের কর্ত্তা, উপাদান ও নিখিলজীবের নিয়ামক। যথা—

"বাসুদেবঃ পরংব্রহ্ম কল্যাণগুণসংযুতঃ।
ভুবনানামুপাদানাং কর্ত্তা জীব-নিয়ামকঃ॥"

সর্ব্বদর্শনান্তর্গত—রামানুজদর্শনম্।

ভগবান্ বাসুদেব লীলাবশতঃ পঞ্চমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন। ১ম, অর্চ্চা—প্রতিমাদি, ২য়, বিভব—মৎস্যকূর্ম্মরামাদি অবতার, ৩য়, ব্যূহ—বাসুদেব, বলরাম, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ চতুর্ব্যূহ ৪র্থ, সূক্ষ্ম—সম্পূর্ণ ষড়্গুণশালী* বাসুদেব নামক পরব্রহ্ম ৫ম, সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্য্যামী। উপাসনা ৫ প্রকার। অভিগমন (দেব-মন্দির মার্জ্জনাদি ও অনুগমন) উপাদান (গন্ধপুষ্পাদি-পূজোপকরণ-সংগ্রহ) ইজ্যা (দেব-পূজা—পূজায় বলি নিষিদ্ধ) স্বাধ্যায়—(মন্ত্রজপ, বৈষ্ণব-সূক্ত স্তবাদি পাঠ ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন শাস্ত্রাভ্যাস) যোগ (ধ্যান-ধারণা দেবতানুসন্ধানের নাম যোগ।

* ষড়্গুণ।—বিরজ (রজোগুণাভাব) বিমৃত্যু (মরণাভাব) বিশোক (শোকাভাব) বিজিঘৎসা (ক্ষুৎপিপাসাদির অভাব) সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প।

পাঞ্চরাত্র বৈষ্ণবগণই শ্রীরামানুজাচার্য্যের সময় শ্রী-সম্প্রদায়ী নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধানতঃ দুইটী শাখা। একটী আচারী, দ্বিতীয়টী রামানন্দী বা রামাৎ। আচারী বৈষ্ণবরা সম্পূর্ণ রামানুজাচার্য্যের মতের অনুকূল বলিয়া ইহাঁদিগকে মূল-সম্প্রদায়-ভুক্ত বলা যায়। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে কবীরপন্থী, রয়দাসী, সেনপন্থী, খাকী, মলুকদাসী, দাদুপন্থী রামসনেহী প্রভৃতি বহু শাখা সম্প্রদায় হইয়াছে। এই সকল শাখা-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব, বাঙ্গলায় অধিক না থাকায় উহাদের বিষয় বিশদ বর্ণিত হইলনা। বাঙ্গলার অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণবের বীজপুরুষ এই আচারী ও রামাৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কারণ, শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের দ্বারা বাঙ্গলায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যতটা প্রসার লাভ করিয়াছিল, অন্য তিন সম্প্রদায় দ্বারা ততটা ঘটে নাই। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ উহাঁদের ন্যায় সার্ব্বজনীন উদারতা দেখাইতে পারেন নাই।

শিষ্য-পরম্পরাগত বৈষ্ণবদিগের উপাধি আচার্য্য ছিল ঐ আচার্য্য উপাধি হইতেই " আচারী " উপাধি হইয়াছে। রামাৎ বৈষ্ণবদিগকে যেমন " সাধারণী বৈষ্ণব " বলে, এবং সেই সাধারণী-বৈষ্ণবদিগের উপাধি যেরূপ " দাস ", সেইরূপ ইহাঁদেরও উপাধি আচারী। আচারী-সম্প্রদায়ে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ এবং বংশ-পরম্পরায় রামানুজ-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতে দীক্ষিত। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরঙ্গজীবিগ্রহ রঙ্গাচার্য্য নামে এক আচারী ব্রাহ্মণের যত্নে প্রতিষ্ঠিত। এবং তদীয় সেবক লক্ষ্মীচাঁদ শেঠ কর্ত্তৃক শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দির নির্ম্মিত। বাঙ্গলার মধ্যে চন্দ্রকোণা ও মুর্শিদাবাদে ইহাঁদের দেবালয় আছে। ইহাঁরা ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি নানা বর্ণকে শিষ্য করেন, কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যজাতি এই সম্প্রদায়ে গুরু হইতে পারেন না। পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে শ্রী-বৈষ্ণবেরা " দাসোহস্মি বা দাসোহহং " বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের গুরু-প্রণালী। যথা—

শ্রী—(লক্ষ্মীদেবী), বিষ্বক্‌সেন্,—বেদব্যাস—(ব্রহ্ম-সূত্রকার) বৌধায়ন—(বিশিষ্টাদ্বৈত মতে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার) গুহদেব—ভারুচি,—ব্রহ্মানন্দ—দ্রমিড়াচার্য্য—শঠকোপ—বোপদেব—শ্রীনাথ—পুণ্ডরীকাক্ষ—রামমিশ্র — শ্রীপরাঙ্কুশ—যামুনাচার্য্য—**শ্রীরামানুজাচার্য্য**—দেবাচার্য্য — হরিনন্দ —রাঘবানন্দ—**রামানন্দ**—(ইনি স্বতন্ত্র রামানন্দী বা রামাৎ শাখা-সম্প্রদায় গঠন করেন)--রামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে ১২শটী, শিষ্য অতি প্রসিদ্ধ। যথা—আশানন্দ, কবীর, রয়দাস, পীপা, সুরানন্দ, সুখানন্দ, ধন্না, সেন, মহানন্দ, পরমানন্দ, প্রিয়ানন্দ। ইহাঁরা স্ব স্ব নামে পৃথক্ উপাসক-সম্প্রদায় গঠন করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ে রামানন্দী সম্প্রদায়ের সহিত ইহাঁদের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

শ্রীরামানুজাচার্য্য পাষণ্ড, বৌদ্ধ, চার্ব্বাক, মায়াবাদী প্রভৃতি অবৈদিকগণকে বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত করিয়া বৈদিক বৈষ্ণব-বিপ্রত্বে উন্নীত করিয়াছিলেন।

" পাষণ্ড-বৌদ্ধ চার্ব্বাক মায়াবাদ্যাস্ত্ববৈদিকাঃ।
সর্ব্বে যতীন্দ্রমাশ্রিত্য বভুবু র্বৈদিকোত্তমাঃ॥" প্রপন্নামৃত।

"রামানন্দী বা রামাৎ।"

রামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রী-সম্প্রদায়িদের কঠোর নিয়মাবলী হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করাই রামানন্দের প্রধান উদ্দেশ্য। কথিত আছে—রামানন্দ নানা দেশভ্রমণ করিয়া মঠে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার সতীর্থগণ ও গুরু রাঘবানন্দ,—" দেশ-ভ্রমণে ভোজন-ক্রিয়া-গোপন সম্বন্ধে নিয়ম যথাযথ প্রতিপালিত হয় নাই" বলিয়া রামানন্দকে পতিত জ্ঞানে পৃথক ভোজন করিতে আজ্ঞা দেন। রামানন্দ ইহাতে অপমানিত হইয়া তাঁহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বনাম-প্রসিদ্ধ রামানন্দী বা "রামাৎ" সম্প্রদায়-গঠন করেন। খৃঃ ১৩শ, শতাব্দির শেষভাগে রামানন্দ প্রয়াগে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম পুণ্যসদন (কাণ্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণ) মাতার নাম সুশীলা। শ্রীরাম-সীতা ইহাঁদের প্রধান উপাস্য দেবতা। তুলসী, শালগ্রাম, বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার

মূর্ত্তিরও পূজা করেন। রামাৎ-বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। ভক্তমাত্রেই একজাতি। ইহাঁরা বলেন—"ভগবান্ যখন মৎস্য-কূর্ম্মাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন ভক্তদিগের নীচবংশে আবির্ভাব অসম্ভব নহে। রামানন্দের সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শিষ্যগণের মধ্যে কবীর জোলা তাঁতি, রয়দাস চামার, পীপা রাজপুত, ধন্না জাঠ, কবীর-পন্থীর শিষ্যানুশিষ্য দাদূ (দাদূ-পন্থী প্রবর্ত্তক) ধুনুরি ছিলেন। বঙ্গদেশে এই সকল রামাৎ বৈষ্ণবের শাখা-সম্প্রদায়ী একবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গের অধিকাংশ প্রাচীন গৃহস্থ বৈষ্ণব আচারী ও মূল রামাইত সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে কৌলিক মত পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীমহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত মত গ্রহণ করায় এবং গৌড়বঙ্গে বাস নিবন্ধন ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করায় তাঁহারা এক্ষণে গৌড়াদ্য-ব্রহ্ম-বৈষ্ণব বা বৈদিক-বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়াছেন। শুনা যায়, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানের গৃহস্থ রামাৎ বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেকে রাত্রিতে ভিক্ষা করেন। তাঁহারা বলেন—"দিবসে সঙ্কল্পিত নাম-জপ-পূজাদি অর্চ্চনায় ব্যস্ত থাকা কর্ত্তব্য, সুতরাং দিবসে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। অবশ্য ইহা প্রশংসার কথা।

ভক্তমাল গ্রন্থে রামানন্দী বৈষ্ণব-চরিত্রের অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। অনেকে বলেন, ভক্তমাল-প্রণেতা নাভাজী, সুরদাস, তুলসীদাস, কবি জয়দেব, ইহাঁরাও রামানন্দী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

২য়, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আচার্য্য — শ্রীমধ্বাচার্য্য। দর্শনমত — দ্বৈত। নিষ্ঠা—কীর্ত্তন। এই সম্প্রদায় অতি প্রাচীন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মধ্বাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। উপাস্য—পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; বর্ত্তমান উপাসনা—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়েই অনুপ্রবিষ্ট। এই মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ বিচার পরে উল্লিখিত হইবে। দক্ষিণাপথের তুলব দেশের অন্তর্গত

পাপনাশিনী নদীতীরে উড়ুপকৃষ্ণ গ্রামে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ বংশে মধ্বাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম বাসুদেব। সনক-কুলোৎপন্ন আচার্য্য অচ্যুত-প্রেচের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইঁহার নাম "আনন্দতীর্থ" হয়। ইনি অনন্তেশ্বর মঠে অবস্থান করিয়া বিদ্যা অভ্যাস করেন। সাধারণতঃ ইনি মধ্বাচার্য্য নামে আখ্যাত। তিনি ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, উহার নাম মাধ্ব-ভাষ্য বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন। এই দর্শন দ্বৈতবাদপর। এই মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বর-সেবক। বেদ অপৌরুষেয় সিদ্ধার্থবোধক ও স্বতঃপ্রমাণ। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রমাণ। এই মতে জগৎ সত্য। এ বিষয়ে রামানুজ ও মধ্ব এক মতাবলম্বী। মধ্ব বলেন—রামানুজ ভেদ, অভেদ, ভেদাভেদ এই তিন তত্ত্ব স্বীকার করিয়া শঙ্কর-মতের পোষকতাই করিয়াছেন। ইনি "তত্ত্বমসি" শ্রুতিতে "তস্য ত্বং" অর্থাৎ তাঁহার তুমি (তেস্য ভেদক—সেব্য সেবক সম্বন্ধে ষষ্ঠীতৎ পুরুষ সমাস)—তৎ-পদে ঈশ্বর, ত্বং পদে জীব,—ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক—এইরূপ জীবেশ্বরের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই মতে তত্ত্ব ২টী; স্বতন্ত্র—ঈশ্বর এবং অস্বতন্ত্র জীব-ঈশ্বরাধীন। এই মতে উপাসনা ত্রিবিধ। অঙ্গে বিষ্ণুচক্রাদি অঙ্কন, নামকরণ অর্থাৎ বিষ্ণুর নামে সন্তানাদির নামকরণ, এবং তৃতীয় ভজন। ভজন দশবিধ। যথা—

"ভজনং দশবিধং বাচা সত্যং হিতং প্রিয়ং স্বাধ্যায়ঃ, কায়েন দানং পরিত্রাণং পরিরক্ষণং মনসা দয়া স্পৃহা শ্রদ্ধা চেতি। অত্রৈকৈকং নিষ্পাদ্য নারায়ণে সমর্পণং ভজনং।" সর্ব্বদর্শনে—পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনম্।

অর্থাৎ বাচিক—সত্যবচন, হিতকথন, প্রিয়ভাষণ ও শাস্ত্রানুশীলন, কায়িক—দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; মানসিক—দয়া, স্পৃহা, শ্রদ্ধা। ইঁহারা দণ্ডীদের ন্যায় যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। ইঁহারা বিবাহাদির পর দীর্ঘকাল সংসারে বাস করিয়া শেষজীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। দণ্ডকমণ্ডলু ও গৈরিক ধারণ করেন। তিলক শ্রী-বৈষ্ণবদেরই মত, তবে বিশেষ এই যে, রামানুজীয় বৈষ্ণবগণ দুই

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে পীত বা রক্তবর্ণের রেখাঙ্কন করেন, ইহাঁরা নারায়ণ নিবেদিত দগ্ধ গন্ধদ্রব্যের ভস্মদ্বারা ঐ স্থলে একটী কৃষ্ণবর্ণের রেখা অঙ্কিত করিয়া শেষভাগে হরিদ্রাময় এক বর্ত্তুলাকার তিলক করিয়া থাকেন।

মধ্বাচার্য্য সুব্রহ্মণ্য, উদীপি ও মধ্যতল এই তিন স্থানের মঠে শ্রীশালগ্রাম শিলা স্থাপন করেন, তদ্ভিন্ন উদীপিতে এক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহও স্থাপন করেন। প্রবাদ—ইহা আদি শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দ্বারকায় প্রথম স্থাপিত হন। পরে মধ্বাচার্য্য ইহা এক বণিকের হরিচন্দন-পূর্ণ জলমগ্ন নৌকা হইতে উত্তোলন করাইয়া স্থাপিত করেন। এই শ্রীবিগ্রহ রাধিকা-বিহীন, মন্থন পাশধারী শিশুকৃষ্ণমূর্ত্তি। আবার তুলব দেশের অন্তর্গত কান্নুর, গেঙ্গাওর, আজমার, ফলমার, কৃষ্ণপুর, সিরুর, সোদ ও পুত্তি নামক স্থানে ৮টী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রামসীতা, লক্ষ্মণসীতা, কালীয়মর্দ্দন, চতুর্ভুজ কালীয়মর্দ্দন, সুবিতল, সুকর, নৃসিংহ বসন্ত-বিতল এই ৮ বিগ্রহ স্থাপন করেন। মধ্বাচার্য্য—সূত্রভাষ্য, ঋগ্‌ভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য ভারত তাৎপর্য্য, ভাগবত তাৎপর্য্য প্রভৃতি ৩৭ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। রামানুজ-সম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় বহুল রূপে বিস্তৃত না হইবার প্রধান কারণ, ইহাঁরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণকে দীক্ষাগুরু হইবার অধিকার প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হন। তবে দীক্ষাগুরুরা নিতান্ত অন্ত্যজ জাতি ব্যতীত সকলকেই দীক্ষা ও উপদেশ দানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

"মধ্বদিগ্বিজয়" গ্রন্থে মধ্বাচার্য্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্বাচার্য্যের "মায়াবাদ-শত দূষণী-সংহিতা" দ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। ইহা অতি বৃহদ্‌ গ্রন্থ ও বিবিধ বিচারপূর্ণ। এজন্য গৌড়দেশবাসী পূর্ণানন্দ স্বামী উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া ১১৯ শ্লোকে "তত্ত্ব মুক্তাবলী বা মায়াবাদ শত-দূষণী" নামে প্রচার করেন। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদের উপর একশত দোষারোপ করার হেতু ইহার নাম শতদূষণী।

ইহাঁদের দেবালয়ে বিষ্ণুমূর্ত্তির সহিত শিব পার্ব্বতী ও গণেশের মূর্ত্তিও পূজিত

হইয়া থাকেন, ইহাতে বুঝা যায় শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে পরস্পর বিবাদ-ভঞ্জনার্থ মধ্বাচার্য্য যথেষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি অনন্তেশ্বর নামক শিব-মন্দিরে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত "তীর্থ" উপাধি গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণু-মন্দিরে শিবদুর্গাদির পূজা প্রবর্ত্তিত করেন, শৃঙ্গগিরি মঠের শৈব-মোহন্ত উড়ুপ-কৃষ্ণ নগরে (উদীপি নগরে) শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে পূজা করিতে গমন করেন। ফলতঃ শৈব-বৈষ্ণবে সদ্ভাব-সম্পাদন করাই মধ্বাচার্য্যের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক দ্বৈতাদ্বৈতবাদ যত অধিক প্রচারিত হউক না হউক, তদীয় শিষ্যানুশিষ্য জয়তীর্থ কর্ত্তৃক এই মত দক্ষিণাপথ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল।

জয়তীর্থ উক্ত প্রদেশের পাণ্ডারপুরের নিকটবর্ত্তী মঙ্গলবেড়ে গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রঘুনাথ রাও এবং মাতার নাম রুক্মিণী বাঈ। পত্নীর নাম ভীমা বাঈ। পত্নীর উগ্র স্বভাবে বিরক্ত হইয়া তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি বেদান্ত সম্বন্ধে "তত্ত্ব-প্রকাশিকা," ন্যায়-দীপিকা প্রভৃতি বহুতর বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর খৃষ্টীয় ১৩শ, শতাব্দের প্রারম্ভে শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের সার সঙ্কলন-করিয়া (১৮ হাজারের মধ্যে ৪০৩ শত শ্লোক) "শ্রীবিষ্ণুভক্তি-রত্নাবলী" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীধর স্বামীর মতে কতিপয় স্বকৃত শ্লোকও আছে। ইনি জয়ধর্ম্মমুনির শিষ্য। অদ্বৈত প্রভুর সমসাময়িক শ্রীহট্ট—লাউড় গ্রামনিবাসী লাউড়িয়া কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থের একটী বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাঁর পূর্ব্ববাস মিথিলা বা ত্রিহুতের তরৌণী গ্রামে; পূর্ব্বনাম বিষ্ণুশর্ম্মা। ত্রিহুতের চলিত নাম তীরভুক্তি, এই দেশবাসী বলিয়া ইনি "তৈরভুক্ত" নামেও পরিচিত।

রামানুজ সম্প্রদায়ের ন্যায় মধ্বাচারী বৈষ্ণবদের শাখা-সম্প্রদায় তত প্রচলিত

দেখা যায় না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মাধ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। রামানুজ সম্প্রদায়ে যে সঙ্কীর্ণতা ছিল, তাহা পরবর্ত্তী কালে রামানন্দ কর্ত্তৃক বিদূরিত হইয়া এক সার্ব্বজনীন উদারতার উজ্জ্বল ধর্ম্মমার্গ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতাও সেইরূপ শ্রীচৈতন্যের সময়ে সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হয়। গুরুত্ব সম্বন্ধে যে বাঁধাবাঁধি নিয়ম (Restriction) ছিল, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু শিথিল করিয়া দিয়া মেঘ-মন্দ্রে ঘোষণা করিলেন—

"কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥" চৈঃ চঃ মধ্য।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বহু ঊর্দ্ধে ভাগবত ধর্ম্ম অবস্থিত; ইহাতে আচণ্ডাল সকলেরই অধিকার আছে, এই বৈদিক বিশুদ্ধ ধর্ম্মমত প্রচারের ফলে স্মার্ত্তগণের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও শ্রীমহাপ্রভুর মত ভারতের সর্ব্বত্র ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেন, বাঙ্গলাদেশের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক এই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। চৈতন্যদেবের শিক্ষা হিন্দুর নিম্নস্তরে পর্য্যন্ত প্রবেশ লাভ করায় ১ কোটী ৯০ লক্ষ বঙ্গবাসী হিন্দুর মধ্যে অন্ততঃ ১ কোটী ৫০ লক্ষ শ্রীচৈতন্য দেবের প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে।

রামাইৎ সম্প্রদায় যেরূপ মূলতঃ শ্রী-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত, সেইরূপ এই শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ও মূলতঃ ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত। কারণ, ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কলিতে চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্বীকার করিতে গেলে, ৫টী সম্প্রদায় হইয়া পড়ে। শাস্ত্র বাক্যের তথা ঋষিবাক্যের সার্থকতা ও যথার্থতা থাকেনা। জাতি অসংখ্য হইলেও যেমন সকলেই চারিবর্ণের অন্তর্গত, সেইরূপ বৈষ্ণবের বহু শাখা-সম্প্রদায় থাকিলেও মূলতঃ চারি সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে শাস্ত্র-শুদ্ধ সদাচার, সামাজিক ব্যবহার ও ধর্ম্মমতের তারতম্য অনুসারে উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ও পতিত এইরূপ শ্রেণী বিভাগ পূর্ব্বাপর প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

সে যাহা হউক অতঃপর অপর ২টী সম্প্রদায়ের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

৩য়, রুদ্র-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্য বিষ্ণুস্বামী। দর্শনমত—শুদ্ধাদ্বৈত। নিষ্ঠা—আত্ম-নিবেদন। উপাস্য শ্রীবালগোপাল। বিষ্ণুস্বামী রুদ্রদেবের পরম্পরা শিষ্য বলিয়া এই সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র-সম্প্রদায়। বেদ-ভাষ্যকার বিষ্ণুস্বামী এই মতের সারতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভিন্ন কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। তাঁহার শিষ্য-জ্ঞানদেব, তৎশিষ্য,—নামদেব—তৎশিষ্য ত্রিলোচন—এবং এই ত্রিলোচনের শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ **বল্লভাচার্য্য**। বল্লভাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি করেন বলিয়া ইহার প্রচলিত নাম বল্লভাচারী। ১৫শ, শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল উপাসনা প্রবর্ত্তিত করেন। শেষে গোকুলস্থ গোস্বামিগণই ইহার প্রচারক হয়েন। ত্রৈলিঙ্গ দেশীয় লক্ষ্মণভট্টের ঔরসে ১৪০১ শকে (খৃঃ ১৪৭৯ অব্দে) বল্লভাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। বল্লভাচার্য্য বেদান্তের একভাষ্য রচনা করেন, এই ভাষ্যের নাম "অণুভাষ্য"। ভাগবতেরও এক টীকা করিয়াছেন। এই টীকাই সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। তদ্ভিন্ন সিদ্ধান্ত-রহস্য, ভাগবতলীলা-রহস্য এবং হিন্দী ভাষায় বিষ্ণুপদ, ব্রজবিলাস, অষ্টছাপ ও বার্ত্তা নামে কতিপয় গ্রন্থ আছে। বল্লভাচার্য্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। বল্লভাচারিদের 'বার্ত্তা' নামক গ্রন্থে জীব ও ব্রহ্মের এক প্রকার অভেদ ভাবই উল্লিখিত হইয়াছে। "আচার্য্যকে ঠাকুরজী (শ্রীকৃষ্ণ) কহিলেন—তুমি ব্রহ্মের সহিত জীবের যেরূপ সংযোগ সাধন করিবে, আমি তাহাই স্বীকার করিব।" সুতরাং উঁহাদের মতে জীব ও ব্রহ্মের কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে পরমার্থতঃ অভেদই বর্ণিত আছে। দেব সেবা বিষয়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। শ্রীগোপাল, শ্রীরাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির অষ্টকালীন সেবা করার নিয়ম আছে। তদ্ভিন্ন রথযাত্রায় উড়িষ্যাদেশে, জন্মাষ্টমী ও রথযাত্রায় পশ্চিম অঞ্চলে, রাসে শ্রীবৃন্দাবনাদি স্থানে মহাসমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

বল্লভাচারী বৈষ্ণবেরা ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কন পূর্ব্বক নাসামূলে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি করিয়া মিলাইয়া দেন, এবং উর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যভাগে রক্তবর্ণ বর্ত্তুলাকার তিলক ধারণ করেন। শ্রী-বৈষ্ণবের ন্যায় বাহুতে ও বক্ষে শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদিও মুদ্রিত করিয়া থাকেন। কেহ কেহ "শ্যামবিন্দী" নামক কৃষ্ণমৃত্তিকা দ্বারাও উক্ত বার্ত্তুলাকার তিলক অঙ্কন করিয়া থাকেন। ইহাঁরা কণ্ঠে তুলসীমালা ও তুলসীর জপমালা ধারণ করেন। "শ্রীকৃষ্ণ" "জয়গোপাল" বলিয়া পরস্পর অভিবাদন করেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-আবিষ্কৃত শ্রীগোবর্দ্ধননাথ বিগ্রহ মথুরায় ছিলেন। আরঙ্গজেব বাদসাহ তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অনুমতি করিলে ঐ বিগ্রহ ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে উদয়পুরের নাথদ্বারে নীত হন এবং এই বিগ্রহের নাম শ্রীনাথজী হয়। ইহাই এই সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের প্রধান তীর্থ। তদ্ভিন্ন, কোটা, সুরাট, কাশী (লালজীর মন্দির ও পুরুষোত্তম মন্দির) মথুরা, বৃন্দাবনে ইহাঁদের মঠ ও দেবালয় আছে। বল্লভাচার্য্য নিজ জন্ম স্থান চম্পকারণ্য হইতে পরে প্রয়াগের সন্নিকট আড়ুলী গ্রামে বাস করেন। বল্লভাচার্য্য এই স্থান হইতে প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং প্রভুকে নিজালয়ে লইয়া যান। ত্রিহুতের বৈষ্ণব-পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যায় তথায় প্রভুর দর্শন লাভ করেন। বল্লভাচার্য্য শেষ জীবনে নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীকিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

বল্লভাচার্য্যের পুত্র বিঠ্‌ঠল নাথ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহাকে শ্রীগোঁসাইজী বলেন। বিঠ্‌ঠল নাথের ৭ পুত্র। গির্ধরিরায়, গোবিন্দরায়, বালকৃষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ ও ঘনশ্যাম। ইঁহারা পৃথক্ পৃথক্ সমাজভুক্ত হইলেও ধর্ম্ম বিষয়ে সকলে একমত।

এই সম্প্রদায়ের মতে ভগবানের উপাসনায় কোন প্রকার শারীরিক ক্লেশ, অর্থাৎ উপবাস, তপস্যা, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবার আবশ্যকতা নাই। কোনরূপ কঠোরতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই। পূর্ণমাত্রায় বিষয়সুখসম্ভোগ করিয়া

ভগবানের সেবা করা। এই জন্য এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা অতিমাত্র বিষয়ী ও ভোগবিলাসী। গুজরাট্‌ ও মালোয়াড়ের বহুতর স্বর্ণবণিক ও ব্যবসায়ী এই মতাবলম্বী।

এই সম্প্রদায়ের ব্রহ্ম-সম্বন্ধ ও সমর্পন বা আত্মনিবেদন করিবার একটী মন্ত্র "সত্যার্থ-প্রকাশ" গ্রন্থ হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল—

"শ্রীকৃষ্ণঃ শরণং মম, সহস্র-বৎসর-পরিমিত-কালজাত কৃষ্ণবিয়োগ জনিত তাপক্লেশানন্ত তিরোভাবোঽহং ভগবতে কৃষ্ণায় দেহেন্দ্রিয় প্রাণান্তঃকরণ তদ্ধর্ম্মাংশ্চ দারাগার পুত্রাপ্ত বিত্তেহ পরাণ্যাত্মনা সহ সমর্পয়ামি দাসোঽহং কৃষ্ণ তবাস্মি।"

ফলতঃ দেহেন্দ্রিয় প্রাণ, মন, বিবাহিতা-স্ত্রী, পুত্র, প্রাপ্তধন গৃহাদি সমুদয়ই শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপী গোঁসাইগণই উহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মতে অন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ নিষিদ্ধ। এই সকল কারণেই ইহাঁরা চিরদিন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব হইতে পৃথক্‌ হইয়া রহিয়াছেন। এই বল্লভী-সম্প্রদায় এক্ষণে দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখার অনুরাগী শিষ্যেরা নিজেদের স্ত্রী, কন্যা, পুত্র, পুত্রবধূ দিগকে শ্রীগোঁসাইকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-জ্ঞানে সমর্পণ করেন—ইহাঁরা "পুষ্টিমার্গী" বলিয়া অভিহিত। দ্বিতীয় শাখার লোকেরা বেদাদি সৎশাস্ত্রকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, ঐরূপ করেন না; বরং প্রথম শাখাস্থ ব্যক্তিদিগকে ও তাহাদের গোঁসাইদিগকে "পুষ্টিমার্গী" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

যে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক বল্লভাচার্য্য শেষে শ্রীমহাপ্রভুর চরণাশ্রয় করিলেন, তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেন; কিন্তু সেই বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ শ্রীমহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত ভাল করিয়া বুঝিলেন না—সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলেন না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে। বল্লভাচার্য্যের পৌত্র গিরিধারী ভাগবতের 'বালপ্রবোধিনী' নাম্নী টীকা রচনা করেন। এই গিরিধারী ২৫২টী দলভুক্ত

লোককে স্বমতে আনয়ন করেন। ৭০ বৎসর বয়সে ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে দেহরক্ষা করেন। মেরতার রাজা রতনসিংহের কন্যা ও উদয়পুরের রাণার প্রধানা মহিষী প্রসিদ্ধা মীরাবাই এই সম্প্রদায়-ভুক্তা ছিলেন। মীরা খৃঃ ১৪৯৮ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বহুতর পদ রচনা করিয়াছেন। শাশুড়ী শক্তি-উপাসিকা রাজমাতা, বধূ—পরমা বৈষ্ণবী। এই ধর্ম্ম-বিষয়ে রাজমাতার সহিত বিবাদের ফলেই মীরা স্বামীগৃহ হইতে নির্ব্বাসিতা হন। মীরা এইরূপে স্বতন্ত্রা হইয়া "রণ-ছোড়" নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। পরে খৃঃ ১৫৪৬ অব্দে মীরা অমানুষী ভক্তিবলে রণছোড়ের অঙ্গে লীন হইয়াছিলেন, ইহাই প্রবাদ। এই ব্যাপারের স্মরণার্থ অদ্যাবধি উদয়পুরে রণছোড়ের সঙ্গে মীরারও পূজা হইয়া থাকে। মীরা মোগল সম্রাট আকবরকে কৃষ্ণগুণ-গানে মুগ্ধ করেন। মীরা শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান কালে একদা শ্রীরূপ গোস্বামীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে শ্রীরূপ স্ত্রী-সম্ভাষণ হইবে ভাবিয়া দেখা করেন নাই, তাহাতে মীরা দুঃখিত হইয়া শ্রীরূপকে বলিয়া পাঠান—

"এতদিন শুনি নাই শ্রীমদ্ বৃন্দাবনে।
আর কেহ পুরুষ আছয়ে কৃষ্ণ বিনে॥" ভক্তমাল।

শ্রীরূপ লজ্জিত হইয়া মীরার সহিত দেখা করিতে বাধ্য হইলেন। মীরা শেষ জীবন দ্বারকায় অতিবাহিত করেন। এ সম্প্রদায়ের শাখা-সম্প্রদায় তত নাই। বাঙ্গলা দেশেও প্রায় দৃষ্ট হয় না এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বল্লভাচারী বৈষ্ণব অতি বিরল।

৪র্থ, সনক-সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যের নাম—নিম্বার্ক স্বামী। দর্শন-মত—দ্বৈতাদ্বৈত। প্রাচীন উপাসনা—শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মতা জ্ঞান ও ধ্যান। বর্ত্তমান উপাসনা—যুগলস্বরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান ও সেবা। নিষ্ঠা—অনন্যতা। শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্র। নিম্বাদিত্যকৃত একখানি বেদান্তের ভাষ্যও আছে। তিনি

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীবৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। ফলতঃ শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কালে শ্রীনিম্বাদিত্য স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করেন। কিন্তু এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। পশ্চিম দেশে যে সমস্ত নিমাইৎ সম্প্রদায়ের মঠ আছে, তাহার প্রধান প্রধান গুলি ১৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের নির্ম্মিত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। তাহা হইলে খৃঃ ৫ম, শতাব্দীতে বেদান্ত-সূত্রের নিম্বার্কীয় ভাষ্যের সত্তা উপলব্ধি হয়। অতি প্রাচীন শ্রীনিবাস ও কেশব কাশ্মীরি কৃত টীকা দ্বয়যুক্ত নিম্বার্কভাষ্য শ্রীবৃন্দাবনে মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থ মথুরাতে আরঙ্গজেবের সময়ে (১৬৭০ খৃঃ অব্দে) নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য তাহার কিছুই জানিবার উপায় নাই। পরে ১৭শ, শতাব্দীতে আচার্য্য বিঠ্‌ঠল ভক্ত কর্ত্তৃক এই মত পরিস্ফুট হয়। নিম্বার্কের চলিত নাম নিমার্গী, নিমানন্দী; নিম্বাদিত্যের পূর্ব্ব নাম ভাস্করাচার্য্য। স্বয়ং সূর্য্যাবতার—পাষণ্ডদলনার্থ অবতীর্ণ। বৃন্দাবনের নিকট তাঁহার বাস ছিল। নিম্বার্ক নামের উপাখ্যান এই যে, একদা এক দণ্ডী (কোন মতে জৈন-সন্ন্যাসী) অপরাহ্নে ভাস্করাচার্য্যের আশ্রমে উপস্থিত হন। আচার্য্য ক্ষুধিত অতিথি-সৎকারের জন্য আহার্য্য-সঞ্চয়ে অধিক বিলম্ব করিয়া ফেলিলেন; এদিকে সূর্য্য অস্তোন্মুখ দেখিয়া অথিতি আহার্য্য গ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন আচার্য্য যোগবলে সূর্য্যদেবকে অতিথির ভোজনকাল পর্য্যন্ত আশ্রম সন্নিহিত নিম্ব-তরুতে আনিয়া প্রস্ফুট দিবালোক প্রদর্শন করিলেন। অতিথির ভোজন হইল। পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলেন। এই ঘটনাই ভাস্করাচার্য্যের নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নাম হইবার কারণ। নিম্বার্ক বেদেরও একখানি টীকা রচনা করেন।

ইঁহারা ললাটে গোপীচন্দনের দুইটী উর্দ্ধরেখা রচনা করিয়া মধ্যস্থলে কৃষ্ণ-বর্ণের বর্ত্তুলাকার এক তিলক রচনা করেন। কণ্ঠমালা ও জপমালা, তুলসী নির্ম্মিত।

নিম্বাদিত্যের কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামক দুই শিষ্য হইতে গৃহস্থ ও উদাসীন দুই সম্প্রদায় গঠিত হয়। যমুনা তীরে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্কের গদি আছে।

হরিব্যাস গৃহস্থ ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলের বিশেষতঃ মথুরায় অনেকেই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালাতেও নিমাৎ সম্প্রদায়ী অনেক বৈষ্ণব আছেন। ইহাঁদের শাস্ত্রীয় মত বল্লভী সম্প্রদায় হইতে তত ভিন্ন নহে। তবে বল্লভাচারিদের ন্যায় বিধি হইতে তাদৃশ শিথিল নহে।

প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ধর্ম্মমত ও কার্য্য-কলাপ আলোচনা করিলে, সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের ধর্ম্মমতের ছায়া পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বিশেষ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। বেদ-প্রতিপাদ্য বিষ্ণুই যে সকল সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের উপাস্য, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এই ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার ও অবতারিগণও বৈষ্ণবের আরাধ্য। বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণাবতারের পূর্ণব্রহ্মত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"এতে চাংশ কলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল, ৯ম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের নাম স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর লীলাতত্ত্বের বীজাঙ্কুর বেদগর্ভে নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে, তাহার পরিচয়ও ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং বৈদিক কাল হইতে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা সাম্প্রদায়িক রূপে পরিগৃহীত না হইলেও, পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুস্বরূপে তিনি যে শুদ্ধ-সত্ত্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মহাভারত রচনার কাল হইতেই সাম্প্রদায়িক ভাবে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এরূপ অনেকে অনুমান করেন। অথর্ব্ব বেদান্তর্গত শ্রীগোপাল-তাপনী শ্রুতিতে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টাদশাক্ষর

শ্রীকৃষ্ণ উপাসনা অবৈদিকী নহে।

মন্ত্ররাজ ও তাহার অর্চ্চনা প্রণালী বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং আরও তাহাতে শ্রীরাধার প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। বেদমূলক পুরাণে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের উৎস উৎসারিত আছে। সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণ রচনা কালে সর্ব্ববাদি-সম্মতরূপে শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ স্বীকার করা যায়। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদী শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যও "শ্রীগোবিন্দাষ্টকাদি" গ্রন্থ

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ-ভগবত্তা স্বীকার করিয়া স্তব করিয়াছেন। তিনি পরিশেষে আরও স্বীকার করিয়াছেন—

" মুক্তোঽপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তজন্তি।"

অর্থাৎ সনকাদি চিরমুক্ত মুনিগণ ব্রহ্মভূত থাকিয়াও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সবিশেষ ব্রহ্মের অর্থাৎ শ্রীভগবানের লীলা-বিগ্রহ স্বীকার করিয়া সেই শ্রীভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। শ্রুতি—" রসো বৈ সঃ।" " আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি " ইত্যাদি বাক্যে সেই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা, উপাসনা-মার্গের চরম সীমা। ব্রহ্ম সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্য কর্ত্তৃক এই শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনা জন-সাধারণে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সার্ব্বজনীনরূপে বিস্তৃত হইতে পারে নাই। সর্ব্বশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের আরও উদারতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-উপাসনায়—এত কাল যাহা কিছু অভাব ও অপূর্ণতা ছিল, করুণাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া তাহার পূর্ণ-পরিপুষ্টি-সাধন করিয়াছেন, আর তিনি সর্ব্বজীবকে সাধনার চরম তত্ত্ব শিক্ষাদান করিয়াছেন।

ভারতে হিন্দু-রাজত্বের অবসান সময়ে, কালের অনিবার্য্য কুটিলচক্রে জীব সকল শ্রীভগবানের মধুর তত্ত্ব ভুলিয়া দুঃখ-সাগরে ভাসিতে লাগিল। তন্ত্রের তামসিক আচারে সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইল। জীব ভক্তির মঙ্গলময় পথহারা হইয়া কর্ম্ম মার্গের কঠোরতার দিকে প্রধাবিত হইল, শুষ্ক তর্কের কর্কশ কোলাহলে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ স্মৃতির কঠিন শাসন-প্রণালী বিধিবদ্ধ করিয়া সমাজকে আরও নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাহার উপর ইসলাম্-বিপ্লব—মুসলমানধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ! হিন্দু-সমাজ অপার দুঃখসাগরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। এই দুর্গতাবস্থার সময় করুণাময় শ্রীভগবান্ শ্রীধাম নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া বেদ প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম্মের অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের

সাধনাবধি জীবকে অবাধে শিক্ষা দান করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভয় আশ্বাস পাইয়া কাতর-প্রাণ জীবসকল এক নব-জীবন লাভ করিল—সমস্ত কষ্ট-কঠোরতা ভুলিয়া সে আনন্দের সংবাদে মাতিয়া উঠিল। উচ্চবর্ণাভিমানিগণের কৌশলে যাহারা সমাজে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিতভাবে কালযাপন করিতেছিল, তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় সাম্য ও উদারনীতিমূলক ভক্তিবাদের নব উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত হইয়া আত্মোন্নতি লাভের পথ প্রাপ্ত হইল। আবার ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান অধিকারে শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া লুপ্ত-মর্য্যাদা পুনরুদ্ধার করিবার শুভ অবসর লাভ করিল।

অন্যান্য সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকদিগের ন্যায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু স্বয়ং একটী নূতন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবের প্রসিদ্ধ যে চারি সম্প্রদায় আছে, তিনি তন্মধ্যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতকে স্বীয় ভাবের অধিক অনুকূল বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। আবার জীব-শিক্ষার উদ্দেশে দীক্ষা-গ্রহণচ্ছলে গুরু-পরম্পরা অনুসারে আপনাকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই গণনা করিয়াছেন। যথা—

মাধ্বগৌড়েশ্বর সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তি।

"শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মদেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংজ্ঞকান্।
শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমন্নৃহরি-মাধবান্॥
অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিন্ধু-দয়ানিধীন্।
শ্রীবিদ্যানিধিরাজেন্দ্র-জয়ধর্ম্মান্ ক্রমাদ্বয়ম॥
পুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য-ব্যাসতীর্থাংশ্চ সংস্তুমঃ।
ততো লক্ষ্মীপতিং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রঞ্চ ভক্তিতঃ॥
তচ্ছিষ্যান্ শ্রীশ্বরাদ্বৈত-নিত্যানন্দান্ জগদ্‌গুরূন্।
দেবমীশ্বর-শিষ্যং শ্রীচৈতন্যঞ্চ ভজামহে।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ॥" প্রমেয় রত্নাবলী।

অর্থাৎ পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য দেবর্ষি নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাসদেব, ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্বাচার্য্য (আনন্দতীর্থ), মধ্বাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপদ্মনাভ,

তাঁহার শিষ্য নরহরি, নরহরির শিষ্য মাধব, মাধবের শিষ্য অক্ষোভ্য, অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়তীর্থ, তাঁহার শিষ্য শ্রীজ্ঞানসিন্ধু, তাঁহার শিষ্য মহানিধি, তাঁহার শিষ্য বিদ্যানিধি, তৎশিষ্য রাজেন্দ্র, তৎশিষ্য জয়ধর্ম্মমুনি, তাঁহার শিষ্য বিষ্ণুপুরী ও পুরুষোত্তম, তাঁহার শিষ্য ব্রহ্মণ্য, তাঁহার শিষ্য ব্যাসতীর্থ (বিষ্ণুসংহিতা প্রণেতা) তাঁহার শিষ্য লক্ষ্মীপতি, তাঁহার শিষ্য শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী, তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও জগদ্‌গুরু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। শ্রীপাদ্ ঈশ্বরপুরীর শিষ্য **শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু।**

সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় চারি সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নহে। উহা মাধ্ব-সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটী প্রধানতম শাখা-বিশেষ। মূল মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতে বা অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে ইহার বিশেষত্ব এই যে, পরব্রহ্মের সহিত জীবের যে শুদ্ধ সম্বন্ধ, তাহা শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ বিমোহনের জন্য মায়াবাদের আবরণে আবৃত করিয়া ফেলেন। পরে শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দ্বারা সে শুদ্ধ-সম্বন্ধের উন্মেষ সাধিত হয়; কিন্তু তিনি সে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রফুল্লতা প্রদর্শন করেন নাই। অনন্তর শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যস্বামী শ্রুতিমূলক দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া সেই সম্বন্ধ জ্ঞানকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিলেন, কিন্তু তাহাতেও সম্বন্ধ-তত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ হইল না। অতঃপর শ্রীমন্নিম্বাদিত্য স্বামী দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার দ্বারা এবং শ্রীমদ্বিষ্ণু স্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ প্রচার দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ সাধন করেন মাত্র। অবশেষে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রেম ধর্ম্মের নিত্যতা স্থাপন উদ্দেশ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ দ্বারা সেই সম্বন্ধ জ্ঞানের চরমোৎকর্ষ বা পূর্ণতা সম্পাদন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম বা অপৌরুষেয় ভাষ্য। এবম্প্রকার উত্তম ভাষ্য থাকিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্বয়ং আর কোন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। পরন্তু শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যকেই অপেক্ষাকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত দেখিয়া উহাকেই স্বীয় সম্প্রদায়ের ভাষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তবে

মাধ্ব-ভাষ্যের যে যে অংশ আপাততঃ শ্রীমদ্ভাগবতের বিরোধী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন, তিনি সেই সেই অংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়া দিয়া তাহার সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। এই সামঞ্জস্যের ফলই, শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ কর্তৃক "গোবিন্দ-ভাষ্যে" সঙ্কলিত হইয়াছে এবং তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গৌরব-বর্দ্ধন করিয়াছে। খৃঃ ১৭১৮ অব্দে অম্বর-রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহের রাজত্বকালে স্বকীয়া ও পরকীয়াবাদ লইয়া বৈষ্ণবগণের মধ্যে মহাবিরোধ উপস্থিত হয়। বিরুদ্ধবাদি-বৈষ্ণবগণ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন—শ্রীগোবিন্দদেবের সহিত শ্রীরাধিকার মূর্ত্তি পূজা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। রাজা শ্রীমতী রাধিকার শ্রীমূর্ত্তি পৃথক্ গৃহে রাখিয়া স্বতন্ত্র পূজার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা আরও প্রতিবাদ করিলেন—"রামানুজাচার্য্য, মধ্বাচার্য্য, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বার্ক এই ৪ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ৪ খানি বেদান্তভাষ্য আছে। বেদান্তের ভাষ্য না থাকিলে সম্প্রদায় বদ্ধমূল বা সুসিদ্ধ হয় না। শ্রীচৈতন্যদেব যদিও মাধ্ব-সম্প্রদায়ী কেশব ভারতীর শিষ্য, তথাপি তাঁহার মত মাধ্বমতের বিপরীত—অচিন্ত্যভেদাভেদ। এজন্য শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত গোস্বামি-শিষ্যগণকে মাধ্ব-সম্প্রদায়ী না বলিয়া চৈতন্য-পন্থী বলা উচিত এবং বৃন্দাবনস্থ শ্রীগোবিন্দ-জীর সেবাতেও তাঁহাদের অধিকার নাই, কারণ তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব।"—জয়পুরের অন্তর্গত গল্তার গাদীর শাঙ্কর-সন্ন্যাসিগণ এই মর্ম্ম রাজাকে জ্ঞাপন করিলে, রাজা হঠকারিতায় প্রবৃত্ত না হইয়া ৪ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব পণ্ডিত এবং শ্রীবৃন্দাবনের গোস্বামিদিগের শিষ্যগণকে লইয়া এক মহতী সভার আয়োজন করেন। বৃন্দাবনে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরই তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয় এবং বার্দ্ধক্যে জরাজীর্ণ হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস করিতেছিলেন। তিনি শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণকে কতিপয় বৈষ্ণব সহ বিচার-সভায় পাঠাইলেন। ইহাঁরা উক্ত মর্ম্মে জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন—"গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ।"

ইত্যাদি প্রমাণ বলে ভাগবতই বেদান্তভাষ্য। নীলাচলে সার্ব্বভৌমের সহিত বিচারপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু এই কথাই বলিয়াছিলেন, মাধ্বভাষ্যের সিদ্ধান্ত লইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাহার বিচার পূর্ব্বক গোস্বামিগণকে উপদেশ দেন; তাঁহারা সেই অনুসারে ষট্‌সন্দর্ভ গ্রন্থে সমস্ত ভাগবতরূপী ভাষ্যাদির মত প্রকটিত করিয়াছেন।" এই কথায় এক শাঙ্কর সন্ন্যাসী স্বপক্ষ দুর্ব্বল ভাবিয়া বিচারে উদ্যত হন। বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীচৈতন্যদেব স্বীকৃত অর্থানুসারে বিচার করিয়া ঐ সন্ন্যাসীকে পরাস্ত করেন। ইহাতে সন্ন্যাসীপক্ষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে কহিলেন—"আপনি কোন্ ভাষ্যানুগত যুক্তি লইয়া এই বিচার করিলেন?" বলদেব বলিলেন—"ইহা শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের ভাষ্যানুগত।"

অনন্তর তাঁহারা ভাষ্য দেখিতে চাহিলে বলদেব এক মাসের মধ্যে সমগ্র বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করেন। বস্তুতঃ তখন "ষট্‌সন্দর্ভ" ব্যতীত কোন বেদান্তভাষ্য বা সিদ্ধান্ত গ্রন্থ ছিল না। ভাষ্য-প্রদর্শনের পর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ মাধ্ব-সম্প্রদায়ী বলিয়া শ্রীগোবিন্দজীর সেবাতে অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ বলদেব শ্রীগোবিন্দদেবের কৃপায় এই ভাষ্য রচনা করেন বলিয়া ইহা "শ্রীগোবিন্দভাষ্য" নামে অভিহিত। এই রূপে সকলকে জয় করিয়া উক্ত শাঙ্কর সন্ন্যাসিদের গল্‌তার গাদীতে জয়সূচক শ্রীজিত-গোপাল" নামক শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন পূর্ব্বক তাহাও অধিকার করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পক্ষে ষট্‌সন্দর্ভের পর 'গোবিন্দভাষ্যই' প্রধান দার্শনিক গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন বলদেব, সিদ্ধান্ত রত্ন বা ভাষ্যপীঠক, প্রমেয়-রত্নাবলী ও তাহার কান্তিমালা টীকা, গীতাভাষ্য, দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য, স্তব-মালাভাষ্য ও সারঙ্গরঙ্গদা নামক লঘুভাগবতামৃতের এক টীকা প্রণয়ন করেন।

শ্রীমদ্ বলদেব বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক। সুতরাং ১৬২৬ শকাব্দের পূর্ব্বেও বলদেবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য কৃষ্ণদেবাচার্য্য

সার্ব্বভৌম-কৃত(১) কর্ণপুরগোস্বামীর " অলঙ্কার-কৌস্তুভের " টীকায় জানা যায়; শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকল দেশীয় খণ্ডাইত কুলে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি মাধ্ব-মতের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। ইনি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পরিবারভুক্ত। গুরু-প্রণালী অনুসারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীরসিকানন্দদেবের শিষ্যান্বয়ে চতুর্থ শিষ্য। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনে যে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করেন, বলদেব সেই শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শিষ্য-পরম্পরা ব্যতীত প্রায় সেবাধিকার লাভ করিতে দেখা যায় না। কান্যকুব্জ-বিপ্র-বংশোদ্ভূত " বেদান্ত-স্যমন্তক "-রচয়িতা শ্রীরাধা-দামোদর বিদ্যাভূষণের দীক্ষাগুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং গুরুপরম্পরায় ইনিও শ্রীশ্যামানন্দ পরিবারভুক্ত বৈষ্ণব।*

---

(১)শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং "নৃসিংহপরিচর্য্যা" নামক স্মৃতিনিবন্ধ সঙ্কলয়িতা। কেহ বলেন " প্রমেয়রত্নাবলীর " " কান্তিমালা " টীকা শ্রীকৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশ নামে অন্য এক মহাত্মা রচনা করেন।

*শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ মুরারি, শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্দ, তৎপুত্র শ্রীনয়নানন্দ (ইনি শ্রীরসিকানন্দের শিষ্য) শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য কান্যকুব্জ-বিপ্র-বংশোদ্ভূত—শ্রীরাধাদামোদর (বেদান্ত স্যমন্তক-রচয়িতা) গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ এই শ্রীরাধাদামোদরের দীক্ষিত শিষ্য। ছন্দঃ-কৌস্তুভ ভাষ্য প্রারম্ভে—

" অর্চ্চিত নয়নানন্দো রাধাদামোদরো গুরুর্জীয়াৎ।
বিবৃণোমি যস্য কৃপয়া ছন্দঃকৌস্তুভ মহৎ মিতবাক্॥
শ্রীরাধাদামোদর-শিষ্যো বিদ্যাভূষণো নাম্না।
ছন্দঃকৌস্তুভ-শাস্ত্রে ভাষ্য মিদং সম্প্রতি ব্যদধাৎ॥"

এবং বিদ্যাভূষণ কৃত সিদ্ধান্ত-রত্ন ৮ম, পাদ, ৩৪ সংখ্যায় উক্ত হইয়াছে—" বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদর-পদপঙ্কজ ধূলয়ঃ।" উহার ভাষ্যপীঠক টীপ্পনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—

" রাধাদামোদর কান্যকুব্জ বিপ্রবংশজঃ স্বস্য মন্ত্রোপদেষ্টা ইত্যাদি।"

শ্রীবলদেবের "প্রমেয়রত্নাবলী" ও শ্রীরাধাদামোদরের "বেদান্তস্যমন্তক" প্রায় একই উদ্দেশ্য-প্রতিপাদক দার্শনিক গ্রন্থ। দর্শনমত যথা—

"শ্রীমধ্বঃপ্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাং।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥"

অর্থাৎ (১) মাধ্বমতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব (২) তিনি সর্ব্ববেদবেদ্য (৩) জগৎ সত্য এবং (৪) তদ্গত ভেদও সত্য (৫) জীব শ্রীহরির নিত্যদাস, (৬) জীবের তারতম্য আছে, (৭) শ্রীহরিপাদপদ্মলাভই মোক্ষ অর্থাৎ শ্রীহরির নিত্য পার্ষদ বা নিত্য-অনুচর হইয়া স্ব-স্বরূপে পরমানন্দ উপভোগই মোক্ষ, (৮) অমলা অর্থাৎ অহেতুকী ভক্তিই সেই মোক্ষের সাধন, (৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শাব্দ অর্থাৎ আপ্তবচন এই তিনটী প্রমাণ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রভু ইহাই উপদেশ করিয়াছেন।

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে কেহ কেহ "মাধ্ব-গৌড়েশ্বর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু মূলতঃ ইহা যখন ব্রহ্ম-সম্প্রদায়েরই অন্তর্নিবিষ্ট, তখন এ সম্প্রদায়কে "মাধ্ব-গৌড়েশ্বর" বলা অপেক্ষা "ব্রহ্ম-সম্প্রদায়—শ্রীগৌড়েশ্বর-শাখা" বলাই সমীচীন বোধ হয়। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের যে শাখায় গৌড়ের ঈশ্বর—শ্রীগৌরাঙ্গপ্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহার নাম শ্রীগৌড়েশ্বর শাখা। অতএব এই শ্রীচৈতন্য-মতানুবর্ত্তী বৈষ্ণবগণ সাধারণ পরিচয়ে "মধ্বাচারী-গৌড়ীয় বৈষ্ণব" অথবা "গৌড়-মাধ্বাচারী বৈষ্ণব" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

শ্রীপাদ বলদেবের দুই শিষ্য। নন্দ মিশ্র ও উদ্ধব দাস। বিরক্ত-শিরোমণি শ্রীপীতাম্বর দাসের নিকট শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ বেষাশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'শ্রীগোবিন্দদাস' নাম প্রাপ্ত হন এবং তদনুসারেই তাঁহার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের নাম "গোবিন্দ-ভাষ্য" হইয়াছে।

দ্বিতীয় অংশ।

বৈষ্ণব-সাহিত্য।

—:০:—

নবম উল্লাস।

সাহিত্যই সমাজ-শরীরে নবউদ্দীপনার স্পন্দন আনয়ন করে। জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় উন্নতির সোপান। সাহিত্যের প্রভাব জাতীয়-জীবনেই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সুতরাং বৈষ্ণব-সাহিত্যই বৈষ্ণব-সমাজের—গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতি-সমাজের গৌরবময় জীবন স্বরূপ। অতএব বঙ্গীয় বৈষ্ণব-ইতিহাসের আলোচনা-প্রসঙ্গে অনন্ত বিস্তার বৈষ্ণব-সাহিত্য-সিন্ধুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দির প্রারম্ভ হইতে ষোড়শ শতাব্দের কিছুকাল পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-সাহিত্যের উন্নতি ও বিস্তৃতি। শ্রীমহাপ্রভুর প্রকটকালের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের পরিচয় ইতঃপূর্ব্বে একরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর শিষ্যানুশিষ্য সুধীবর্গ সংস্কৃত ও বাঙ্গলাভাষাতে ভক্তিরস-সমন্বিত যে সকল কাব্য, নাটক, অলঙ্কার ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্য-কাননকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, যথাক্রমে সেই সকল গ্রন্থাবলীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ শ্রীমহাপ্রভু, মাধবমুকুন্দ ও লোকনাথ গোস্বামীর বিষয়ই উল্লেখ করা যাইতেছে। কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু ১৪০৭ শকে খৃঃ ১৪৮৬ অব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যার পর চন্দ্রগ্রহণ সময়ে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম—শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীনীলকণ্ঠ মিশ্রের পুত্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—অপর নাম "মিশ্র পুরন্দর।" মাতা—শ্রীনবদ্বীপ-নিবাসী শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীশচীঠাকুরাণী। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম শ্রীবিশ্বরূপ; ইনি ষোড়শ বর্ষ বয়সে রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করিয়া পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার মাতুলপুত্র লোকনাথও

সঙ্গী হইয়াছিলেন। সন্ন্যাসাশ্রমে বিশ্বরূপের নাম "শ্রীশঙ্করারণ্য" হইয়াছিল। লোকনাথও বিশ্বরূপের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া গুরুর অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৮ বৎসর বয়সে পুণার নিকট পাণ্ডুপুর নামক স্থানে অপ্রকট হন। ১৪৩০ শকাব্দ পর্য্যন্ত ২৪ বৎসর শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও কীর্ত্তন-বিহার করেন। ইহাই আদিলীলা বা গৃহবাস। ১৪৩১ শকে মাঘমাসে সন্ন্যাস। ১৪৩২ শকে নীলাচল হইতে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের তীর্থ ভ্রমণ। ১৪৩৩ শকে রথযাত্রা দর্শন, ১৪৩৪ শকে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ও গৌড় হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, ১৪৩৫ শকে বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা, ১৪৩৬ শকে প্রয়াগ ও কাশী হইয়া বনপথে নীলাচলে আগমন। ১৪৩১ হইতে ১৪৩৬ পর্য্যন্ত এই ছয় বৎসর, দক্ষিণ, গৌড় ও বৃন্দাবন ভ্রমণ—ইহাই মধ্যলীলা। শেষ আঠার বৎসর শ্রীনীলাচলে বাস, তন্মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর গৌড়ের শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীরাঘবাদি ভক্তগণের সহিত আনন্দোৎসব। শেষ ১২ বৎসর কেবল প্রেমোন্মত্ততা, ইহাই অন্তঃলীলা। সাকল্যে ৪৮ বৎসর শ্রীগৌরলীলা।

শ্রীগৌরাঙ্গ যখন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, তখন বিশ্ববিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তার্কিক-চূড়ামণি রঘুনাথ শিরোমণির গৌরব-রক্ষার্থ মহাপ্রভু স্ব-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের টীকা গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করেন। ইহা স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" নামক বর্ত্তমান প্রচলিত স্মৃতি-গ্রন্থের সংগ্রাহক। তান্ত্রিক চূড়ামণি কৃষ্ণানন্দ "তন্ত্রসার" নামে তন্ত্র গ্রন্থের সংগ্রাহক। ফলতঃ শ্রীমহাপ্রভুর উক্ত ভুবন-বিখ্যাত সহাধ্যায়ী তিন জনের মধ্যে একজন তার্কিক, একজন স্মার্ত্ত ও একজন তান্ত্রিক, এবং শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং বিশ্ব-বিশ্রুত আদর্শ বৈষ্ণব। ইহাঁর প্রথমা পত্নী—শ্রীবল্লভ ঠাকুরের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া। সর্পদংশনচ্ছলে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার তিরোভাবের পর

শ্রীগৌরাঙ্গ ২০ বৎসর বয়সে (১৪২৭ শকে) শ্রীপাদ সনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর নিকট শ্রীমহাপ্রভু লোকাচার-রক্ষার্থ শ্রীগোপীজনবল্লভ দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে কাটোয়ায় শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসাশ্রমের নাম " শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।"

শ্রীমহাপ্রভুর " শিক্ষাষ্টক "* বলিয়া যে ৮টী শ্লোক-রত্ন আছে, উহা বৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার স্বরূপ। তদ্ভিন্ন " প্রেমামৃত " নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রীমহাপ্রভুর লিখিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে পঞ্চতত্ত্বের মধ্যে শ্রীমহাপ্রভু ভিন্ন অপর ৪টী তত্ত্বেরও সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু।—বীরভূম জেলায়—মল্লারপুর রেলষ্টেশনের নিকট প্রাচীন একচক্রা বা একচাকা গ্রামে ১৩৯৫ শকে খৃঃ ১৪৭৩ অব্দে মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীমুকুন্দ ওঝার (ডাক নাম—হাড়াই পণ্ডিত বা হাড়ু ওঝার) ঔরসে শ্রীপদ্মাবতী দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ১২ বৎসর বয়সের কালে শ্রীনিত্যানন্দকে এক সন্ন্যাসী (কেহ কেহ বলেন এই সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ) ভিক্ষাস্বরূপ লইয়া যান। ২০ বৎসর তীর্থ ভ্রমণের পর শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীমহাপ্রভুর সহিত নবদ্বীপে আসিয়া মিলিত হন। নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহেই ইহাঁর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইনি মার খাইয়াও মহাপাষণ্ড জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর নাম-ধর্ম্ম-প্রচারে অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীনিতাইচাঁদই সর্ব্বাগ্রণী।

---

* শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখোক্ত এই " শিক্ষাষ্টক " ও শ্রীমদ্দাস গোস্বামি-কৃত " মনঃশিক্ষা " মূল সংস্কৃত, টীকা ও বিশদ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সহ " শ্রীশ্রীশিক্ষামৃত " নামে " ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় " হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ‌।।০ আনা মাত্র।

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু দশনামী শাঙ্কর সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ভুক্ত না হইয়া তান্ত্রিক অবধূতাশ্রম গ্রহণ করায় ইনি তুরীয় পরমহংস—ভক্তাবধূত নামে অভিহিত। তিনি বর্ণাশ্রম-আচার-শূন্য সংসার-বিরাগী মহাপুরুষ ছিলেন। ইনি নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন। ১৪৩৪ শকে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমধন-প্রচারার্থ গৌড় মণ্ডলে প্রেরণ করেন। বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বহু নরনারীকে শিষ্য করেন। ১৪৪১ শকে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রিয়শিষ্য উদ্ধারণ দত্তের উদ্যোগে অম্বিকা—কালনা নিবাসী শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের কন্যা শ্রীমতী বসুধাদেবীর পাণি গ্রহণ করেন এবং দুই বৎসর পরে বসুধাদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীজাহ্নবাদেবীকেও বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে অবধূত শ্রীনিত্যানন্দকে বৈদিক বিধান অনুসারে উপনয়ন সংস্কার করিতে হইয়াছিল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য; সুতরাং শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীমদ্ ঈশ্বর পুরীর সতীর্থ। ইহাঁর পূর্ব্বাশ্রমের নাম কেহ কেহ ' কুবের ' বলেন। খড়দহ ইহাঁর শ্রীপাট। শ্রীবসুধা নাম্নী পত্নীর গর্ভে নিত্যানন্দ প্রভুর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—নাম শ্রীবীরচন্দ্র। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ৯ বৎসর পরে ১৪৬৪ শকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অসংখ্য পরিকরগণের মধ্যে উদ্ধারণদত্ত, কৃষ্ণদাস, কংসারি সেন, জগদীশ পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, কানুরামদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, পদকর্ত্তা জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, বাবা আউল মনোহর দাস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু।—শ্রীহট্ট জেলার—লাউড় গ্রামে দিব্য সিংহ রাজার মন্ত্রী কুবের আচার্য্যের ঔরসে নাভাদেবীর গর্ভে ১৩৫৫ শকে (খৃঃ ১৪৩৪) মাঘী শুক্লা সপ্তমী তিথিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ব্বনাম " কমলাক্ষ "—উপাধি " বেদ-পঞ্চানন "। ইনি পরে শান্তিপুরে

আসিয়া বাস করেন। ইঁহার সীতা ও শ্রী নাম্নী দুই পত্নী। অদ্বৈতপ্রভুর পাঁচ পুত্র—অচ্যুত, কৃষ্ণমিশ্র, বলরাম, গোপাল ও জগদীশ।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু তীর্থ-পর্য্যটন উপলক্ষে মিথিলায় গমন করিলে ১৩৭৭ শকে কবি বিদ্যাপতির সহিত তাঁহার মিলন হয় এবং তাঁহার অদ্ভুত কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন শ্রবণে বিমুগ্ধ হন।

আসামের ধর্ম্মপ্রচারক শ্রীশঙ্করদেব—শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শিষ্য। তদ্ভিন্ন অনন্তদাস, গোপালদাস, বিষ্ণুদাস, অনন্ত আচার্য্য, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ১২৫ বৎসর ধরাধামে প্রকট থাকিয়া ১৪৭৯ শকে লীলা অপ্রকট করেন।

শ্রীবাস পণ্ডিত।—শ্রীহট্টবাসী জলধর পণ্ডিতের পঞ্চ পুত্রের একজন। জলধর ও তাঁহার পুত্রগণ নবদ্বীপ ও কুমারহট্ট এই উভয় স্থানেই বাস করিতেন। পঞ্চপুত্র—শ্রীনলিন, শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীকান্ত বা শ্রীনিধি। "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত"-প্রণেতা ব্যাসাবতার শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুরের জননী শ্রীমতী নারায়ণী, এই শ্রীনলিনপণ্ডিতের কন্যা। ১৪২৮ শকে শ্রীমহাপ্রভু এই শ্রীবাসভবনে শ্রীনৃসিংহ দেবের আসনে উঠিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেন। এই শ্রীবাসের অঙ্গনই শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের কেন্দ্র স্থান ছিল।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত।—শ্রীধাম নবদ্বীপ মধ্যস্থ চাঁপাহাটী গ্রামে শ্রীমাধব মিশ্রের ঔরসে ও রত্নাবতী দেবীর গর্ভে ১৪০৯ শকে (খৃঃ ১৪৮৭) বৈশাখী অমাবস্যায় জন্মগ্রহণ করেন। গদাধরের জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম বাণীনাথ। গদাধর চির-কুমার ছিলেন। বাণীনাথের পুত্র নয়নানন্দ, শ্রীগদাধরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মুর্শিদাবাদ—কান্দি মহাকুমায় ভরতপুর গ্রামে বাস করেন। ভরতপুর "পণ্ডিত গোস্বামীর পাট" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পাটে শ্রীমহাপ্রভুর হস্তাক্ষরযুক্ত ও শ্রীগদাধর পণ্ডিত-লিখিত একখানি গীতাগ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। শ্রীমহাপ্রভুর দারুণ বিচ্ছেদে ১৪৫৬ শকে শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী অপ্রকট হয়েন।

শ্রীমহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু কুমারহট্ট—(হালিসহর) নিবাসী **শ্রীপাদ ঈশ্বর-পুরী** শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানকালে "শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত" নামে একখানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গুরু **শ্রীপাদ কেশব ভারতী,** বর্দ্ধমান-জেলা, থানা মন্তেশ্বরের অধীন দেনুড়গ্রামে (এই গ্রামেই শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট) আনুমানিক ১৩৮০ শকে (খৃঃ ১৪৫৮) মাঘী শুক্লা ভৈমী একাদশী তিথিতে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শুদ্ধ শ্রোত্রীয় মুকুন্দমুরারির পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তৈলঙ্গদেশে বৈদূর্য্যপত্তন নগরে গাঙ্গুল ভট্টের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া গীতার "তত্ত্বপ্রকাশিকা" ভাষ্য, "কৌস্তভপ্রভা" নামে ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, "উপনিষদ্ প্রকাশিকা" নামক দ্বাদশ উপনিষদ্ ভাষ্য, "ক্রম-দীপিকা" নামক বিষ্ণুমন্ত্রোদ্ধারক তন্ত্রগ্রন্থ ও শ্রীভাগবত ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন। শ্রীভারতী প্রভু ভেদাভেদবাদী ছিলেন। গীতা-ব্যাখ্যার অনেক স্থলে বলদেব বিদ্যাভূষণ ও মধুসূদন প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। ইনি প্রথমে শাঙ্কর দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ব্রহ্ম-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতী আখ্যা লাভ করেন। পরে শ্রীপাদ্ মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট শ্রীগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীমাধব মুকুন্দ।—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব-কাশ্মীরীর গুরু। মাধব মুকুন্দের বাসস্থান বঙ্গদেশস্থ অরুণঘণ্টা নামক গ্রাম। ইনি "পরপক্ষ-গিরিবজ্র বা অধ্যাস-গিরিবজ্র" নামক সংস্কৃত দার্শনিক গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থে বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শঙ্কর-মত খণ্ডন করিয়া দ্বৈত-মত স্থাপন করা হইয়াছে।

কেশব কাশ্মীরী।—দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে বিদ্যা-বিচারে পরাস্ত হন। নিম্বার্কাচার্য্যের বেদান্তভাষ্যের টীকাকার তৎ-শিষ্য শ্রীনিবাস। কেশব এই ভাষ্য ও টীকার মত লইয়া বেদান্তসূত্রের একটী বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। তাহাতে শ্রীমাধব মুকুন্দকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কেশব কাশ্মীরী শ্রীমহাপ্রভুর যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্বী—শেষ বয়সের শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী।

শ্রীলোকনাথ গোস্বামী।—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শিষ্য—জেলা যশোহরের অন্তর্গত তালখড়ি গ্রাম নিবাসী পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর ঔরসে ও সীতা-দেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। লোকনাথ মহাপ্রভুর পরম বন্ধু ও সমবয়স্ক। ইনি শান্তিপুরে প্রথম আসিয়া ভাগবত অধ্যয়ন করেন। পরে শ্রীমহাপ্রভুর আদেশে লোকনাথ, শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীকে সঙ্গে লইয়া লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার ও ভক্তি ধর্ম্মপ্রচারের জন্য শ্রীবৃন্দাবন গমন করেন। তথায় ইনিই প্রথমে "শ্রীগোকুলানন্দ" নামক শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুরের গুরু। ইনি "সীতা-মাহাত্ম্য'; নামে একখানি বাঙ্গলা পয়ার গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈত-পত্নী সীতাঠাকুরাণীর চরিত্র ও অনেক প্রাচীন বিবরণ বর্ণিত আছে। ১৫১০ শকে শ্রাবণী-কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীলোকনাথ নিত্য লীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীমুরারি গুপ্ত।—শ্রীহট্টবাসী বৈদ্যবংশীয় শ্রীমহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরিতম্" মহাকাব্য ইহাঁরই রচিত। এই গ্রন্থখানি "মুরারির কড়চা" নামেও প্রসিদ্ধ। অন্যান্য শ্রীচৈতন্য-লীলা গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান এই গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত। ১৪৩৫ শকে আষাঢ়ী শুক্লা পঞ্চমীতে এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়।

শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী।—ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত ; কাবেরী তীরস্থ শ্রীরঙ্গ ক্ষেত্রে জন্ম—শ্রীমদ্ গোপাল ভট্টের পিতা বেঙ্কটা-চার্য্যের সহোদর নাম প্রকাশানন্দ। শেষ জীবনে কাশীবাসী হয়েন। ইনি তৎকালে কাশীর সর্ব্বপ্রধান বৈদান্তিক পণ্ডিত ও মায়াবাদী সন্ন্যাসিদের নেতা ছিলেন। শ্রীমহা-প্রভুর কৃপায় তিনি তথায় অপূর্ব্ব ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া 'প্রবোধানন্দ' নামে অভি-হিত হন। ইনি শ্রীমহাপ্রভুকে যে স্তব স্তুতি করেন, তাহার সমষ্টিই—"শ্রীচৈতন্যচন্দ্রা-মৃত"। ইহার ১২টী বিভাগে যথাক্রমে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্ব্বাদ, গৌরভক্ত-মহিমা,

অভক্তের নিন্দা, নিজদৈন্য, উপাসনানিষ্ঠা, লোক-শিক্ষা, গৌরোৎকর্ষ, অবতার-মহিমা, রূপোল্লাস নৃত্যাদি এবং শোক বর্ণিত আছে। শ্লোকগুলি গৌরভক্তির সুধাময় উচ্ছ্বাস। 'আনন্দী' নামক জনৈক ভক্ত এই গ্রন্থের "রসিকাস্বাদনী" টীকা রচয়িতা।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী।—ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলে প্রাদুর্ভূত; মূল পুরুষ—কর্ণাটরাজ জগদ্‌গুরু, তৎপুত্র অনিরুদ্ধ, তৎপুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নবহট্ট বা নৈহাটীতে গঙ্গাবাস করেন। ইহাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে পঞ্চম মুকুন্দ, তৎপুত্র কুমার দেব, জেলা বরিশাল বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপে, ও যশোহর জেলার ফতেয়াবাদে বাস করেন। এই কুমারের পুত্র ১ম, শ্রীসনাতন ২য়, শ্রীরূপ, ৩য়, শ্রীবল্লভ (শ্রীমহাপ্রভু-প্রদত্ত নাম—অনুপম)। এই শ্রীবল্লভের পুত্রই শ্রীপাদজীব গোস্বামী।

১৪৯৩ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫২৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ের বাদসাহ আলাউদ্দীন হোসেন সাহের রাজত্ব কাল। গৌড়ের রাজধানী—বর্ত্তমান মালদহের নিকট রামকেলি নামক স্থানে ইহাঁরা তিন সহোদর কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ স্ব স্ব প্রতিভাবলে বাদসাহ হোসেন সাহের প্রধান মন্ত্রী ও তদীয় সহকারী হইয়াছিলেন। বাদসাহ-প্রদত্ত শ্রীসনাতনের "দবির খাস্" ও শ্রীরূপের "সাকর মল্লিক" উপাধি ছিল। ইহাঁরা পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীল বিদ্যাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীমহাপ্রভু প্রথমে শ্রীরূপকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করেন এবং প্রয়াগে তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিয়া শক্তি সঞ্চার করেন। পরে শ্রীসনাতনকে কৃপা করেন। শ্রীসনাতন রাজকার্য্যে অমনোযোগী হওয়ায় বাদসাহের বিরাগভাজন হইয়া বন্দী হন। পরে কারাধ্যক্ষের কৃপায় কারামুক্ত হইয়া কাশীতে গিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। শ্রীমহাপ্রভু সনাতনকে নিকটে রাখিয়া ভক্তি-ধর্ম্ম শিক্ষা দান করিলেন এবং নিজ শক্তি-সঞ্চার

করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়নে আদেশ করিলেন—

"এই দুই ভাই আমি পাঠাইনু বৃন্দাবনে।
শক্তি দিয়া ভক্তিশাস্ত্র করিতে প্রবর্ত্তনে॥"

অবশেষে শ্রীপাদ সনাতন শ্রীরূপ ও ভ্রাতুষ্পুত্র—শ্রীরূপের মন্ত্রশিষ্য—শ্রীজীব বৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অসংখ্য ভক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ভক্তি-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ রচনায় ইঁহারাই বৈষ্ণব-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। শ্রীপাদ সনাতন ১৪০৪ শকে আবির্ভূত হইয়া ১৪৮৬ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। দ্বাদশ আদিত্যটীলার নিকট তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি "শ্রীহরিভক্তিবিলাসে" বৈষ্ণবের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্রত, পূজা, দীক্ষা বিষ্ণুস্থাপন, সন্ধ্যাবন্দন, পূজোপকরণ, বৈষ্ণবাচার, ভক্ত-মাহাত্ম্য, ভক্তিমাহাত্ম্য, দ্বাদশ মাসিক কার্য্য, মালাজপ, মন্ত্রবিচার, বাস্তুযাগ প্রভৃতি সংক্ষেপে সঙ্কলন করিয়া শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী উহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামীকে প্রদান করেন। শ্রীভট্টগোস্বামী ঐ বিধিগুলির মাহাত্ম্যাদিসূচক বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা মূল গ্রন্থের আয়তন বৃদ্ধি করেন। এই গ্রন্থের অপর নাম "ভগবদ্ভক্তিবিলাস।" শ্রীপাদ সনাতন এই গ্রন্থের "দিক্প্রদর্শিনী" টীকা প্রণয়ন করিয়া এই গ্রন্থের গৌরব আরও বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এই "হরিভক্তি-বিলাসই" বঙ্গীয় বৈষ্ণবসমাজের প্রামাণ্য বৈষ্ণব-স্মৃতি। স্মার্ত্ত চূড়ামণি রঘুনন্দন ইহার অনেক ব্যবস্থা স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৈষ্ণবের আচার রক্ষা বিষয়ে এই হরিভক্তি-বিলাসই রাজদণ্ড স্বরূপ। ইহা অমান্য করিলে গোস্বামি-সম্প্রদায়ে তাহার স্থান নাই। এই স্মৃতি গ্রন্থে শাস্ত্রবাক্য, পরবাক্য ও নিজবাক্য এই ত্রিবিধ বাক্যভেদ আছে। সকল প্রকরণেই প্রথম স্মার্ত্তমত-বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার খণ্ডন বা সামঞ্জস্য বিধান পূর্ব্বক নিজমত স্থাপন করা হইয়াছে। সুতরাং যে সকল স্মার্ত্তধর্ম্ম-নিষ্ঠ পণ্ডিত ঐ সকল উদ্ধৃত স্মার্ত্তমতকে হরিভক্তি-বিলাসের দোহাই দিয়া বৈষ্ণব মত বলিয়া প্রচার করেন, তাঁহারা যে ঘোর ভ্রান্ত তাহা বলাই বাহুল্য। রঘুনন্দনের নব্য স্মৃতির সহিত

বৈষ্ণবস্মৃতির শ্রাদ্ধ ও একাদশী প্রভৃতি লইয়া চিরদিনই মতভেদ। এতদ্ভিন্ন "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা" নামে শ্রীমদ্ গোপালভট্টকৃত একখানি পদ্ধতি গ্রন্থও আছে। ইহাতে অনন্য-শরণ গৃহী বৈষ্ণবগণের বিবাহ, গর্ভাধান, অন্নপ্রাশন, উপনয়নাদি দশবিধ সংস্কার মন্ত্র ও প্রমাণ-প্রয়োগাদি সহ সঙ্কলিত আছে। গৌড়ীয় গৃহী বৈষ্ণবগণ এই পদ্ধতি অনুসারেই সংস্কারাদি করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ সনাতন-কৃত "বৃহদ্ভাগবতামৃতম্" প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবগণের উপাস্য নির্ণীত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা স্বয়ং ইহার টীকাকার—টীকার নাম "দিগ্দর্শনী।" ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত—বৃহৎ গ্রন্থ। বৈষ্ণবদিগের উপাসনা কাণ্ডে এই গ্রন্থই মুখ্য ও রাজপথ স্বরূপ। এই গ্রন্থের রচনা ও উপাখ্যান গুলি বড়ই মনোরম। শ্রীরূপগোস্বামী এই গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিণত করিয়া "লঘু ভাগবতামৃতম্" সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাও দুই খণ্ডে বিভক্ত—১ম, কৃষ্ণামৃত ২য়, ভক্তামৃত। শ্রীকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠতা ও নিত্য মূর্ত্তিত্ব, প্রকট-অপ্রকট লীলা, বাসুদেব হইতে নন্দনন্দনের ক্রিয়াশক্তিগত পার্থক্য প্রভৃতি এই গ্রন্থে বহুতর বিষয় আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। শ্রীপাদ সনাতন শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধের এক টীকা করিয়াছেন তাহার নাম "বৃহদ্ বৈষ্ণব-তোষণী"। অন্যাংশের টীকা না করিয়া কেবল ১০ম, স্কন্ধের টীকা রচনার উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণ-লীলারসাস্বাদ ভিন্ন কিছুই নয়, বলিয়া বোধ হয়। শ্রীজীব এই বৃহৎ তোষণীকে সংক্ষিপ্ত করিয়া "লঘুতোষণী" নাম প্রদান করেন। ১৪৭৬ শকে বৃহত্তোষণী রচনার শেষ হয়। শ্রীজীব ১৫০০ শকে উহাকে লঘুতোষণীতে পরিণত করেন। এতদ্ভিন্ন "দশম-চরিত," "রসময়-কলিকা" ও রসকীর্ত্তনের সংস্কৃত পদাবলী রচনা করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামী।—বৈষ্ণব-সাহিত্যকে বহু অমূল্য গ্রন্থরত্নে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রথম—"ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ," ইহাতে শান্ত-রসের মুখ্য ভক্তিরস বিস্তৃত ভাবে পল্লবিত করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী

শ্রীগোকুলে অবস্থান কালে ১৪৬৩ শকাব্দে এই গ্রন্থ শেষ করেন। ইহার টীকা "দুর্গম-সঙ্গমনী" শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-কৃত এবং "রসামৃত-শেষ" নামে শ্রীজীব কৃত এই গ্রন্থের একখানি পরিশিষ্টও আছে। ইহা দ্বিতীয় "সাহিত্য-দর্পণের" অংশ বলিলেও চলে। ভক্তির প্রকার ভেদ বহুবিধ, তন্মধ্যে শৃঙ্গার-রসাত্মিকা ভক্তি বিশেষ গোপনীয়, এজন্য "রসামৃতে" তাহার বিস্তৃতি না করিয়া স্বতন্ত্র "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে উজ্জ্বলরসের অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বহুলরূপে বিস্তৃত করিয়াছেন। সুতরাং রসামৃত ও উজ্জ্বলকে "হরিভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শ্রীজীবও ইহা লঘুতোষণীর শেষে শ্রীরূপের গ্রন্থের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন—"ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।" সমষ্টিভাবে ধরিলে শ্রীকবিকর্ণপুরের "অলঙ্কার কৌস্তভ" শ্রীরূপের "নাটকচন্দ্রিকা" ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জ্বলনীলমণি" এই চারিখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অলঙ্কার শাস্ত্র। তন্মধ্যে ১ম, খানিতে অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সর্ব্বসাধারণ বিষয়ের সমন্বয়, ২য়, খানিতে নাট্যাঙ্গের বহুলীকরণ, ৩য়, খানিতে সর্ব্বসাধারণ-ভক্তিরস এবং শেষ খানিতে রসরাজ শৃঙ্গার বা উজ্জ্বল রসের বহুল বিস্তার মাত্র। ইহাতে উক্ত রসের প্রকার ভেদ আছে। এই গ্রন্থে জ্ঞান না থাকিলে লীলা-রসকীর্ত্তন-গানে বা শ্রবণে অধিকার জন্মে না। ইহা অতি বৃহদ্ গ্রন্থ। ইহার দুইটী টীকা—শ্রীজীবকৃত "লোচনরোচনী" ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-কৃত "আনন্দ-চন্দ্রিকা।"

শ্রীরূপ-কৃত মহাকাব্য নাই। দুইখানি সর্ব্বগুণমণ্ডিত নাটক আছে। ১ম, "বিদগ্ধ-মাধব" সপ্ত অঙ্কে বিভক্ত। শ্রীবৃন্দাবনস্থ কেশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সম্মুখে শ্রীশ্রীগোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশে এই নাটক প্রথম অভিনীত হয়। নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভু ও ভক্তমণ্ডলী এই অমৃতায়মান নাটকের কিছু কিছু অংশ শ্রবণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে নাটকীয় সমস্ত বিষয়ের বিন্যাস ও নায়ক-নায়িকাগত সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার প্রয়োগ নানাবিধ ছন্দ, ভাব, অলঙ্কারের অপূর্ব্ব পারিপাট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এই নাটক

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক। ১৫৮৯ সম্বতে এই নাটক শ্রীগোকুলে সমাপ্ত হয়। ইহার টীকাকার শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। পদ্যানুবাদক—যদুনন্দন দাস। অনুবাদের নাম—"শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারস-কদম্ব।"

২য়, নাটক—"**ললিতমাধব**"—১০টী অঙ্কে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। নাটকীয় অন্যান্য অংশে উভয় নাটকই সমান। কল্পনাংশে ললিত-মাধবে কিছু আধিক্য লক্ষিত হয়। এই নাটক চতুঃষষ্টী কলাতে পরিপূর্ণ। সমস্ত লক্ষণ-ভূষণে ভূষিত। এই নাটক শ্রীবৃন্দাবনের ভদ্রবনে ১৪৫৯ শকাব্দে সমাপ্ত হয়। টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী। ইহার প্রথমাভিনয় শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে শ্রীমাধব-মন্দিরের সম্মুখে সম্পন্ন হয়।

"**দানকেলী-কৌমুদী**"—দৃশ্যকাব্যের অন্তর্গত 'ভাণ' নামক রূপক কাব্য। কৌমুদী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া ইহাকে ভাণিকা বলা হইয়াছে। টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। শ্রীরূপ ইহাতেও অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে দান-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।* শ্রীনন্দীশ্বরে ১৪৭১ শকাব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। টীকাকার শ্রীজীব গোস্বামী।

শ্রীরূপের আর একখানি গ্রন্থের নাম "**স্তবমালা**"। ইহাতে ৫১টী স্তব আছে। পৃথক্‌ভাবে ধরিলে প্রত্যেকে এক একখানি গ্রন্থ। শ্রীজীব ইহাকে সংগ্রহ করিয়া একত্র করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার নানা স্তব আছে। "**শ্রীগোবিন্দ-বিরুদাবলী**"—ইহাও স্তবমালার অন্তর্গত। ইহাতে ছন্দশাস্ত্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শিত হইয়াছে। কোন দাক্ষিণাত্য কবি প্রণীত "দেব-বিরুদাবলী" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। কেহ কেহ গোবিন্দবিরুদাবলীকে শ্রীজীব-কৃত বলেন। কিন্তু স্তবমালার টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ

*এই দানকেলিকৌমুদীর অতি প্রাঞ্জল অনুবাদ উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাষায় গ্রথিত হইয়া "শ্রীব্রজলীলামৃত" নামে "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

টীকারম্ভে স্পষ্টই শ্রীরূপ-কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। স্তবমালার অন্তর্গত "শ্রীগীতাবলী"* নামক এক পদাবলীর ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে, ইহা শ্রীসনাতন গোস্বামি-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। গীতের শেষে শ্রীকৃষ্ণবোধক "সনাতন" শব্দ ভনিতারূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীরূপ ইহার সংগ্রাহক। এই গীতাবলীর পদ শ্রীবৈষ্ণব দাসের "পদ-কল্পতরুতে" উদ্ধৃত হইয়াছে। স্তবমালার "চাটুপুষ্পাঞ্জলি" "মুকুন্দমুক্তা-বলী" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্তব বৈষ্ণবগণ নিত্য আহ্নিক-পূজাদির সময় পাঠ করিয়া থাকেন।

শ্রীরূপের অপর সংগ্রহ-গ্রন্থ "**পদ্যাবলী**"। শ্রীরূপ যখন রাম-কেলীতে গৌড়বাদসাহের মন্ত্রীরূপে বাস করেন, তখন নানা দিগ্দেশ হইতে বহু পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সংগৃহীত পদ্য সমষ্টিই এই "পদ্যাবলী।" ইহাতে পদ্যের পরম্পরান্বয় না থাকায় ইহা কোষ-কাব্যের অন্তর্গত। জেলা বর্দ্ধমান—মাড়গ্রাম নিবাসী নিত্যধামগত পণ্ডিত বীরচন্দ্র গোস্বামীই এই পদ্যাবলীর "রসিক-রঙ্গদা" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে নানা ছন্দ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ৩৯২টী শ্লোক আছে। আর একখানি খণ্ডকাব্য; নাম—"**হংসদূত**"। শ্লোক সংখ্যা ১৪২। ইহার টীকাকারের পরিচয় অজ্ঞাত। হংসকে দূত কল্পনা করিয়া মথুরাস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে বিরহার্ত্তা শ্রীরাধার সংবাদ শ্রবণ করানই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূতের" ন্যায় ইহাও একখানি অপূর্ব্ব রত্নবিশেষ। শ্রীরূপের আর একখানি দূতকাব্য—"**উদ্ধব-সন্দেশ বা উদ্ধবদূত**।"† শ্রীউদ্ধব মথুরা হইতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে, গোপীগণ তাঁহার দ্বারা যে সংবাদ প্রেরণ করেন, তাহাই ইহার বর্ণনীয়।

---

* এই কীর্ত্তন-গানোপযোগী শ্রীপাদ সনাতনের ভণিতাযুক্ত সংস্কৃত-পদাবলী "শ্রীগীতাবলী" মূল, টীকা, ও মধুর পদ্যানুবাদ সহ "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

†শ্রীউদ্ধব সন্দেশ বা উদ্ধব দূত—মূল, টীকা ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ 'শ্রীভক্তি-প্রভা' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

ইহাও একখানি অমৃত-সাগরের রত্ন। আবার শ্রীরূপ-কৃত "মথুরা-মাহাত্ম্য"—প্রাচীন পৌরাণিক বচনাবলী দ্বারা মথুরাধামের সংস্থাপন ও গৌরব-বর্ণিত। "শ্রীউপদেশামৃত"—একাদশ শ্লোকাত্মক বৈষ্ণবগণের প্রতি উপদেশ। "শ্রীরূপ-চিন্তামণি"- ইহাতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চরণ-চিহ্ন বর্ণিত। "শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকা।"—ইহা বৃহৎ ও লঘুভেদে ২ খানি। ১৪৭২ শকাব্দে ইহার রচনা শেষ হয়। ইহাতে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বংশাবলী, সখা, সখী, দাস, দাসী, বসনাভরণাদি বর্ণিত হওয়ায় রাগানুগা-ভজনমার্গের পক্ষে সবিশেষ অনুকূল। তদ্ভিন্ন "ব্যাখ্যান-চন্দ্রিকা," "প্রেমেন্দু-সাগর" ও "বৃন্দাদেব্যষ্টক" নামক গ্রন্থগুলিও শ্রীরূপ-কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরূপের গ্রন্থোপসংহারে একটী বক্তব্য আছে—

"লক্ষ গ্রন্থ কৈল ব্রজ-বিলাসবর্ণন।" চৈঃ চঃ মধ্য, ১।

"চারিলক্ষ সংগ্রহ গ্রন্থ দুঁহে বিস্তার করিলা।" ঐ অন্ত। ৪।

শ্রীপাদ রূপ ও সনাতনের গ্রন্থ রচনা ও বিস্তার বিষয়ে এই উক্তি অতীব গৌরব-দ্যোতক। মেদিনীকোষে গ্রন্থ শব্দের শ্লোকার্থ দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে শ্রীরূপের লক্ষশ্লোক এবং উভয়ের সংগৃহীত শ্লোক ৪ লক্ষ। ইহাই মীমাংসিত হয়। বস্তুতঃ ইহাও বড় সহজ কথা নহে।

শ্রীজীব গোস্বামী।—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যের মুকুটমণি, অদ্বিতীয় দার্শনিক পণ্ডিত। ইহাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি—"ভাগবত-সন্দর্ভ" বা ষট্ সন্দর্ভ। ইহা তত্ত্ব, ভাগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি এই ৬টী সন্দর্ভে বিভক্ত। ১৫০০ শকাব্দের কিছু পরে ইহার রচনা কাল। "গোপাল চম্পূঃ" সন্দর্ভের পরে লিখিত। শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট প্রাচীন-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্যাদির গ্রন্থ হইতে সারভাগ সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ প্রথম রচনা করেন। শ্রীজীব সেই গোপাল ভট্ট-বিলিখিত পুরাতন গ্রন্থ দেখিয়া ক্রমে-পরিপাটি সজ্জিত করিয়া বিস্তারিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি অশেষ দার্শনিক বিচার ও বহুদর্শিতাপূর্ণ। ৬টী সন্দর্ভের

মধ্যে তত্ত্ব, ভাগবৎ ও পরমাত্ম সন্দর্ভকে প্রমাণ ভাগে এবং কৃষ্ণ, ভক্তি ও প্রীতি সন্দর্ভকে প্রমেয়ভাগে ধরা যাইতে পারে। সন্দর্ভের সিদ্ধান্ত-প্রণালী সর্ব্বাংশে ভাগবতের অনুগত, এজন্য সন্দর্ভের শেষ তিনটী সন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় প্রাপ্তির উপায় ভক্তি এবং তাহার পরাবস্থা যে প্রীতি তাহার বিচার করিয়াছেন।

"**সর্ব্বসম্বাদিনী**।"—উক্ত ভাগবত-সন্দর্ভের বা ষট্ সন্দর্ভের শ্রীজীব-কৃত টীকা বা অনুব্যাখ্যা। ইহাতে প্রথম চারি সন্দর্ভের ব্যাখ্যা আছে। ফলতঃ ইহাকে একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীজীব-কৃত সুবৃহৎ—প্রায় ২২ হাজার শ্লোকাত্মক গদ্য-পদ্যময় কাব্য—"**গোপাল চম্পু**।" দুইভাগে বিভক্ত,—পূর্ব্বচম্পূ ও উত্তর চম্পূ। ষট্ সন্দর্ভান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভে যে সিদ্ধান্ত দার্শনিক আকারে মীমাংসিত, ইহাতে তাহাই কাব্যাকারে বর্ণিত। পূর্ব্বচম্পূ ১৫১০ শকে এবং উত্তর চম্পূ ১৫১৪ শকে বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ইহার সমস্ত সিদ্ধান্ত পৌরাণিক বাক্যে সমর্থিত। পূর্ব্বোক্ত 'পদ্যাবলীর' টীকাকার ৺বীরচন্দ্র গোস্বামী মহোদয় এই মহাগ্রন্থের "শব্দার্থ-বোধিকা" নামে টীকা রচনা করিয়াছেন।

"**সঙ্কল্প-কল্পদ্রুম**।"—ইহাও দার্শনিক কাব্য গ্রন্থ। চম্পুর ন্যায় ইহাতেও লীলা ও সিদ্ধান্ত দুই আছে। সমস্ত বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষেপে জানিবার অপূর্ব্ব গ্রন্থ। আর একখানি শ্রীজীব-কৃত মহাকাব্য "**মাধব-মহোৎসব**।" শ্রীরাধার অভিষেক ও দ্বারকা হইতে ব্রজে আসিয়া শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিবাহ উপলক্ষে যে উৎসব সম্পন্ন হয়, তাহাই এই কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। ইহা মহাকাব্য-লক্ষণের কোন অংশে ন্যূন নহে।

শ্রীজীবের অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তি—"**হরিনামামৃত-ব্যাকরণ**।" ইহাই সংস্কৃত ব্যাকরণের শেষ গ্রন্থ। সুতরাং ইহাতে অধিকাংশ প্রাচীন ব্যাকরণের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা লঘু ও বৃহৎভেদে দুইখানি। ব্যাকরণশাস্ত্র শুষ্ক শাস্ত্র। বৈষ্ণবগণের যাহাতে ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির অনুশীলন

হয়, এই উদ্দেশ্যে ব্যাকরণের সমস্ত সংজ্ঞা, উদাহরণ ও সূত্রগুলি শ্রীভগবন্নামাত্মক করিয়া সাহিত্য-জগতে এক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন,—ক-কার স্থানে ক-রাম, খ-রাম ইত্যাদি। ং—বিষ্ণুচক্র, ঃ—বিষ্ণুসর্গ। স্বরবর্ণ—সর্ব্বেশ্বর, ব্যঞ্জনবর্ণ—বিষ্ণুজন। ইত্যাদি। বৈষ্ণবের প্রিয় এমন সরল ব্যাকরণ আর নাই। দুঃখের বিষয়, ইহার পঠন-পাঠন অতীব বিরল। ইহা ভিন্ন "সূত্র-মালিকা" ও "ধাতু-সংগ্রহ" গ্রন্থও ব্যাকরণাংশ বলিয়াই উল্লেখ যোগ্য।

যোগসার-স্তবের টীকা, অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীর টীকা, শ্রীরাধাপদচিহ্নের টীকা, ভাবার্থ-সূচকচম্পূ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ক্রম সন্দর্ভ টীকাও শ্রীপাদ জীব গোস্বামি-প্রণীত।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী।—দাক্ষিণাত্যে—শ্রীরঙ্গনাথক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ভট্টমারী (কোন মতে বেলগুড়ি গ্রামে) গ্রামে ১৪২৫ শকে (খৃঃ ১৫০৩) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—শ্রীবেঙ্কট ভট্ট। তীর্থ-ভ্রমণ কালে শ্রীমহাপ্রভু এই বেঙ্কট ভট্টের আলয়ে সমগ্র বর্ষাকাল অবস্থান করিয়া শ্রীগোপাল ভট্টকে কৃপা করেন। যথাসময়ে ভট্টগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীপাদ রূপ ও সনাতনের সহিত সম্মিলিত হন। ইনি খুল্লতাত শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। নীলাচল হইতে শ্রীমহাপ্রভু নিজ ডোর কৌপীন ও বসিবার আসন পাঠাইয়া শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীতে শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। শ্রীভট্ট গোস্বামি-পূজিত শ্রীদামোদর শিলা হইতে যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি প্রকটিত হয়েন, উহাই বর্ত্তমান শ্রীশ্রীরাধারমণ বিগ্রহ। "শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস," "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের" "শ্রীকৃষ্ণবল্লভা" টীকা ইহাঁরই রচিত। শ্রীনিবাসাচার্য্য ইহাঁরই নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৫০৭ শকে শ্রাবণী শুক্লা পঞ্চমীতে, প্রিয় শিষ্য দেববন-নিবাসী শ্রীগোপীনাথ গোস্বামীর উপর শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হন। গোপীনাথের অপ্রকটের পর তদীয় ভ্রাতা শ্রীদামোদর গোস্বামী সেবাভার প্রাপ্ত হন। ইহাঁরই বংশধর বর্ত্তমান সেবাইত প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্ মধুসূদন গোস্বামী—সার্ব্বভৌম বৈষ্ণব জগতের উজ্জ্বল রত্ন।

শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী।—ইনি ছয় গোস্বামীর অন্যতম। পিতার নাম—শ্রীতপন মিশ্র। কাশীতে তপন মিশ্রের গৃহে শ্রীমহাপ্রভুর অবস্থান কালে কৃপালাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে শ্রীবৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি প্রত্যহ ১ লক্ষ হরিনাম ও এক সহস্র বৈষ্ণবকে প্রণাম করিতেন। ১৪৮৫ শকে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে ৫৮ বৎসর বয়সে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। ইহাঁর রচিত কোন গ্রন্থাদির বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী।—ইনি কঠোর বৈরাগ্য-সম্পন্ন প্রাচীন সাধক। জেলা হুগলী—ত্রিশবিঘা রেল্ ষ্টেশনের নিকট সরস্বতী নদী-তীরে কৃষ্ণপুর গ্রামে ১৪১৯ শকে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তগ্রামের ১২ লক্ষ মুদ্রার আয়ের জমিদারীর অধীশ্বর কায়স্থ-বংশীয় শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদারের পুত্র। বাল্যকালেই ইহাঁর হৃদয়ে বৈরাগ্যাঙ্কুর জন্মে, তদ্দর্শনে ইহাঁর পিতা এক পরম রূপবতী কন্যার সহিত বিবাহ দেন। রঘুনাথ অতুল ঐশ্বর্য্য ও রূপবতী ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া ১৯ বৎসর বয়সে নীলাচলে শ্রীমহাপ্রভুর চরণমূলে উপস্থিত হন। তথায় ১৬ বৎসর শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর সহিত প্রভুর পরিচর্য্যা করিয়া, মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর ৪১ বৎসর শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধাকুণ্ড তীরে অবস্থান করেন। ১৫০৮ শকাব্দে আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীবৃন্দাবনে অপ্রকট হন। শ্রীরাধাকুণ্ডের ঈশান কোণে ইহাঁর সমাধি বিরাজিত।

রঘুনাথ বাল্যে শ্রীমদনমোহন-বিগ্রহের সেবা করিতেন। মুসলমান অত্যাচারে এই বিগ্রহ নদীতে নিক্ষিপ্ত হইবার সংবাদ শুনিয়া শ্রীমদ্দাস গোস্বামী বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণকিশোর নামক জনৈক শিষ্যকে প্রেরণ করেন। তিনি ঐ বিগ্রহের উদ্ধার ও সেবা প্রকাশ করেন। শ্রীমৎ দাস গোস্বামী বৈরাগ্যের আদর্শমূর্ত্তি। তাই, শ্রীমহাপ্রভু বলিয়াছেন—"রঘুনাথের বৈরাগ্য হয় পাষাণের রেখা।" সত্যই, বৈষ্ণব রাজ্যে ইহার ন্যায় কঠোরব্রতী দেখা যায় না। শ্রীমহাপ্রভু ইহাঁকে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা ও গুঞ্জামালা প্রদান করিয়া পূজা করিতে আজ্ঞা করেন।

অধুনা কোন কোন বর্ণাশ্রম-রক্ষাভিলাষী স্মার্ত্তম্মন্য পণ্ডিত এই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণবের শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার নাই বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে ব্যক্তব্য এই যে, শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীল রঘুনাথকে কেন যে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা পূজা করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার যখন কোন স্পষ্ট নির্দ্দেশ নাই, তখন অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভব বৈষ্ণব শ্রীশালগ্রামার্চ্চন করিতে পারিবে না, এইরূপ যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত, তাহা হইলে শ্রীপাদ সনাতনের দ্বারা বৈষ্ণব-স্মৃতি হরিভক্তিবিলাসে ভগবৎপর-স্ত্রী-শূদ্রাদিও শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকারী, এরূপ ব্যবস্থা লেখাইতেন না। অথবা "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহমিত্যাদি" স্মৃতির বাক্যকে অবৈষ্ণবপর বলিয়া খণ্ডন করিতেন না। কেহ কেহ টীকার লিখিত—"যতো বিধিনিষেধা ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তী" "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণামিত্যাদি-বচনৈঃ।" ইত্যাদি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উহা ত্যাগী বৈষ্ণব সম্বন্ধে; কিন্তু তাহা সর্ব্বতোভাবে অসঙ্গত। যেহেতু অবৈষ্ণব-ত্যাগীও দৈব ও পৈত্র কর্ম্মাদিকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বৈষ্ণবের বিশেষত্ব রহিল কি? ত্যাগী কাহাকে বলে? "সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ গীতা। বৈষ্ণব সর্ব্বদা কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিত বলিয়া সকল অবস্থাতেই ত্যাগী।" সুতরাং তাঁহার অধিকার থাকিবে না কেন? আরও বৈষ্ণব-স্মৃতিকার বলেন—

"অতো নিষেধকং যদ্ যদ্বচনং শ্রূয়তে স্ফুটং।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এই যে স্বয়ং কারিকা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে, ইহা সমর্থনের জন্যই টীকাকার "দেবর্ষিভূতাপ্তাদি" শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এস্থলে বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্য বিধি প্রমাণিত করিয়াছেন।

অথবা এমনও হইতে পারে, শ্রীগণ্ডকীশিলার ন্যায় শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাও যে বৈষ্ণবগণের পরমার্চ্চনীয় বস্তু, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্তই স্বীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল রঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন শিলা পূজা করিতে আজ্ঞা করেন। শ্রীশালগ্রামশিলা বৈষ্ণব মাত্রেই তো পূজা করিবেন; বিশেষ শ্রীশালগ্রাম পূজা যখন বৈধী ভক্তির অন্তর্গত। সুতরাং রাগানুগ ভক্তের উজ্জ্বল-আদর্শ শ্রীল রঘুনাথের দ্বারা যদি শ্রীগোবর্দ্ধন শিলার্চ্চন প্রকাশ হয়, তাহাহইলে বৈধ ও রাগানুগ উভয় শ্রেণীর ভক্তগণ দ্বারাই শ্রীশালগ্রামের ন্যায় শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চনও অনুষ্ঠিত হইবে। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চন করিতে দিয়াছিলেন।

অথবা যে শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলা ও গুঞ্জামালা শ্রীমন্মহাপ্রভু তিন বৎসর ধারণ করিলেন; শুধু, ধারণ করা নয়, যাঁহাকে কৃষ্ণ-কলেবর বলিয়া—

"——কভু হৃদয়ে নেত্রে ধরে।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয় কভু শিরে করে॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর।
শিলাকে কহেন প্রভু কৃষ্ণ-কলেবর॥" চৈঃ চঃ।

তখন সেই শিলা যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ, তাহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু, ৩ বৎসর কাল শ্রীঅঙ্গে ধারণ করায় তাঁহাতে বহু শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে। এমন অপূর্ব্ব বস্তু শ্রীরঘুনাথের ন্যায় অন্তরঙ্গ ভক্ত ভিন্ন অন্য কেহই পাইবার যোগ্য-পাত্র নহেন, সুতরাং রঘুনাথকে এই প্রসাদী শিলামালা অর্পণ, ইহা পূর্ণ অনুগ্রহের পরিচায়ক। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথকে শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে অনধিকারী বলিয়া যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা প্রদান করিয়াছেন, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত মাত্র। তাহা হইলে শ্রীরঘুনাথ অবশ্যই একথা উল্লেখ করিতেন। শ্রীমহাপ্রভুর অভিপ্রায় কি, তিনি কি উদ্দেশ্যে রঘুনাথকে শিলামালা দিয়াছিলেন এবং রঘুনাথইবা সেই শিলা-মালা প্রাপ্ত হইয়া কি ভাবিয়াছিলেন; তাহা তো স্পষ্টই উল্লিখিত আছে—

"রঘুনাথ সেই শিলামালা যবে পাইল।
গোসাঞির অভিপ্রায় তাই ভাবনা করিল॥

শিলা দিয়া গোসাঞি মোরে সমর্পিলা গোবর্দ্ধনে।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা রাধিকা চরণে॥"

শ্রীচৈঃ চঃ অন্ত্য।

চারি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-স্মৃতিমতেই শ্রীশালগ্রামশিলায় নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা, বৈষ্ণবগণের একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণব স্মৃতি শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকায় উক্ত হইয়াছে—"মনুয্যেষু সর্ব্বেষামধিকারোঽস্তি দেহিনাং।" ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রণবযুক্ত রামমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীশালগ্রাম শিলায় নরনারী সকলেই শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করিতে অধিকারী হইবেন। আবার নিম্বাদিত্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-স্মৃতি "বৈষ্ণবধর্ম্ম-সুরদ্রুম-মঞ্জরী"তে শ্রীশালগ্রাম-বর্ণন প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। "সর্ব্বার্চ্চাসু শালগ্রামশিলায়া আবশ্যকত্বং। তথোক্তং পাদ্মে "শালগ্রামশিলা-পূজা বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চনেত্যাদি'।" অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলাতেই সর্ব্বপূজাবিধান কর্ত্তব্য। এমন কি শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি ভোজন করে, তাহাকে কল্পকোটীকাল শ্বপচবিষ্ঠার কৃমি হইতে হয়।

অতএব বৈষ্ণব-স্মৃতির মতে গৃহী বা ত্যাগী বৈষ্ণবভেদে শিলার্চ্চনায় অধিকারী-অনধিকারী ভেদ কথিত হয় নাই। যখন শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ব্যতিরেকে সাধারণ বৈষ্ণব পদবাচ্য হয় না, তখন গৃহী-ত্যাগী ভেদ থাকিবে কিরূপে? বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ "গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষা চ বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ॥" এস্থলে নরশব্দ, সাধারণ মনুষ্যমাত্রকেই বুঝাইতেছে। বিষ্ণুপূজা শব্দে শ্রীশালগ্রাম পূজা রূঢ়ি মুখ্যার্থ—পঙ্কজ শব্দবৎ। পঙ্কজ বলিলে যেমন পঙ্কজাত অন্য কিছু না বুঝাইয়া কেবল পদ্মকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ বিষ্ণুপূজা বলিলে শ্রীশালগ্রামপূজাকেই বুঝাইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণও লক্ষিত হয়। যথা—"দেবভূত্বা দেবং যজেৎ। অবিষ্ণুর্নার্চ্চয়েদ্বিষ্ণুমিত্যাদি।" অর্থাৎ দেবত্বাতে তদাত্মা প্রাপ্ত না হইলে অর্থাৎ বৈষ্ণব না হইলে বিষ্ণুপূজা করিবে না। ইহাতে জাতিভেদ বা আশ্রম ভেদের কোনকথা উল্লিখিত হইল না তো? স্মৃতিকর্ত্তা স্বয়ং রঘুনন্দন যে পার্থক্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন,

আধুনিক বৈষ্ণবদ্বেষী স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ সে পার্থক্য উঠাইয়া দিতে চাহেন কি ? শ্রীমদ্ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য বার-ব্রত-আচার সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারে বৈষ্ণবাবৈষ্ণব মতভেদে পৃথক্ ব্যবস্থা লিখিয়াছেন।—একাদশী তত্ত্বে—“অরুণোদয়-বেলায়াং দশমী দৃশ্যতে যদা। তদ্দিনে তৎপরিত্যাজ্য বৈষ্ণবৈকাদশী ভবেৎ॥” অর্থাৎ অরুণোদয়কালে দশমী দৃষ্ট হইলে বৈষ্ণবগণ সেই দিনে একাদশী ত্যাগ করিয়া পরদিন শুদ্ধা দ্বাদশীতে উপবাস করিবেন।

আবার বৈষ্ণবের প্রতি অন্য-দেব-নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিষ্ণু-নৈবেদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন; যথা—

“পাবনং বিষ্ণুনৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতঃ।
অন্য দেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥”
যো যো দেবার্চ্চনরতঃ স তন্নৈবেদ্যভক্ষকঃ।
কেবলং সৌর শৈবো তু বৈষ্ণবো নৈব ভক্ষয়েৎ॥”

যদিও স্মার্ত্ত-পণ্ডিত স্ত্রী-শূদ্রের প্রতি শিব-বিষ্ণু-স্পর্শনে অনধিকার লিখিয়াছেন—

“স্ত্রীণামনুপনীতানাং শূদ্রানাঞ্চ জনেশ্বর।
স্পর্শনে নাধিকারোঽস্তি বিষ্ণৌ বা শঙ্করোঽপি বা॥”

তথাপি স্বয়ম্ভু অনাদি লিঙ্গে স্ত্রীশূদ্রাদি সাধারণের স্পর্শাধিকার লিখিয়াছেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বেশ্বরের ও একাম্রকাননে শ্রীভুবনেশ্বরের সর্ব্বসাধারণের স্পর্শাধিকার সম্বন্ধে শিষ্টাচার আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন সম্বন্ধেও অনাদিলিঙ্গ স্বয়ম্ভূবৎ বৈষ্ণবের পক্ষে অধিকার শাস্ত্র ও সদাচার-সম্মত। স্মৃতি স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—

“কামসক্তোঽপি লুব্ধোঽপি শালগ্রামশিলার্চ্চনং।
ভক্ত্যা বা যদি বাভক্ত্যা কৃত্বা মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ॥”

সর্ব্বদেব-পূজনং শালগ্রামে কর্ত্তব্যং। “দেবপূজায়াং সর্ব্বেষামধিকারঃ।” পুনশ্চ শ্রীমৎ রঘুনন্দন স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয় আহ্নিকতত্ত্বে ভগবদ্ভক্তের প্রতি যে ৩২ প্রকার সেবাপরাধ আছে, তাহা ভগবদ্ভক্তের প্রতিই উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"তে চাপরাধা বরাহপুরাণান্নিষ্কৃষ্য লিখ্যতে। ভগবদ্ভক্তানাং অনিষিদ্ধদিনে দন্তধাবনমকৃত্বা বিষ্ণোরুপসর্পণং, মৃতং নরং স্পৃষ্ট্বাস্নাত্বা বিষ্ণুকর্ম্মকরণ মিত্যাদি।"

এস্থলে "ভগবদ্ভক্তগণের" বলায় কোন হরিভক্তের প্রতি নিষেধ সূচিত হইল না। যদি কোন স্মার্ত্তপণ্ডিত আপত্তি করেন যে, এস্থলে যদিও জাতিভেদ উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু স্থানান্তরে আছে"—তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি, ভগবদ্ভক্তের মহিমাও তো স্থানান্তরে বর্ণিত আছে। "আহ্নিকে" শ্রীবিষ্ণু-পূজাপ্রকরণ ধৃত বরাহপুরাণ বচন। যথা—

"সংস্মৃতঃ কীর্ত্তিতো বাপি দৃষ্টঃ সংস্পৃষ্টোঽপি প্রিয়ে।
পুনাতি ভগবদ্ভক্ত শ্চাণ্ডালোঽপি যদৃচ্ছয়া॥
এতজ্জ্ঞাত্বা তু বিধবিঃ পূজনীয়ো জনার্দ্দনঃ।
বেদোক্ত-বিধিনা ভদ্রে আগমোক্তেন বা সুধীঃ॥"

তথাহি নারসিংহে—

"অষ্টাক্ষরেণ দেবেশং নরসিংহ মনাময়ং।
গন্ধ পুষ্পাদিভিনিত্যামর্চ্চয়েদর্চ্চিতং নরঃ॥
তথা গন্ধপুষ্পাদি সকামেব নৈব নিবেদয়েৎ।
অনেন ওঁ নমঃ নারায়ণায়েত্যনেন। ইত্যাদি।"

উল্লিখিত প্রমাণে 'ভগবদ্ভক্ত, চণ্ডাল ও নর' শব্দ সাধারণভাবে উক্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্ত আচণ্ডাল পর্য্যন্ত "ওঁ নমঃ নারায়ণায়" মন্ত্রে শ্রীশালগ্রাম বিষ্ণু পূজা করিবেন। হায়! যে স্মৃতি-নিবন্ধকারের শাসনের দোহাই দিয়া স্মার্ত্তগণ বৈষ্ণবগণকে নির্য্যাতিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, সেই উদার স্বপক্ষ স্মৃতিকর্ত্তা বৈষ্ণবের সম্বন্ধে কি সমীচীন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলেন কি? এই সকল সুপ্রসিদ্ধ সুস্পষ্ট প্রমাণ সত্ত্বেও যাহারা তাহা স্বীকার না করে, তাহারা নিতান্ত অসুর-স্বভাব—চিরকাল বৈষ্ণব-বৈরী বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে ব্যাধেরও শ্রীশিলার্চ্চন-প্রসঙ্গ বর্ণিত আছে। ফলতঃ অধিকার বিষয়ে ভাগবতধর্ম্মে শুদ্ধ সদাচারী বৈষ্ণব-মাত্রেই যে অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর কঠোর সাধনার ফল "স্তবাবলী।" ইহাতে ২৯টী বিভিন্ন ভাবের স্তব আছে। তন্মধ্যে মনঃশিক্ষা, চৈতন্যাষ্টক, গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরু, বিলাপকুসুমাঞ্জলি (১) ও প্রেমাম্ভোজমরন্দ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ। স্তবাবলীর টীকাকার—বঙ্কুবিহারী বিদ্যালঙ্কার। শ্রীদাস গোস্বামীর আর একখানি গদ্যকাব্যের নাম—"মুক্তাচরিত্র।" ইহাকে সংস্কৃত 'কথা-সাহিত্য'ও বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোত্রী শ্রীসত্যভামা দেবী। ইহাতে শ্রীবৃন্দাবনের মুক্তারোপণলীলা বর্ণিত আছে।

শ্রীরামানন্দ রায়।—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগরবাসী রাজা ভবানন্দরায়ের পুত্র। ইনি পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রের মহামন্ত্রী হইয়া শ্রীক্ষেত্রেও বাস করিতেন। ভবানন্দরায়ের পঞ্চপুত্র। রামানন্দ, গোপীনাথ, কলানিধি ও বাণীনাথ। সকলেই মহারাজ প্রতাপরুদ্রের অধীনে উচ্চরাজকর্ম্মচারী ছিলেন, তন্মধ্যে রামানন্দই বিদ্যানগরের রাজপ্রতিনিধি। ইনি শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরাঘবেন্দ্রপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরামরায় মহাপ্রভুর সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের অগ্রণী। শ্রীমহাপ্রভু এই শক্তিশালী ভক্তের শ্রীমুখ দিয়া রস-সিদ্ধান্তের যাবতীয় উপদেশ জীবের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে তাহা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে। ইনি প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছামত "শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ" নাটক* রচনা করেন। শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে দেবদাসীগণ দ্বারা এই নাটক অভিনীত হইত। দেবদাসীগণ দ্বারা শ্রীরাধা ললিতাদি স্ত্রীপাঠ্য অংশ অভিনয়কালে রামানন্দ সেই অভিনেত্রীদিগকে সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেয়সী রূপে

---

(১) বিলাপকুসুমাঞ্জলি।— মূল, টীকা ও পদ্যানুবাদ সহ "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে ২য়, সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

*এই জগন্নাথবল্লভ নাটকের অতি সুললিত মর্ম্মানুবাদ শ্রীযদুনন্দন দাসের পদাবলী সহ "শ্রীরাধাবল্লভ-লীলামৃত" নামে "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চিন্তা করিতেন এবং অতি নির্ব্বিকার ও ভক্তিভাবে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা সম্পাদন করিতেন। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর বৎসর ১৪৫৬ শকে ফাল্গুনী কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে ইঁহার অন্তর্ধান হয়।

শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী।—নদীয়াবাসী পুরুষোত্তম পণ্ডিতের শেষ নাম শ্রীস্বরূপ-দামোদর। ইনি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ভক্ত। দশনামী সন্ন্যাসিগণের গিরি, পুরী, ভারতী, বন, অরণ্যাদি ১০ প্রকার উপাধি আছে। যাঁহারা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও উল্লিখিত কোন উপাধি গ্রহণ না করেন, তাঁহাদিগকে "স্বরূপ" বলা হইয়া থাকে। স্বরূপ-দামোদরের এই "স্বরূপ" উক্ত ভাবেরই দ্যোতক। ইঁহার এক "**কড়চা**" ভিন্ন, আর কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। সে কড়চাও আবার দুর্লভ। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থারম্ভে "রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি" হইতে ৯টী শ্লোক শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর কড়চা হইতে অবিকল উদ্ধৃত। ফলতঃ প্রথম তত্ত্ব-বিচার ঐ কড়চা হইতেই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর মুহূর্ত্তেই গৌরগত-প্রাণ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী অচেতন হইলেন। আর তাঁহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইল না। ১৪৫৫ শকে আষাঢ়ী শুক্লাদশমীতে অপ্রকট হইলেন। ভক্তগণের প্রতি দৈববাণী হইল শ্রীমহাপ্রভুর আর দর্শন পাওয়া যাইবে না।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম।—ভুবন-বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। আদিশূর-সমানীত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম শ্রীহর্ষবংশীয় গঙ্গানন্দ বা মহেশ্বর বিশারদের পুত্র। নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্যানগরে ইঁহার বাস। পক্ষতা, ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি, শ্রীমহাপ্রভু, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য ও তন্ত্রসার-প্রণেতা কৃষ্ণানন্দ এই সার্ব্বভৌমেরই ছাত্র। শ্রীবাসুদেব, মহাপ্রভু অপেক্ষা ৩০।৪০ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ। শেষ জীবনে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের আশ্রয়ে নীলাচলে টোলস্থাপন করিয়া বেদান্ত প্রচার করেন। মহাপ্রভুকে বেদান্ত মতে শিক্ষা দিতে গিয়া নিজেই প্রভুর অলৌকিক প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা ও কৃষ্ণপ্রেম

বৈভবের পরিচয় পাইয়া চিরদিনের মত তাঁহার চরণে সবংশে আত্মবিক্রয় করেন। প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন, ষড়ভুজ মূর্ত্তি দেখাইলেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া যে স্তব করিলেন, উহাই "চৈতন্যশতক"। ইহা প্রামাণিক ও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। বাঙ্গলার প্রাচীন কবি কৃত্তিবাস বাসুদেবের ঊর্দ্ধতন ৫ম, পুরুষ।

শ্রীকবিকর্ণপুর গোস্বামী।—ইহাঁর পূর্ব্বনাম পরমানন্দ সেন। শ্রীমহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীশিবানন্দ সেনের পুত্র। ১৪৩৬ শকে (খৃঃ ১৫১৪) ইহাঁর জন্ম। সপ্তম বর্ষ বয়সে পিতার সহিত নীলাচলে গমন করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীপদাঙ্গুষ্ঠ জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দৈবী বিদ্যা লাভ করেন। এই কৃপালাভের পর সংস্কৃতে কৃষ্ণগুণ-বর্ণনময় শ্লোক রচনা করিয়া শুনাইলে প্রভু পরমানন্দে উহাঁকে "পুরিদাস" এবং প্রথমোচ্চারিত শ্লোকে ব্রজগোপীদের কর্ণ-ভূষণের বর্ণনা থাকায় "কবি-কর্ণপুর" নাম প্রদান করেন। শ্রীনাথ ইহাঁর গুরু-দেবের নাম। "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতম্', সংস্কৃত মহাকাব্য ইহাঁরই রচিত। প্রভুর বাল্য-লীলা হইতে শেষ লীলা পর্য্যন্ত ইহার বর্ণনীয়। "গৌরগণোদ্দেশের" প্রথম পদ্যই, ইহার প্রথম পদ্য। বৈষ্ণব-সাহিত্য-জগতে মহাকাব্য এই দ্বিতীয়। ইহাতে বিবিধ রস, ভাব, অলঙ্কার ও ছন্দের প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। 'শিশুপাল বধ' ও 'কিরাতার্জ্জুনীয়ের' মত ইহাতেও শব্দালঙ্কার ও চিত্রকাব্য প্রদর্শিত হইয়াছে। মুরারিগুপ্ত কৃত 'চৈতন্যচরিত' কাব্য এই মহাকাব্যের আদর্শ। মহাপ্রভুর অপ্রকটের ৯ বৎসর পরে ১৪৬৪ শকে আষাঢ় সোমবার কৃষ্ণ-দ্বিতীয়া তিথি মধ্যে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হয়।

এই মহাকাব্য ব্যতীত কর্ণপুরের রচিত একখানি উৎকৃষ্ট দশাঙ্ক নাটক আছে নাম "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়"। মহাপ্রভুর সুমধুর লীলা-চরিত্র সংস্কৃত নাটকীয় ভাষায় বর্ণিত। ইহার সার্ব্বভৌমানুগ্রহ নামক ৬ষ্ঠ অঙ্কের বিচারপ্রসঙ্গে সমস্ত মাধবদর্শনের মত প্রদর্শিত হইয়াছে। অথচ দার্শনিক গ্রন্থের ন্যায় নীরস নহে। 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের মত ইহাতেও প্রেম, মৈত্রী, বিরাগ, ভক্তি প্রভৃতি

আধ্যাত্মিক ভাবকেও নটনটীরূপে ব্যক্তিত্বে কল্পিত (Personified) করা হইয়াছে। নাটকখানি সর্ব্বাংশে ভক্তিরস-প্রধান। ইহার সমাপ্তি শক ১৪৯৪। কুলনগর নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম সিদ্ধান্তবাগীশ (শেষ নাম—প্রেমদাস) ১৬৩৪ শকে এই নাটকের বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করেন। অনুবাদে তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাঁর কৃত আর একখানি গদ্যপদ্যময় বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ আছে—নাম "আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূঃ (১)। ইহাতে ভাগবতের ১০ম, স্কন্ধ-বর্ণিত কৃষ্ণলীলা মধ্যে কেবল ব্রজলীলার বিস্তার করা হইয়াছে। ইহাতে "গোপাল চম্পূর" ন্যায় অনুপ্রাসের বাহুল্য আছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ইহার "সুখবর্ত্তনী" নাম্নী টীকাকার। ২৪ স্তবকে বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ। গ্রন্থকর্ত্তা "দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যরূপো হরিঃ" এই বাক্যে শ্রীমহাপ্রভুকে কুলদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সুমধুর লীলাচিত্রণ-চাতুর্য্যে, ভাব-প্রকটন-মাধুর্য্যে ও সুললিত শব্দ-সম্ভার সংযোজন-নৈপুণ্যে গ্রন্থখানি ভক্তমাত্রেরই হৃদয়স্পর্শী ও উপাদেয় রূপে আস্বাদ্য। ভাগবত-ব্যাখ্যাতৃগণ গোপাল চম্পূ ও আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূঃ লইয়াই ব্যাখ্যা-মাধুর্য্য-প্রকটন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে অলঙ্কার গ্রন্থেরও অভাব নাই। সে বিষয়ে কর্ণপূরের "অলঙ্কার-কৌস্তুভ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।—বোম্বে মুদ্রিত "অলঙ্কার-কৌস্তুভ" নামে একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ আছে, তাহা বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত-কৃত। তাহার সহিত কর্ণপূরের গ্রন্থের তুলনাই হয় না। ইহা সাহিত্য-জগতের উজ্জ্বল রত্ন। ইহাতে অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত বাক্য, কাব্য, অভিধা, ব্যঞ্জনাদি শব্দশক্তি, ধ্বনি, রস, নাট্যাঙ্গ, দোষ, গুণ, রীতি অলঙ্কার, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে প্রকটিত। বিশেষতঃ এখানি শেষ অলঙ্কার গ্রন্থ বলিয়া অলঙ্কারোক্ত কোন বিষয়েরই অভাব নাই। ১৪৯৮ শকের কিছু পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচনার কাল অনুমিত হয়।

---

(১) আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পূঃ।—মূল, টীকা ও বিশদ বঙ্গানুবাদ সহ "শ্রীভক্তি-প্রভা" পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছেন। পৃথক্ খণ্ডাকারেও পাওয়া যায়।

এই মহাকবিকৃত আর একখানি গ্রন্থ "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা"। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের ভক্তগণের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে কে কোন্ রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই বর্ণিত আছে। উপাসনা-তত্ত্বে ইহা বৈষ্ণবগণের বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থখানি ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। কর্ণপুরের প্রণীত আর একখানি "বৃহদ্ গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা" গ্রন্থ আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ১৪৯৮ শকেই কর্ণপুরের তিরোভাব ঘটে।

শ্রীঈশান নাগর।—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর পালিত পুত্র ও শিষ্য, এবং শ্রীমহাপ্রভুর ভৃত্য। ১৪১৪ শকে জন্ম। মহাপ্রভু ঈশানকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পাদধৌত করিতে বাধা প্রদান করিলে ঈশান তৎক্ষণাৎ উপবীত ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেন। ১৪৮৪ শকে শেষ জীবনে ৭০ বৎসর বয়সে সীতাদেবীর আদেশে পদ্মাতীরস্থ তেওতা গ্রামে বিবাহ করেন। ইহাঁর তিন পুত্র।— পুরুষোত্তম নাগর, হরিবল্লভ নাগর ও কৃষ্ণবল্লভ নাগর। তেওতার রাজ-পরিবার এই বংশের শিষ্য। ১৪৯০ শকে ঈশান "অদ্বৈত-প্রকাশ" গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। তদ্ভিন্ন শ্যামদাস (রাজা দিব্যসিংহ) প্রণীত "অদ্বৈত-বালালীলা সূত্র" এই কয় খানি বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত ঐতিহাসিক কাব্য গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

শ্রীদৈবকীনন্দন দাস।—ব্রাহ্মণ-কুমার দৈবকীনন্দনের বাস হালিসহরে। ইনি সদাশিব কবিরাজের পুত্র শ্রীপুরুষোত্তম দাসের মন্ত্র-শিষ্য। নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদ্বেষী চাপাল গোপালই এই দৈবকীনন্দন দাস। বৈষ্ণব-দ্বেষের কারণ ইহাঁর কুষ্ঠব্যাধি হয়। শেষে মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হইলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীবাসের চরণোদক পান করিতে ও বৈষ্ণব-বন্দনা-রচনা করিতে আদেশ করেন। কথিত আছে, "বৈষ্ণব-বন্দনা" ও "বৈষ্ণব-অভিধান" রচনা করিয়া উক্ত মহাব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করেন। ইহা বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীমহা প্রভুর প্রায় তাবৎ ভক্তের নাম, স্থল-বিশেষে ধাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবন দাস।—শ্রীবাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর নলিন পণ্ডিতের কন্যা শ্রীনারায়ণী দেবীর গর্ভে ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে ১৮ মাস গর্ভে থাকিয়া জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান হালিসহরের নিকট কুমারহট্টে। নারায়ণীকে বিধবা না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু "পুত্রবতী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ব্যাসপূজার সময় মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ ভোজন করিয়া নারায়ণীর গর্ভসঞ্চার হয়। ইহা সাধারণের চক্ষে বা বিচার-দৃষ্টিতে নিতান্ত অস্বাভাবিক বোধ হইলেও ভগবানের লীলায় তাঁহার ইচ্ছাশক্তিতে সকলই সম্ভব হইতে পারে। লোকনিন্দা ভয়ে নারায়ণী শিশুপুত্র লইয়া নবদ্বীপে—মামগাছি গ্রামে শ্রীবাসুদেব দত্তের ঠাকুর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে এই ঠাকুর বাটী "নারায়ণীর পাট" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ বৃন্দাবন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য। ইনি পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে বর্দ্ধমান জেলা—দেনুড় গ্রামে শ্রীপাট স্থাপন করিয়া বাস করেন। বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব বলিয়া মহিমা ঘোষণা করেন। কৃত্তিবাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের পর এবং কাশীরাম দাসের পূর্ব্বে ইনি বাঙ্গলাতে "শ্রীচৈতন্য-ভাগবত" রচনা করিয়া বাঙ্গলা-সাহিত্য-জগতে অমর হইয়াছেন। বাস্তবিকই বৈষ্ণব কবিরাই বাঙ্গলা সাহিত্যের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং বৈষ্ণব-সাহিত্যই বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিত্তি ও প্রাণ। ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কেবল মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরী, মনসার গান, ও গীতা মাহাত্ম্য ইহার পূর্ব্বে রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবনের "চৈতন্য ভাগবত" প্রথমে "চৈতন্য-মঙ্গল" নামে খ্যাত ছিল। পরে শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য কোগ্রাম-নিবাসী শ্রীলোচন দাস ঠাকুর "চৈতন্য মঙ্গল" রচনা করিলে বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম "চৈতন্য-ভাগবত" রাখেন। ১৪৯৭ শকে এই গ্রন্থের সমাপ্তি। এই গ্রন্থের অনেক কথা লোকপরম্পরা শুনিয়া লিখিত। "বেদগুহ্য চৈতন্য-চরিত কেবা জানে। তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্তস্থানে॥" ইহাতে সিদ্ধান্তাংশের ছায়ামাত্র আছে, লীলাংশই প্রধান। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচরিতামৃতের ইহাই আদর্শ। আদি, মধ্য ও অন্ত্য ভেদে প্রভুর তিন

লীলা ইহাতে বর্ণিত। ইহা ভিন্ন "তত্ত্ববিলাস," গোপিকামোহন কাব্য, নিত্যানন্দ বংশমালা, ও বৈষ্ণববন্দনা (অন্য) এই চারিখানি পুস্তক ঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত বলিয়াও প্রখ্যাত আছে। ১৫১১ শকে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বৃন্দাবন ঠাকুরের তিরোভাব হয়।

"শ্রীঠাকুর লোচনানন্দ।"—বর্দ্ধমান—মঙ্গলকোটের নিকট কুন্নুর নদীর তীরে কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকর সেন, মাতার নাম সদানন্দী। ১৪৫৯ শকে (কোন মতে ১৪৪৫ শকে) লোচন দাসের জন্ম। শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে "শ্রীচৈতন্যমঙ্গল" গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থও আদি, মধ্য, অন্ত তিন খণ্ডে সমাপ্ত। অতি সরল পাঞ্চালী রীতিতে রচিত বলিয়া ইহা পাঁচালী বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি এই "চৈতন্য-মঙ্গল" গীত হইয়া থাকে। লোচনের "ধামালী" বলিয়া কতকগুলি সরল রহস্যব্যঞ্জক গীতি-কবিতা আছে। তদ্ভিন্ন রায় রামানন্দকৃত "জগন্নাথবল্লভ-নাটকের" সংস্কৃত পদাবলী ভাঙ্গিয়া যে বাঙ্গালা পদাবলী রচনা করিয়াছেন, তাহাতে লোচন দাসের পাণ্ডিত্য-প্রকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "চৈতন্য-প্রেমবিলাস" দুর্লভসার (ইহাতে চৈত লীলা ও রসতত্ত্ব বর্ণিত আছে) দেহতত্ত্ব-নিরূপণ, প্রার্থনা, আনন্দলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থও লোচনদাস কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিবিধ পদগ্রন্থে লোচনকৃত অনেক পদাবলীও আছে। ১৫১১ শকে লোচনদাস অপ্রকট হন।

"শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী"।—জেলা বর্দ্ধমান, কাটোয়ার ৩ মাইল উত্তর ঝামটপুর গ্রামে ১৪১৮ শকে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীভগীরথ কবিরাজ—মাতা সুনন্দা। শ্রীপাট ঝামটপুরে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি, কবিরাজ গোস্বামীর পাদুকা ও ভজন স্থান আছে। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর দীক্ষা-শিষ্য। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে জীবনাতিবাহিত করেন। "শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত" ইহাঁর কৃত সংস্কৃত মহাকাব্য। জরাতুর কৃষ্ণদাস ১৫০৩

শকে "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" শেষ করিয়া ১৫০৪ শকে লোকান্তর গমন করেন ; সুতরাং " শ্রীগোবিন্দলীলামৃত " ইহার পূর্ব্বের রচিত। ইহার টীকাকারের নাম শ্রীবৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী, টীকার নাম "সদানন্দবিধায়িনী"। ১৭১২ শকে, অগ্রহায়ণ, সোমবার পূর্ণিমায় টীকা সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থে অষ্টকালীয় শ্রীকৃষ্ণলীলা অপূর্ব্ব কবিত্ব বলে সুন্দরভাবে সজ্জিত। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ ও সঙ্গীত-শাস্ত্রের ইহাতে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে ; বৈষ্ণব-সাহিত্যে এতাদৃশ মহাকাব্য আর নাই।

শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর দ্বিতীয় অমৃত ভাণ্ড—" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।" এই তাঁহার জীবনের শেষ গ্রন্থ। প্রাচীন বঙ্গভাষার পদ্যে লিখিত। নামে বঙ্গভাষা, কিন্তু সংস্কৃতের উপরেও ইহার স্থান। এই শ্রীগ্রন্থখানি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে বেদ অপেক্ষাও অধিক সম্মানিত ও পূজিত। বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের সকল কথাই ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর লীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রকটিত হইয়াছে। ইহাতে ৫৫ খানি সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও উদ্ভট শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন গ্রন্থকারের নিজ কৃত বহু শ্লোক আছে। বৈষ্ণবমাত্রেই এই গ্রন্থের সহিত অল্প-বিস্তর রূপে পরিচিত। কবিরাজ গোস্বামি-কৃত আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ "রূপ-মঞ্জরী"। ইহাতে শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্দ্ধান জন্য বিলাপ বর্ণিত আছে ; ইহার অনুবাদকের নাম শ্রীবৈষ্ণবদাস। শ্রীবিল্বমঙ্গল-কৃত " শ্রীকৃষ্ণ-কর্ণামৃতের " টীকাও শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত। " ভাগবত-গূঢ়ার্থরহস্য " কৃষ্ণদাসের রচিত হইলেও, উহা শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। ১৫৭৫ শকে গ্রন্থ শেষ হয়, আর ১৫০৪ শকে শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর আশ্বিনী শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীরাধা-কুণ্ডতীরে লোকান্তর ঘটে। সুতরাং অন্য কোন কৃষ্ণদাস হইবেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ৬।৭ জন কৃষ্ণদাসের নাম দৃষ্ট হয়।

আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মনিরূপণ, রাগরত্নাবলী, শ্যামানন্দ-প্রকাশ, স্বরূপবর্ণন, সিদ্ধনাম, পাষণ্ডদলন, রাগময়ীকণা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, চৌষট্টীদণ্ড-নির্ণয়, ইত্যাদি বহু ক্ষুদ্রগ্রন্থ কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া দৃষ্ট হয়। সিদ্ধান্তবিষয়ে শ্রীচরিতামৃতের সহিত সঙ্গতি না থাকায় সবগুলি শ্রীকবিরাজ কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া বোধ হয় না।

শ্রীমুকুন্দদাস।—শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর অন্তরঙ্গ শিষ্য। ন্যূনাধিক ১৪৫৩ শকে মুকুন্দের জন্ম অনুমিত হয়। মুকুন্দদাস পঞ্চালদেশীয় শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। কেহ কেহ মুলতানদেশীয় বণিক বলিয়া থাকেন। শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর দেহান্তরের পর শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকে পাইয়া আনন্দে দিন যাপন করেন। মুকুন্দ অনেক গুলি লীলাগ্রন্থ আরম্ভ করিয়া শেষাবস্থায় শ্রীবিশ্বনাথ দ্বারা তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়, অমৃতরত্নাবলী, রসতত্ত্বসার, আত্মসারতত্ত্বকারিকা, আনন্দরত্নাবলী, সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা, উপাসনাবিন্দু, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সাধনোপায় ইত্যাদি গ্রন্থ মুকুন্দের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল গ্রন্থ কেবল রসতত্ত্বে পূর্ণ। আপাতঃ-প্রতীয়মান অর্থ লইয়া অনেক মতদ্বৈধ ঘটে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দাসগোস্বামীকে যে শ্রীগোবর্দ্ধনশিলা দিয়াছিলেন, শ্রীমদ্দাস গোস্বামীর অপ্রকটের পর শ্রীকবিরাজ গোস্বামী ঐ শিলা অর্চ্চন করিতেন। তৎপরে শ্রীমুকুন্দদাস ঐ শিলার্চ্চন ভার গ্রহণ করেন। অনন্তর শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, মুকুন্দের নিকট হইতে ঐ শিলার্চ্চনার-ভার প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপ্রিয়া আবার সময়ে সময়ে শ্রীবিশ্বনাথকে তাহা অর্পন করিতেন। মুকুন্দের ধর্ম্মমত কেহ কেহ গোস্বামিপাদদিগের মতের বিপরীত বলিয়া থাকেন। তৎসঙ্গী বলিয়া বিশ্বনাথের মতও কিছু অন্যরূপ। এরূপ অনুমান অপরাধজনক ও অসঙ্গত। অনধিকারী লোকই উহার বিপরীত অর্থ করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকেও সেই দোষে দূষিত করেন। ভগবানের গূঢ়লীলা ও রসতত্ত্ব বুঝিবার অধিকারী অতি বিরল।

শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী।—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র। ইহাঁকে কেহ কেহ বীরভদ্র গোস্বামীও বলিয়া থাকেন। কাহারও মতে বীরভদ্র সহজিয়া-মত-প্রচারক শ্রীরূপ কবিরাজের পুত্র এবং তিনি পূর্ব্ববঙ্গে বহু বৌদ্ধ-শ্রমণকে ভেক দিয়া "নেড়া নেড়ী" দলের সৃষ্টি করেন। ১৪৫২ শকে বীরচন্দ্র প্রভুর সত্তার উপলব্ধি হয়। মাতার নাম শ্রীবসুধা দেবী। ইহাঁর গর্ভে ক্রমান্বয়ে ৭ পুত্র

জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের প্রণামে সবগুলি কালগত হন। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের পর গঙ্গানাম্নী কন্যা এবং পরে এই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু একচক্রা হইতে কুলদেবতা শ্রীবঙ্কিমদেব, শ্রীঅনন্তদেব শিলা, ও শ্রীত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে শ্রীপাট খড়দহে আনিয়া স্থাপন করেন। তাঁহার অপ্রকটের পর শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে একখানি প্রস্তর আনিয়া শ্রীশ্যামসুন্দর-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া খড়দহে স্থাপন করেন। "**বৃহৎ পাষণ্ডদলন**" এই শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর রচিত। ইহাতে পুরাণাদির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব, ভক্তি, গুরু ও শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ভেদে দুইখানি। ঝামাটপুর-নিবাসী শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তীর দুই কন্যা শ্রীমতী ও নারায়ণীর সহিত বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভে ইহাঁর এক পুত্র শ্রীরামচন্দ্র ও তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর।—রাজসাহী জেলা, গড়েরহাট পরগণায় খেতুরী গ্রামে, কায়স্থ-বংশে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর আবির্ভূত। পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতা—নারায়ণী। শ্রীনরোত্তম যৌবনের প্রারম্ভেই সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর আশ্রিত হন এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অনন্তর শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু (১) (দুঃখী কৃষ্ণদাস) শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সহিত মিলিত হইলেন। তিনজনেই একসঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। "প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা" নাম্নী ত্রিপদীছন্দে বাঙ্গলা গ্রন্থখানি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রথম গ্রন্থ।

(১) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পবিত্র জীবন-কাহিনী মৎ-প্রণীত "শ্রীশ্যামানন্দ-চরিত" গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গতঃ এই গ্রন্থে শ্রীআচার্য্যপ্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়েরও পূত জীবন আলোচিত হইয়াছে।

১৫০৫।৬ শকের মধ্যে ইনি ৬টী শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সে ৬টী শ্রীবিগ্রহ এই—

" গৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত-শ্রীকৃষ্ণ-ব্রজমোহন।
রাধারমণ হে রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥"

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীঠাকুর মহাশয় আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রার্থনা, (ইহাতে সাধক ও সিদ্ধাবস্থার কথা বর্ণিত) নাম-সংকীর্ত্তন, হাটপত্তন (রূপকছলে শ্রীমহাপ্রভুর প্রেমভক্তি বিস্তার), এই কয় খানি বৈষ্ণবগণের নিত্য পাঠ্য। তদ্ভিন্ন রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সদ্ভাব-চন্দ্রিকা, সাধনভক্তি-চন্দ্রিকা, রাগমালা, স্মরণ-মঙ্গল, ভক্তিউদ্দীপন ইত্যাদি গ্রন্থগুলিও ঠাকুর মহাশয়ের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ নরোত্তমদাসের ভণিতা যুক্ত দৃষ্ট হয়, কিন্তু সেগুলি সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া ঠাকুর নরোত্তম-কৃত বলিতে ইচ্ছা হয় না।

শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীবৃন্দাবন হইতে গোস্বামিদিগের অসংখ্য গ্রন্থ গৌড়দেশে প্রচারের জন্য আনয়ন করেন। বাঁকুড়া—বনবিষ্ণুপুরে বীরহাম্বীর কর্ত্তৃক ঐ সকল গ্রন্থরত্ন লুণ্ঠিত হইলেও শ্রীনিবাসাচার্য্যের কৃপা চেষ্টায় তাহা গৌড়-বঙ্গে বহুল প্রচারিত হয়। মুর্শিদাবাদ বুধুরী গ্রাম-নিবাসী **শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও গোবিন্দ কবিরাজ** দুই ভ্রাতা উহাদেরই সমবয়স্ক ও পরম বন্ধু; তিলিয়া বুধরী গ্রামে ইহাদের জন্ম। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম সুনন্দা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের রচিত " স্মরণ-দর্পণ "—(ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য)। ইহাঁদের অনেক পদাবলী আছে। বিশেষতঃ গোবিন্দ দাসের **" একান্নপদ "** বৈষ্ণব ও কীর্ত্তনীয়াগণের পরম আদরনীয়। " আটরস " নামক গ্রন্থও গোবিন্দ কৃত। গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র **" দিব্যসিংহ "** ' সঙ্গীত-মাধব '(১) নামক নাটক রচনা করেন। এই নাটকের অনেক শ্লোক

(১) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত একখানি " সঙ্গীত-মাধব " গ্রন্থ আছে। সেখানি গীতিকাব্য—শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দের আদর্শে লিখিত।

ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম দাস "গীতগোবিন্দ রতিমঞ্জরী" নামে সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর বিশেষ কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। তৎপুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ ঠাকুর কৃত "অন্ত-প্রকাশ" ও বীররত্নাবলী গ্রন্থ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্যামানন্দ কৃত "শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব" (শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর উপদেশ-বৃত্তান্ত) তদ্ভিন্ন অনেক পদাবলীও দৃষ্ট হয়। শ্রীলঠাকুর নরোত্তম চিরকুমার ছিলেন। ইহাঁর শিষ্যের মধ্যে মুর্শিদাবাদ—বালুচর-নিবাসী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ শ্রীরামকৃষ্ণ আচার্য্য ও উক্ত জেলায় সৈদাবাদ-নিবাসী রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীনিবাস, শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর এই তিনজনেরই শিষ্য-শাখাগণ পৃথক্ তিন পরিবার বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং তিলকও পৃথক্ পৃথক্। শ্রীনিবাসাচার্য্য-পরিবারের তিলক বংশপত্রের ন্যায়, শ্রীশ্যামানন্দ-পরিবারের তিলক নূপুরাকৃতি ও ঠাকুর-পরিবারের তিলক চম্পক-কলিকার ন্যায়।

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু জেলা বর্দ্ধমান কাটোয়ার ৭ মাইল অগ্নিকোণে গঙ্গার পূর্ব্বতীরে চাখন্দী গ্রামে ১৪৪১ শকে (কোন মতে ১৪৩৮ শকে) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্রীগঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য (চৈতন্যদাস), মাতা শ্রীখণ্ডের নিকট যাজী-গ্রাম-নিবাসী শ্রীবলরাম আচার্য্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। শ্রীনিবাস শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীনিবাসাচার্য্যের দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নী শ্রীঈশ্বরী দেবী, দ্বিতীয়া শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া। আচার্য্য প্রভুর তিন পুত্র—বৃন্দাবনবল্লভ, রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর ও গতিগোবিন্দ। তিন কন্যা—কৃষ্ণপ্রিয়া, হেমলতা (অর্দ্ধকালী নামে প্রসিদ্ধা) ও ফুলঝি ঠাকুরাণী।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, জেলা মেদিনীপুর ধারেন্দাবাহাদুরপুর গ্রামে ১৪৫৬ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম শ্রীদুরিকা। অম্বিকা কালনার শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য। ইহার অন্য নাম দুঃখী কৃষ্ণদাস। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীললিতা দেবীর সাক্ষাৎ কৃপা প্রাপ্ত হইয়া

ইনি "শ্রীশ্যামানন্দ" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ মৎ-সম্পাদিত "শ্রীশ্যামানন্দ চরিত" গ্রন্থে জ্ঞাতব্য। বৃন্দাবনতত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব, ও উপাসনা-সার সংগ্রহ, ইঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীনিত্যানন্দ দাস।—পূর্ব্বনাম বলরামদাস। বৈদ্যবংশে সমুদ্ভূত, বাসস্থান শ্রীখণ্ড। পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। জন্ম অনুমান ১৪২০ শকে। দীক্ষাগুরু শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী। ইনি বাল্যে মাতৃপিতৃহীন হইয়া শ্রীজাহ্নবা দেবীর আশ্রয়ে জীবন যাপন করেন। ইনি "**প্রেম-বিলাস**" নামক গ্রন্থের প্রণেতা। প্রধানতঃ শ্রীনিবাস-নরোত্তমাদির বিস্তৃত চরিত্রই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এই গ্রন্থখানিকে কেহ কেহ আধুনিক বলিয়া কটাক্ষ করেন। কিন্তু গ্রন্থখানি নিতান্ত আধুনিক নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের প্রাচীন পদ্যানুবাদক শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর মহাশয় এই গ্রন্থের আদর করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনরহরি দাস।—নামান্তর ঘনশ্যাম দাস। ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন, পিতৃনাম জগন্নাথ—ইনি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। সুতরাং বিশ্বনাথের শেষ বয়সে (অনুমান ১৬৪৫ শকে) নরহরির বিদ্যমানতা বোধ হয়। বাসস্থান—জেলা মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরের দক্ষিণে রেঙাপুর। ইনি "ভক্তিরত্নাকর" নামক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ১৫শ, তরঙ্গে বিভক্ত বৈষ্ণব ঐতিহ্য গ্রন্থ। বাঙ্গলায় শ্রীনিবাসাচার্য্য শিষ্য কৃষ্ণদাস-কৃত "ভক্তমাল" ও এই "ভক্তিরত্নাকর" বৈষ্ণব-ইতিহাসের পথ-প্রদর্শক। "শ্রীনরোত্তম বিলাস" ইহাঁরই রচিত। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের চরিত্র ইহাতে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। "কহিলু এ প্রসঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে। বিস্তারি বর্ণিব নরোত্তম বিলাসেতে।" (ভক্তিরত্নাকর ১০ম, তরঙ্গ)। এতদ্ভিন্ন "অনুরাগবল্লী ও বহির্ম্মুখ-প্রকাশ" নামে ২ খানি গ্রন্থও নরহরি-প্রণীত। আবার গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী, নামামৃতসমুদ্র, গৌরচরিত্র-চিন্তামণি, প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গীতচন্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাসচরিত ইত্যাদি গ্রন্থগুলি নরহরির ভণিতাযুক্ত দৃষ্ট হইলেও সবগুলি উক্ত নরহরির কৃত বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুর।—কাটোয়ার উত্তর, ভরতপুর থানার অধীন ভাগিরথীর পশ্চিম তীরস্থ মালিহাটী গ্রামে ১৫৩২ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীহেমলতা দেবীর শিষ্য। ইঁহার প্রণীত মূল গ্রন্থ "**কর্ণানন্দ**" (১৫২৯ সালে সম্পূর্ণ হয়)। ইহাতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের শাখা বর্ণিত আছে। তদ্ভিন্ন ইনি শ্রীরূপগোস্বামিকৃত "বিদগ্ধ মাধব" নাটকের, শ্রীকবিরাজ গোস্বামিকৃত "গোবিন্দ-লীলামৃতের" ও শ্রীভগবদ্-গীতার বাঙ্গলা পদ্যানুবাদ করেন। ইঁহারই কৃপাতে অসংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ অনেক বৈষ্ণব-কাব্যের রসাস্বাদে অদ্যাপি সমর্থ। "পদামৃত-সমুদ্র ও পদকল্প-তরু" নামক প্রসিদ্ধ পদগ্রন্থে ইঁহার রচিত অনেক পদ দৃষ্ট হয়। শ্রীআচার্য্য প্রভুর পৌত্র শ্রীলরাধামোহন ঠাকুরই **পদামৃত-সমুদ্রের** সংগ্রাহক ও উক্ত গ্রন্থ-ধৃত বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পদাবলীর সংস্কৃত টীকাকার। জেলা মুর্শিদাবাদ শক্তিপুর-সন্নিহিত টেঞা বৈদ্যপুর-নিবাসী বৈদ্যবংশোদ্ভূত **বৈষ্ণবদাস** (পূর্ব্ব নাম গোকুলানন্দ সেন) "**পদকল্পতরুর**" সংগ্রাহক।

পদকর্ত্তা শ্রীজ্ঞানদাস।—(জেলা বর্দ্ধমান, থানা কেতুগ্রামের অধীন বড়কাঁদড়া বা রামজীবনপুর গ্রামে গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব বংশে শ্রীনিত্যানন্দশাখা পদকর্ত্তা জ্ঞানদাসের জন্ম), বাসুদেব ঘোষ, রাজা বীরহাম্বীর, রায়শেখর, রাধামোহন, জগন্নাথদাস, বলরামদাস, অনন্তদাস, গতিগোবিন্দ, গদাধর, গোবিন্দ ঘোষ, ঘনশ্যাম, চম্পতি ঠাকুর, চৈতন্যদাস, জগদানন্দ, জগন্মোহন, প্রেমানন্দ, বংশীবদন, বসন্তরায়, বৈষ্ণবদাস, বৃন্দাবন, দৈবকীনন্দন, নয়নানন্দ, পীতাম্বর, পরমানন্দ, প্রসাদ দাস, পরমেশ্বরী দাস, মাধব ঘোষ, মাধব দাস, মুরারি দাস, রসময় দাস, রাধাবল্লভ, রামানন্দ বসু, রসিকানন্দ, লোচন দাস, শচীনন্দন, শ্যামানন্দ, শ্যামদাস, শিবানন্দ, সিংহভূপতি, হরিদাস, হরিবল্লভ, কবিশেখর, উদ্ধবদাস, গৌরদাস, হরেকৃষ্ণ, যদুনাথ আচার্য্য প্রভৃতি বহু পদকর্ত্তা, বিবিধ ভাব ও রসবৈচিত্র্যময় সঙ্গীত-পদ রচনা করিয়া বঙ্গীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে এস্থলে

প্রত্যেকের পরিচয় দিতে পারা গেল না। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।—ইনি সংস্কৃত ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রাম, ১৫৮৬ শকে জন্ম। নামান্তর হরিবল্লভ। কেহ কেহ বলেন পূর্ব্ববঙ্গের রূপ-কবিরাজ বিশ্বনাথের জ্ঞাতি। এ কথা বিশ্বাস্য প্রমাণসহ নহে। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ দ্বারা বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দুইটী মহৎ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। ১ম, ভক্তিমার্গের অন্যাঙ্গবর্জ্জিত কেবল স্মরণাঙ্গ-সম্বল রূপ-কবিরাজের দলকে বিচারে পরাস্ত করিয়া এবং স্ব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া বিশুদ্ধ ভক্তিপথের গৌরব রক্ষা করেন। ২য়, জয়পুরের সভাতে 'শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ের' গৌরব ঘোষণা করেন। সংস্কৃত বৈষ্ণব সাহিত্য সমাজে গোস্বামিদিগের পর বিশ্বনাথের ন্যায় বহুগ্রন্থ-রচয়িতা পণ্ডিত আর দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রীভাগবতের টীকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, নাম—"সারার্থদর্শিনী"। ভিন্ন ভিন্ন স্কন্ধের টীকা সমাপ্তির স্থান ও সময় নির্দ্দেশ ভিন্ন ভিন্ন থাকিলেও দ্বাদশ স্কন্ধের টীকা শ্রীরাধাকুণ্ডে ১৬২৬ শকে মাঘ মাসে শুক্লা ষষ্ঠীতে শেষ হয়। এইরূপ স্থান ও সময় নির্দ্দেশে বোধ হয়, ভাগবতের টীকাই বিশ্বনাথের আসন্ন মৃত্যুকালের শেষ গ্রন্থ।

অষ্টকালীন লীলাবর্ণনময় মহাকাব্য "**শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত**"(১) ইঁহারই রচিত। এই গ্রন্থে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ণ-মাধুর্য্যলীলার বিস্তৃতি আছে। ইহার টীকাকার শ্রীমদ্ বিশ্বনাথেরই মন্ত্র-শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য। ইনি "সঙ্কল্প-কল্পদ্রুমে"র-টীকায় বিশ্বনাথের রচিত ২১ খানি গ্রন্থের তালিকা দিয়াছেন। যথা—'সারার্থদর্শিনী' (ভাগবতের টীকা) সারার্থ-বর্ষিণী (গীতার টীকা) ব্রহ্ম-

(১) শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃতম্, মূল, টীকা, প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ ও পাদটীকায় লীলোপযোগী পদাবলী ও বহুজ্ঞাতব্য বিষয় সহ "ভক্তিপ্রভা" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সডাক ৬৷৷৹ টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

সংহিতার টীকা, চৈতন্যচরিতামৃতের টীকা (অসম্পূর্ণ) বিদগ্ধমাধবের টীকা, ললিত-মাধবের টীকা, দানকেলী-কৌমুদীর টীকা, আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বলনীলমণির টীকা), ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকা, মাধুর্য্য-কাদম্বিনী, ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা, রসামৃতসিন্ধুর—বিন্দু, উজ্জ্বলনীলমণির—কিরণ, ভাগবতামৃতের—কণা, শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতম্ (মহাকাব্য), গীতাবলী, প্রেমসম্পুট (খণ্ডকাব্য) চমৎকারচন্দ্রিকা, ব্রজরীতিচিন্তামণি(২) ও স্তবাবলী (ইহাতে ২১টী অষ্টক, স্বপ্নবিলাসামৃত, অনুরাগ-বল্লী, রাধিকাধ্যানামৃত, রূপচিন্তামণি এই ৪খানি ক্ষুদ্র কাব্য। সংকল্প-কল্পদ্রুম ও সুরতকথামৃত এই দুইখানি শতক এবং নিকুঞ্জবিরুদাবলী-বিরুদকাব্য আছে)।

এতদ্ভিন্ন সুখবর্ত্তিনী (আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা) সুবোধিনী (অলঙ্কার-কৌস্তুভের টীকা) গোপালতাপনীর টীকা, গৌরগণচন্দ্রিকা (গৌরভক্তের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত) গৌরাঙ্গলীলামৃত (শ্রীমহাপ্রভুর অষ্টকালীয় লীলাবর্ণন) ও ক্ষণদাগীতচিন্তামণি (পদাবলী) শ্রীবিশ্বনাথ কৃত বলিয়া দৃষ্ট হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর তিরোভাব ঘটে। ইনি সৈদাবাদ নিবাসী শ্রীকৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্র-শিষ্য বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন।

শ্রীপ্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ।—ইহা গুরুদত্ত নাম, পূর্ব্ব নাম শ্রীপুরুষোত্তম, কাশ্যপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশে, কুলনগরে (বর্ত্তমান কোন্নগর বলিয়াই সম্ভব হয়) জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাদাস। ইনি ১৬৩৪ শকে শ্রীকর্ণপুর গোস্বামীর "চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের" পদ্যানুবাদ লিখিয়া শেষ করেন। ইনি বাঘনাপাড়ার শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের পৌত্র শ্রীরামাইয়ের শিষ্য। বংশীবদন শ্রীমহাপ্রভুর পত্নী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য। ইনি "বংশীশিক্ষা" গ্রন্থের রচয়িতা। কেহ কেহ প্রেমদাসকেই বংশী-শিক্ষার রচয়িতা বলেন। এই গ্রন্থ শ্রীপাট বাঘনা

(২) শ্রীব্রজরীতি-চিন্তামণি—মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ উক্ত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ৸৹ আনা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

পাড়ার ইতিবৃত্ত-মূলক। বর্ত্তমান শ্রীনবদ্বীপে "শ্রীশ্রীমহাপ্রভু" নামক প্রধান শ্রীমূর্ত্তি এই বংশীবদনের নির্ম্মিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রসিদ্ধ—"মনঃশিক্ষা" গ্রন্থপ্রণেতা মহানুভব **প্রেমানন্দ দাস** উক্ত প্রেমদাস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই অনুমিত হয়।

প্রসিদ্ধ লালাবাবুর (কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ) শিক্ষাগুরু শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর লিখিত "ভজনগুটিকা" (শ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলাস্মরণ) ব্রজবাসী সাধক বৈষ্ণবগণের নিত্য ব্যবহার্য্য।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর।—জেলা বর্দ্ধমান—শ্রীখণ্ডে ১৪০০ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম নারায়ণদেব। ইনি শ্রীমহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য। ইনিই শ্রীমহাপ্রভুকে নাগরীভাবে ভজন প্রবর্ত্তিত করেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদাবলী রচনা করিয়া লীলারস-কীর্ত্তনের "গৌরচন্দ্রিকার" প্রথম সৃষ্টি করেন। শ্রীলোচনদাস ঠাকুর ও পদকর্ত্তা বাসুদেব ঘোষ ইহাঁরই শিষ্য। শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীভক্তিচন্দ্রিকা, শ্রীকৃষ্ণ-ভজনামৃত, শ্রীচৈতন্য-সহস্র নাম, নামামৃত-সমুদ্র, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। লোকানন্দাচার্য্য নামক এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীসরকার ঠাকুরের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই লোকানন্দাচার্য্য "ভক্তিসার-সমুচ্চয়" গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীমহাপ্রভুর নিকট-আত্মীয় শ্রীপ্রদ্যুম্নমিশ্র ঠাকুর "শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-উদয়াবলী" গ্রন্থ রচনা করেন এবং শ্রীমহাপ্রভুর পিতামহ শ্রীউপেন্দ্র মিশ্রের বংশজাত শ্রীজগজ্জীবন মিশ্র "মনঃসন্তোষিণী" নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহট্ট ভ্রমণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবিগণ বাঙ্গলা-সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি, বিস্তার ও বহুপ্রচার করিয়া ধর্ম্ম ও সাহিত্য চর্চ্চার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পদ্যে কত যে ক্ষুদ্র বৃহৎ বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। নিম্নে কতকগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

শ্রীশ্যামদাস কৃত—একাদশীর ব্রত-কথা। দ্বিজ শ্রীপরশুরামের—কালিয়-দমন, সুদামচরিত্র ও গুরুদক্ষিণা। শ্রীকবিশেখরের—গোপাল-বিজয়। শ্রীপ্রেমানন্দ দাসের—চন্দ্রচিন্তামণি। শ্রীরসময় দাসের—চমৎকারকলিকা। শ্রীরামগোপাল দাস কৃত—চৈতন্য তত্ত্বসার (শ্রীসরকার ঠাকুরের শাখা বর্ণন)। দ্বিজ শ্রীমুকুন্দের—জগন্নাথমঙ্গল। শ্রীযদুনাথদাসের-তত্ত্বকথা। দ্বিজ শ্রীভগীরথের—তুলসীচরিত্র ও চৈতন্যসঙ্গীত। দ্বিজ শ্রীজয়নারায়ণের—দ্বারকাবিলাস। শ্রীবংশীদাসের—দীপকোজ্জ্বল ও নিকুঞ্জ-রহস্য। শ্রীকৃষ্ণরাম দাসের—ভজন-মালিকা। শ্রীগিরিবর দাসের—মনঃশিক্ষা। শ্রীপুরুষোত্তম দাসের—মোহমুদগর। শ্রীনারায়ণ দাসের—মুক্তা-চরিত্র। শ্রীকবিবল্লভের—রসকদম্ব। শ্রীরাইচরণ দাসের—অভিরামবন্দনা। বাঙ্গলা ভক্ত-মাল প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস বা লালদাস কৃত—উপাসনা শিক্ষা।(১) শ্রীগোপীনাথ দাসের—সিদ্ধসার। শ্রীরামচন্দ্র দাসের—সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা(২) ও স্মরণ-দর্পণ। শ্রীগিরিধর দাসের—স্মরণ-মঙ্গল-সূত্র। শ্রীগোপীকৃষ্ণ দাসের—হরিনাম-কবচ। শ্রীমালাধর বসুর—শ্রীকৃষ্ণবিজয়। শ্রীকাশীরাম দাসের ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণদাস কৃত—শ্রীকৃষ্ণবিলাস ও জগন্নাথ মঙ্গল। শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী কৃত—হরিলীলা কাব্য। শ্রীমাধব গুণাকরের—উদ্ধবদূত। দ্বিজ শ্রীনরসিংহের—উদ্ধব-সংবাদ। শ্রীবলরাম দাসের—কৃষ্ণলীলামৃত। শ্রীরাজেশ্বর নন্দীর—ক্রিয়াযোগসার। শ্রীভবানী দাসের—গজেন্দ্রমোক্ষণ। শ্রীবৃন্দাবন দসের—দধিখণ্ড। শ্রীজীবন চক্রবর্ত্তীর—দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড। শ্রীমনোহর দাসের—দীনমণি-চন্দ্রোদয়। শ্রীনরসিংহ দাসের—হংসদূত ও প্রেম-দাবানল। শ্রীগুরুচরণ দাসের—প্রেমামৃত। শ্রীবৃন্দাবন দাসের ভক্তিচিন্তামণি। শ্রীগৌরমোহন দাসের—পদকল্প-লতিকা ও শব্দচিন্তামণি।

---

(১) উপাসনা শিক্ষা, বিশদ তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সহ ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।০ আনা।

(২) সিদ্ধান্ত-চন্দ্রিকা ও স্মরণ-দর্পণ উক্ত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতাচার্য্যের (রঘুনাথ পণ্ডিতের) কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী। শ্রীঅকিঞ্চন দাসের—ভক্তিরসাত্মিকা। এতদ্ভিন্ন শ্রীনরোত্তম দাস ও শ্রীকৃষ্ণদাসের ভণিতাযুক্ত বহুগ্রন্থ দৃষ্ট হয়। যথা উপাসনা-পটল, গোপীভক্তিরস, ব্রজতত্ত্ব-নির্ণয়, বৃন্দাবন-পরিক্রমা, নবদ্বীপ-পরিক্রমা-আশ্রয় নির্ণয়, হরিনাম দীপিকা, বৃন্দাবন শতক, গৌর-গোবিন্দপূজা প্রভৃতি। "পদাঙ্ক-দূত" (শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম-কৃত) সংস্কৃত দূতকাব্য প্রাচীন না হইলেও বেশ শ্রুতিমধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক সুপণ্ডিত মহাত্মা বৈষ্ণব-সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বর্দ্ধমান—মাড়গ্রাম নিবাসী শ্রীনিত্যানন্দ-বংশ্য ৺বীরচন্দ্র গোস্বামিপ্রভু সংস্কৃত ও বাঙ্গলায় অনেকগুলি বৈষ্ণবগ্রন্থ লিখিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের অঙ্গপোষণ করিয়া গিয়াছেন। সদাচারদেশিকা, সম্মত-ভূষিকা, গৌর-লীলার্ণব, পাষণ্ডমুদ্গার, ভাবতরঙ্গিণী, সন্দেহ-ভঞ্জিকা, ভাব-প্রকাশিকা, মনো-দূত, কৃষ্ণলীলার্ণব (মহাকাব্য), মাধুর্য্যকাদম্বিনী, পরতত্ত্বরত্নাকর (বেদান্তবিষয়ক) ব্রজরমাপরিণয় (স্বকীয়বাদের নাটক) রসিক-রঙ্গদা (পদ্যাবলীর টীকা) শব্দার্থবোধিনী (শ্রীগোপালচম্পূর টীকা) প্রভৃতি। ইহাঁরই সহোদর শ্রীপাদরঘুনন্দন গোস্বামী "রাম-রসায়ণ" (শ্রীরামচন্দ্রের লীলাগ্রন্থ) রচনা করেন। দুর্গাদাস শর্ম্মা-কৃত—মুক্তালতা। খড়দহের প্রভুপাদ শ্রীউপেন্দ্রমোহন গোস্বামীর—সিদ্ধান্তরত্ন (দার্শনিক গ্রন্থ) শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবাইত শ্রীপাদ গোপীলাল গোস্বামীর—"বেষাশ্রয়-বিধি" (বৈষ্ণব সন্ন্যাস বা ভেকের পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত) প্রভুপাদ শ্রীনবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর—"বৈষ্ণবাচার-দর্পণ" বৈষ্ণবব্রত নির্ণয়।" শান্তিপুর-নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীমদনগোপাল গোস্বামীর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সুন্দর সারগর্ভ ব্যাখ্যা। নদীয়া চিৎলা-নিবাসী শ্রীঅদ্বৈত বংশ্য প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামীর—বিপ্র-কণ্ঠাভরণ (তুলসীমালা ধারণের ব্যবস্থা) দুর্ম্মতনিরসণ ও শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা। নদীয়া—কুমার-খালি-নিবাসী প্রভুপাদ শ্রীনীলমণি গোস্বামীর—"শ্রীচৈতন্য-মতবোধিনী" মাসিক পত্রিকা। নবদ্বীপের স্মার্ত্তকুলগুরু ব্রজনাথ বিদ্যারত্নের—চৈতন্যচন্দ্রোদয়। ডেঃ

মাজিষ্ট্রেট্ মহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্যের প্রকাশিত 'ঈশান-সংহিতা।" বাঁকুড়া—মালিয়াতার জমিদার শ্রীগোপালচন্দ্র অধ্বর্য্যু মহাশয়ের মুক্তিপ্রদীপ, রাধাদামোদরার্চ্চন-চন্দ্রিকা। কলিকাতা এসিয়াটীক্ সোসাইটীর গ্রন্থ-সংগ্রাহক—পণ্ডিত রামনাথ তর্করত্নের "বাসুদেববিজয়" (সংস্কৃত মহাকাব্য) বুধুইপাড়ার শ্রীনিবাসাচার্য্য বংশীয় রাধিকা-নাথ ঠাকুরের—অরুণোদয়-বিচার। গৌবরহাটী নিবাসী রামপ্রসন্ন ঘোষের—গৌর-চন্দ্রোদয়, বিদগ্ধ গোপাল-লীলামৃত প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। ভক্তিশাস্ত্রে প্রগাঢ় জ্ঞান-সম্পন্ন ভক্তবর কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের—শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য, জৈবধর্ম্ম, প্রভৃতি বহু বৈষ্ণবগ্রন্থ এবং পরম গৌর-ভক্ত শিশিরকুমার ঘোষের—অমিয় নিমাই-চরিত, কালাচাঁদগীতা প্রভৃতি ইংরাজী ভাবাপন্ন আধুনিক শিক্ষিত দলের পক্ষে ভক্তিধর্ম্ম বুঝিবার পথ-প্রদর্শক। নদীয়া—গরুড়া নিবাসী রামনারায়ণ বিদ্যাভূষণের—একাদশী-শ্রাদ্ধ-নিষেধ। মালদহ—মালঞ্চ-পল্লীস্থ মোহিনীমোহন বিদ্যালঙ্কারের—রাধাপ্রেমামৃত প্রভৃতি বহু মহাত্মার বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থ, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও বৈষ্ণব-সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছে।

জাঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর-নিবাসী গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব-বংশীয় গোবিন্দ অধিকারী মহাশয়ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গান (কালীয়দমন যাত্রা) দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্য কাননকে মুখরিত করিয়া গিয়াছেন। ইনি আমতার নিকট ধুরখালি-গ্রাম-নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তনিয়া গোবিন্দ অধিকারীরই নিকট-আত্মীয় গোলোকদাস অধিকারীর নিকট গান শিক্ষা করেন। অনুমান ১২০৫ সালে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১২৭৭ শালে পরলোক প্রাপ্তি ঘটে। ইঁহারই উপযুক্ত শিষ্য বর্দ্ধমান ধাওয়াবুনী গ্রাম নিবাসী নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় গুরুর কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীধর কথক, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় রূপচাঁদপক্ষী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী (শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ শ্রীসদাশিব কবিরাজের বংশধর—ইনি স্বপ্নবিলাস, বিচিত্র-বিলাস, সুবল সংবাদ, রাই-উন্মাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা, জন্ম ১২১৭ সাল) মধুসূদন কিন্নর (মধুকান্—টপ্-সঙ্গীত রচয়িতা) প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব কবি, বৈষ্ণবসাহিত্যের শেষ অঙ্কে অনেক দৃশ্য

দেখাইয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলিরাজা, কানু ফকির প্রভৃতি অনেক মুসলমান কবি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন। তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্ণব নামধারী বাউল ও দরবেশের গানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখ থাকিলেও উহা গোস্বামি-শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সাহিত্য নহে। সুতরাং সে সকলের পরিচয় অনাবশ্যক। বর্ত্তমান সময়েও প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীল হরিদাস গোস্বামী (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ-সম্পাদক) শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ (ভূতপূর্ব্ব আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক), শ্রীল রাখালানন্দ ঠাকুর (শ্রীখণ্ডের ঠাকুর বংশ) ত্রিদণ্ডী পরমহংস শ্রীল বিমলা-প্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী (গৌড়ীয়-মঠ ও গৌড়ীয় সাপ্তহিক-প্রতিষ্ঠাতা) শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত কুলদা প্রসাদ মল্লিক (বীরভূমি-সম্পাদক), শ্রীযুক্ত গোপেন্দুভূষণ বন্দোপাধ্যায় (পল্লিবাসী-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য (ভক্তি-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (গৌরাঙ্গ-সেবক-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত ভূষণচন্দ্র দাস (মাধুকরী-সম্পাদক) শ্রীযুক্ত বামাচরণ বসু, শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ নাথ (সোনার গৌরাঙ্গ সম্পাদক) শ্রীযুক্ত মুরারি লাল অধিকারী (বৈষ্ণব দিগ্‌দর্শনী প্রণেতা) ও শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায় ভট্ট প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত বিবিধ ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

অনন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্যরত্নের আমরা দিগ্‌দর্শন মাত্র করিলাম। নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা করিলে স্পষ্টই অনুমিত হইবে, ভুবন-বিখ্যাত মহাকবি কালিদাসের সিংহাসনের নিকট শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর আসন, কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্ট ও সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথের অনতিদূরে মহাকবি কর্ণপুরের আসন শোভা পাইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের পার্শ্বে ধর্ম্মাচার্য্য শ্রীসনাতন ও শ্রীগোপাল ভট্টকে এবং ভারতের মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র ও মাধবাচার্য্যের কিঞ্চিৎ সম্মুখভাগে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীকে বসাইয়া দেখুন কত শোভা হয়। অদ্বৈ

সেই ছিন্ন-কন্থা-মাত্র-সম্বল দীনাতিদীন মাধুকরী-নির্ভর-জীবন শ্রীগোস্বামিবর্য্যগণের সাধনা-ক্লিষ্ট মলিন দেহে কি অনির্ব্বচনীয় দৈবী শক্তি সঞ্চারিত ছিল, তাহা বাস্তবিকই ভাবিবার বিষয়। হিন্দু-শাস্ত্রের অতি নীরস বেদান্ত হইতে বাঙ্গলার ছড়া পাঁচালী পর্য্যন্ত বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাণ্ডারে বিরাজিত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে কি নাই? গৌড়ান্ত-বৈষ্ণব-জাতি-সমাজের এই সকল গ্রন্থ-রত্নই একমাত্র উপজীব্য। বর্ত্তমান সভ্যতা ও সাহিত্যালোচনার যুগেও ভিখারী বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পর্ণকুটীরে এইরূপ কত যে অমূল্য গ্রন্থ-রত্ন জীর্ণ দীর্ণ ধূলি-মণ্ডিত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংশ-কবলিত হইতেছে, তাহার কে সন্ধান লয়? যতটুকু উদ্ধার চেষ্টা হইতেছে, তাহা হিমালয়ের কাছে সর্ষপ মাত্র। সুতরাং এ বিষয়ে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কৃতি-সন্তানগণের কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।*

---

*এই উল্লাসের অধিকাংশ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-পণ্ডিত নিত্যধামগত ৺রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের লিখিত "বৈষ্ণব-সাহিত্য" নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত।

তৃতীয় অংশ।

বর্ণ প্রকরণ।

——:o:——

দশম উল্লাস।

বৈষ্ণবশব্দের শাব্দিক ব্যুৎপত্তি ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে ; এক্ষণে বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" বিষ্ণুরেব হি যস্যৈব দেবতা বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।"

বৈষ্ণবের সামান্য লক্ষণ।

অর্থাৎ বিষ্ণু যাঁহার অভীষ্ট দেব, তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা যায়। আবার পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

" গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈ রিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ তিনিই বৈষ্ণব নামে অভিহিত, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত।

স্কন্দপুরাণে আরও কথিত হইয়াছে—

" পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
নৈকাদশীং ত্যজেদ্ যচ্চ যস্য দীক্ষাস্তি বৈষ্ণবী॥"

অর্থাৎ পরম আপদেই হউক বা পরম হর্ষেই হউক যে ব্যক্তি শ্রীএকাদশী প্রভৃতি শ্রীবিষ্ণুব্রত পরিত্যাগ না করেন, এবং যাঁহার শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা, তিনিই বৈষ্ণব।

শাস্ত্রে জীবিতের পক্ষে প্রধানতঃ ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিধান দৃষ্ট হয়। সেই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও এক দীক্ষা-সংস্কার অভাবে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়। দীক্ষা-সংস্কারের এমনই প্রভাব, এই একটী মাত্র সংস্কার দ্বারাই সে সমুদায়

সংস্কার পূর্ণ হইয়া থাকে। এমন কি, উপনয়নাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইলেও যদি দীক্ষা গ্রহণ না করা হয়, তাহা হইলে তাহাও নিরর্থক হইয়া থাকে। যথা—

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকং॥
পশুযোনি মবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরোহিতো জনঃ॥"

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামল বচন।

হে বামোরু! যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বিফল হইয়া থাকে। দীক্ষাবিহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হয়।

পুনশ্চ স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদ সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলং।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা প্রাপ্ত না হয় অথবা জনার্দ্দনের পূজা না করে ইহলোকে তাহারা পশুনামে অভিহিত। তাহাদের জীবন ধারণে কি ফল?

দীক্ষা ব্যতিরেকে শ্রীবিষ্ণু পূজায় কাহারও অধিকার জন্মে না; আবার এই শ্রীবিষ্ণু পূজা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু,—

দীক্ষার আবশ্যকতা।

"শালগ্রাম-শিলা পূজাং বিনা যোঽশ্নাতি কিঞ্চন।
স চণ্ডালাদি বিষ্ঠায়া মাকল্পং জায়তে ক্রিমিঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীশালগ্রামশিলার্চ্চন ব্যতীত যে ব্যক্তি কিছু ভোজন করে, সে কল্পকাল পর্য্যন্ত চণ্ডাল বিষ্ঠায় ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইত্যাদি বচনে পূজার নিত্যাবশ্যকতা সূচিত হওয়ায়, দীক্ষা গ্রহণেরও নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে। অতএব দীক্ষা গ্রহণ জীব মাত্রেরই যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান, ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এইরূপ পশু হওয়ার কথা, বেদের অঙ্গ নিরুক্তগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে।—

"স্থাণুরয়ং ভারহারঃ কিলাভূদধীত্য বেদং ন বিজানাতি যোঽর্থম্।" ১ অঃ। ১৮

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করিয়াও বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত না হয়, সে স্থাণুর ন্যায় জড়; তাহার বেদাধ্যয়ন, শর্করাবাহী পশুর ন্যায় কেবল ভার-বহন মাত্র। ফলতঃ তাহার বেদপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। সুতরাং যাঁহারা বেদপাঠ করিয়া বেদের অর্থ অবগত হন, তাঁহাদেরই বেদপাঠ সার্থক। বেদের মুখ্যার্থ কি, স্বয়ং বেদই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা ঋগ্বেদ, প্রথম মণ্ডলে—

বেদের মুখ্যার্থ।

"ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদ কিমৃচা করিষ্যতি য উতদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে॥"

২।৩।২১।১৬৪ সূঃ।

পরমব্যোম্ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনশ্বর পরমেশ্বরেই সমস্ত মন্ত্র ও সমস্ত দেবতা অবস্থিত। যে ব্যক্তি সেই পরমেশ্বর অর্থাৎ বিষ্ণুর বিষয় কিছুমাত্র অবগত না হয়, তাহার সেই বেদমন্ত্রে কি করিবে?

এই বৈদিক বচনের তাৎপর্য্যানুসরণ করিয়া "শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্র" বলিয়াছেন—

"বিষ্ণুতত্ত্বং পরিজ্ঞায় একং চানেক ভেদগং।
দীক্ষয়েন্মেদিনীং সর্ব্বাং কিং পুনশ্চোপসন্ততান্॥"

অর্থাৎ এক বা বহুভেদগত বিষ্ণুতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, কেবল দীক্ষার্থ উপস্থিত ব্যক্তি কি, নিখিল জগৎকে দীক্ষা প্রদান করিবেন?

অতএব যাঁহারা পরমেশ্বরকে অবগত হন, পরমেশ্বর কেবল তাঁহাদেরই প্রাপ্ত হন। ফলতঃ সমস্ত বেদমন্ত্র এবং সেই মন্ত্র-প্রতিপাদ্য অগ্নি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা পরমেশ্বর বিষ্ণুতেই অবস্থিত অর্থাৎ পরমেশ্বরই সকলের আধার। বেদের এই সার সিদ্ধান্ত যাহাদের হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহাদের পক্ষে বেদপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র। পরন্তু উক্ত বেদার্থ-পরিজ্ঞান ভগবদারাধনা ব্যতিরেকে কখনই সম্ভব হয় না। আবার ভগবদারাধনের অধিকার, বিনা দীক্ষায় সিদ্ধ হয় না। এইজন্যই ইতঃপূর্ব্বে উক্ত

হইয়াছে, অদীক্ষিত ব্যক্তি পশুর সমান।

অনেকে বলিয়া থাকেন—"দীক্ষা গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই। যজ্ঞোপবীত ধারণই প্রধান সংস্কার এবং গায়ত্রীই মূলমন্ত্র। অতএব উপবীত গ্রহণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলেই সমস্ত সিদ্ধ হইয়া যায়। বেদে যজ্ঞোপবীত ও গায়ত্রীর বিধান আছে, দীক্ষার বিধান নাই।"

যাঁহারা কখনও বেদ আলোচনা করেন নাই, তাঁহারা একথা বলিলে তত আশ্চর্য্যের বিষয় হয় না, পরন্তু যাঁহারা আপনাদিগকে বেদজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে এরূপ উক্তি অতীব আক্ষেপের বিষয়। বেদে দীক্ষা-প্রকরণ অতি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—যজুর্ব্বেদ—

দীক্ষাবিধি বৈদিক।

"ব্রতেন দীক্ষামাপ্নোতি দীক্ষয়াপ্নোতি দক্ষিণম্।
দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে॥" অঃ ১৯ মঃ ৩০।

অর্থাৎ গুরু সেবারূপ ব্রতদ্বারা মনুষ্য দীক্ষা প্রাপ্ত হয়, দীক্ষা হইতে দক্ষিণার প্রাপ্তি, দক্ষিণা দানেই শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা হইতেই সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"ঋতং বাব দীক্ষা, সত্যম্ দীক্ষা।
তস্মাদ্দীক্ষিতেন সত্যমেব বদিতব্যম্॥" ১।১।৬

অর্থাৎ দীক্ষাই ঋত, দীক্ষাই সত্য। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাদী হওয়া কর্ত্তব্য।

অধুনা দীক্ষা-মন্ত্রের অনেক বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কেহ রুদ্রমন্ত্রে, কেহ শক্তিমন্ত্রে, আরও কেহ কেহ অন্যান্য দেবতার মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ দীক্ষাকে প্রকৃত দীক্ষা বলা যায় না, দীক্ষাভাস মাত্র বলা যায়। যেহেতু বিষ্ণুই দীক্ষার দেবতা; সুতরাং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই দীক্ষা পূর্ণ হইয়া থাকে। ফলতঃ বৈষ্ণবী দীক্ষাতেই দীক্ষার পূর্ণতা সিদ্ধ হয় এবং ইহাই বেদ-সম্মত।

যথা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে—

"অগ্নিশ্চহবৈ বিষ্ণুশ্চ দেবানাং দীক্ষাপালৌ।
তৌ দীক্ষায়া ঈশাতে তদ্‌যদাগ্না বৈষ্ণবম্‌ হবির্ভবতি॥
যৌ দীক্ষায়া ঈশাতে তৌ প্রীতৌ দীক্ষাম্‌ প্রযচ্ছতাম্‌,
যৌ দিক্ষয়িতারৌ তৌ দীক্ষয়েতাং॥" ২।১।৪ খণ্ডে

অর্থাৎ অগ্নি এবং বিষ্ণু দেবতাগণের দীক্ষাপালক। এই দেবতাদ্বয়ই দীক্ষার ঈশ্বর। এই কারণে, আগ্না-বৈষ্ণব হবি হয়। যাঁহারা দীক্ষার স্বামী হইবেন, তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া দীক্ষা দান করিবেন। দীক্ষাদান-যোগ্য ব্যক্তিই দীক্ষাদান করিবেন। এই শ্রৌতপ্রমাণ অনুসারে সিদ্ধ হইল যে, অগ্নি ও বিষ্ণুই দীক্ষার স্বামী।

<u>বিষ্ণুই দীক্ষার স্বামী</u>

অগ্নি হইতে দীক্ষার আরম্ভ অর্থাৎ হোমক্রিয়ার আরম্ভ হইয়া বিষ্ণু-মন্ত্রগ্রহণেই দীক্ষার পরিসমাপ্তি হয়। আবার বিষ্ণুই যে সর্ব্বোত্তম দেবতা, এবং সর্ব্বদেবময়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে এই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, বৈদিক বিধান অনুসারে বৈষ্ণবী দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। যেহেতু বেদ, বিষ্ণুকেই দীক্ষার স্বামী কহিয়াছেন। আরও বিষ্ণুর পর যখন অন্য কোন দেবতা নাই, তখন বিষ্ণু-মন্ত্র গ্রহণ রূপ দীক্ষা-সংস্কারের উপরও আর কোন সংস্কার নাই, এবং এক বিষ্ণু-পূজাতেই সমস্ত দেবতার পূজা সিদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুপূজকের অর্থাৎ বৈষ্ণবের আর অন্য কোন দেবতার পূজার প্রয়োজন হয় না। শ্রুতি বলেন—"বিষ্ণু সর্ব্বা দেবতাঃ।" অর্থাৎ বিষ্ণু সকলেরই দেবতা। অতএব বিষ্ণু-পূজা করিলে সকল দেবতারই সন্তোষ সাধিত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—

"যথা তরোর্ম্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়ানাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥" ৪।৩১।১৪

অর্থাৎ তরু-মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার কাণ্ড শাখা প্রশাখা পর্য্যন্ত প্রফুল্ল হইয়া থাকে, অন্নাহার করিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিপুষ্টি ও স্ফূর্ত্তি সাধিত হয় সেইরূপ একমাত্র অচ্যুত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলেই সকল দেবতারই তৃপ্তি হইয়া থাকে।

এই কারণেই দীক্ষিত ব্যক্তি বৈষ্ণব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাগ্রহণান্তর সর্ব্বদেবময় বিষ্ণুকে আপন প্রভু স্বীকার করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। দীক্ষিত ব্যক্তির মন্ত্র-দেবতার পূজা করা নিত্য কর্ত্তব্য। যথা, আগমে—

"লব্ধা মন্ত্রস্ত যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্র-দেবতাং।
সর্ব্বকর্ম্মফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্র লাভ পূর্ব্বক প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চ্চনা না করেন তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্র-দেবতা তাঁহার অনিষ্ট সাধন করেন।

অতএব দীক্ষাগ্রহণ যে সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার দীক্ষিত ব্যক্তি যে "বৈষ্ণব" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট বিবৃত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

"বৈষ্ণবো ভবতি বিষ্ণু বৈঁ যজ্ঞ স্বয়মেবৈনং
তদ্দেবতয়া স্বেন চ্ছন্দসা সমৰ্দ্ধয়তি॥"

১ পঞ্জিকা, ৩অ, ৪র্থ খণ্ড।

যে ব্যক্তি বিষ্ণু দীক্ষাগ্রহণ করেন, সে ব্যক্তি "বৈষ্ণব" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যজ্ঞই বিষ্ণুর নাম। বিষ্ণু-দেবতা স্বয়ং স্বতন্ত্র রূপে সেই পুরুষের (যাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং যিনি বৈষ্ণব হন তাঁহাদের) বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের দ্বিতীয় বিলাসে

বিষ্ণু-যামলের এই বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

" অতো গুরুং প্রণম্যৈবং সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্ণীয়াদ্বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষা পূর্ব্বং বিধানতঃ॥"

অতএব গুরুদেবকে প্রণাম কর। আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুচরণারবিন্দে সমর্পণ কর এবং দীক্ষাপূর্ব্বক যথাবিধি বৈষ্ণব গ্রহণ কর। দীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি। যথা—

দীক্ষা শব্দের ব্যুৎপত্তি।

" দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ং।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥"

অর্থাৎ যাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং পাপক্ষালন করে, সেই প্রকরণকে তত্ত্বজ্ঞ দেশিকগণ দীক্ষা বলিয়া থাকেন।

বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিয়া যিনি "বৈষ্ণব" সংজ্ঞা লাভ করেন অর্থাৎ যিনি ধর্ম্মে বৈষ্ণব, কর্ম্মে বৈষ্ণব, এমন কি জাতি-পরিচয়েও বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাতে জাতিভেদ বা জাতিবুদ্ধি থাকিতে পারে না। সকল বৈষ্ণবই তখন এক স্বতন্ত্র বৈষ্ণবজাতিতে পরিণত হয়েন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বিটশূদ্রা শ্চতস্রো জাতয়ো যথা।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা॥" ব্রহ্মখণ্ড ১১।৪৩।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতি; কিন্তু জগতে বৈষ্ণব নামে এক জাতি আছে, তাহা এই চারি জাতির অন্তর্গত নহে—স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। পরন্তু চারি-বর্ণের-উপরিচর।

তাদৃশ বৈষ্ণবের জাতিভেদ বা জাতি বুদ্ধি করা শাস্ত্রে ঘোর অপরাধজনক কীর্ত্তিত হইয়াছে। যথা ইতিহাস-সমুচ্চয়ে—

বৈষ্ণব স্বতন্ত্র জাতি।

" শূদ্রম্বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব শূদ্র, চণ্ডাল বা শ্বপচ যে কোন হীন কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও তাহাকে সামান্যজাতি রূপে, বা অন্য শূদ্রাদি যেরূপ, ইনিও সেইরূপ ইত্যাদি সমানজাতি রূপে দর্শন করিলে নিশ্চয় নরকগামী হইতে হয়।

অতএব বৈষ্ণব যে-সে কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও বিষ্ণু-দীক্ষা প্রভাবে ও বৈষ্ণব-সদাচার পালনে তাঁহার শূদ্রাদি জাতিদোষ বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন তিনি ভাগবত বা বৈষ্ণব জাতিতে উন্নীত হন। পদ্মপুরাণে, ভগবদ্ব্রহ্মসংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা স্তে তু ভাগবতাঃ মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণ শূদ্র নহেন, তাঁহারা ভাগবত নামে অভিহিত। যাহারা ভগবানের প্রতি ভক্তিমান না হয়, তাহারা যে কোন বর্ণ হউক না কেন, তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

বৈষ্ণব শূদ্র নহে।

আরও কথিত হইয়াছে—"অর্চ্চ্যেবিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি বৈষ্ণবে-জাতিবুদ্ধি * * * বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতর সমধির্যস্য বা নারকী সঃ।"

অর্থাৎ যে নরাধম শালগ্রামে শিলাবুদ্ধি, গুরুদেবে নরবুদ্ধি এবং বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করে, সে নারকী, সুতরাং প্রায়শ্চিত্তার্হ।

পুনশ্চ পদ্মপুরাণে মাঘ-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥"

অর্থাৎ ইহলোকে অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের সমান ও দর্শন করে না, কিন্তু বৈষ্ণব বর্ণবাহ্য হইলেও ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব শূদ্রাদি নীচ-কুলোৎপন্ন হইলেও তাহার সেই দুর্জাতিত্ব দীক্ষা ও ভক্তি

প্রভাবেই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

"ভক্ত পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপচান্নাপি সম্ভবাৎ ॥" শ্রীভাঃ ১১ স্কন্ধ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি পুনাতি।" অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ব্বক আমার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, সে চণ্ডালাদি জাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহার "বৈষ্ণব" বলিয়া সংজ্ঞা হয়, তিনি পূর্ব্বজাতিদোষ হইতে মুক্ত হইয়া দণ্ডীর ন্যায় অবশ্যই উৎকৃষ্ট জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—

"ইতি শ্রীপৃথুচরিতানুসারেণ যৎকিঞ্চিৎ।
জাতাবপ্যুত্তমত্বমেব মন্তব্যম্ ॥"

অর্থাৎ পৃথুরাজ অতি নীচকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহার আদেশ সর্ব্বত্র পালিত হইত। তিনি সপ্তদ্বীপের একছত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণকুল এবং অচ্যুত-গোত্র বৈষ্ণবগণের উপর তাহার কোন শাসন ছিল না।

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক-দণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ ॥" শ্রীভাঃ ৪।২১।১১।

এই শ্রীপৃথুচরিতানুসারে বিচার করিয়া দেখা যায়, যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, "বৈষ্ণব" আখ্যা লাভ করিলে জাতিতেও উত্তমত্ব লাভ করিবে, ইহাই মন্তব্য। অতঃপর তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় বাক্যের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্—যথা—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥"

শ্রীভাঃ ৭ম, স্কঃ। ১১ অঃ।

অর্থাৎ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণজ্ঞাপক যে সকল লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, যদি অন্য বর্ণেও সেই সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তবে তাহাকে সেই বর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

বর্ণ-নির্ণয়।

এই জন্যই বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণের বহু লক্ষণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় এবং বিষ্ণুদীক্ষা-প্রভাবে দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা সিদ্ধ হওয়ায় বৈষ্ণব, **ব্রাহ্মণ-সদৃশ বা "বৃত্ত-ব্রাহ্মণ।"** যথা—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃত তত্ত্বসাগর বচন।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা" অর্থাৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন কাংস্যও খনিজাত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুল্যতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেই যথাবিধানে বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ করিলে দ্বিজত্ব অর্থাৎ বিপ্রতা প্রাপ্ত হন। এস্থলে এই "বিপ্রতা প্রাপ্ত হন" বলায় বুঝিতে হইবে, বৈষ্ণবমাত্রেই তখন বেদপাঠে অধিকারী হন। যেহেতু, "বেদপাঠাদ্ ভবেদ্বিপ্রঃ" এই বচনই উক্ত বিপ্রশব্দের নিরুক্তি। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষাপ্রভাবে নরমাত্রই যে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বেদ পাঠে অধিকারী হইতে পারেন, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ কাশীখণ্ডে লিখিত আছে—

বৈষ্ণবের দ্বিজত্ব।

"অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুঃ॥"

অর্থাৎ ময়ূরধ্বজ প্রদেশে অন্ত্যজ জাতিও বৈষ্ণবীদীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন!

বৈষ্ণবের এই বিপ্র-তুল্য ব্যবহার দর্শন করিয়া অনেক কর্ম্মজড় ব্রাহ্মণাভিমানী স্মার্ত্তজন বৈষ্ণবকে ভ্রষ্টাচারী বলিয়া উপহাস ও নিন্দা করিয়া থাকেন। আরও বলিয়া থাকেন, বৈষ্ণব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানে না। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, বৈষ্ণবধর্ম্ম বেদ-প্রণিহিত ধর্ম্ম, সুতরাং বৈষ্ণবজন বেদানুসারেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা বেদ-বিরুদ্ধ কপোল-কল্পিত কোন বিধি-নিষেধের

অনুবর্ত্তী হয়েন না। অতএব বৈষ্ণবের বিপ্রতুল্যতা বেদ-মূলক। বেদ কোন বর্ণবিশেষকে উল্লেখ না করিয়া দীক্ষিত মাত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। যথা শতপথ ব্রাহ্মণে—

"তদ্বৈ বসন্ত এবাভ্যারভেত বসন্তো বৈ
ব্রাহ্মণস্যর্ত্তু য উ বৈ কশ্চ যজতে ব্রাহ্মণীভূয়ৈব
যজতে॥" ১৩ প্রপাঃ। অঃ ৪।১।১

বৈষ্ণবের দ্বিজত্ব বেদ-সিদ্ধ।

অর্থাৎ বসন্তেই আরম্ভ করা আবশ্যক। বসন্তই ব্রাহ্মণের ঋতু, যে কেহ যজন করিয়া থাকেন তিনিই ব্রাহ্মণ হইয়া যজন করেন।

ফাল্গুন চৈত্র মাসই বসন্ত ঋতু। এই দুই মাসই দীক্ষা গ্রহণের প্রশস্ত কাল। যথা শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে—২য়, বিঃধৃত—

"ফাল্গুনে সর্ব্ববশুত্ব মাচার্য্যোঃপরিকীর্ত্তিতঃ।" আগমে
"মন্ত্রারম্ভস্তু চৈত্রে স্যাৎ সমস্ত পুরুষার্থদঃ।" গৌতমীয়ে

ফলতঃ বসন্তকালই বৈষ্ণবীদীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভগবদ্ভজন আরম্ভ করিতে হয়, ইহাই বৈদিক বিধান। বেদ এইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে স্পষ্ট লিখিত আছে—

"যথৈতদ্‌ব্রাহ্মণস্য দীক্ষিতস্য ব্রাহ্মণো দীক্ষিষ্টেতি।
দীক্ষামাবেদয়ন্ত্যেব মেবৈতৎ ক্ষত্রিয়স্য॥" ৩।৪ অঃ।

অর্থাৎ যে প্রকার ব্রাহ্মণের দীক্ষা সময় "আমি অমুক ব্রাহ্মণ দীক্ষা লইতেছি" বলিয়া আবেদন করিতে হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়কেও "আমি অমুক ব্রাহ্মণ" বলিয়া আবেদন করিতে হয়।

এই শ্রুতির ভাষ্যে আপস্তম্ভ সূত্রের যে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত শ্রুতির অর্থ আরও স্পষ্টতর হইয়াছে। যথা—

"ব্রাহ্মণো বা এষ জায়তে যো দীক্ষতে তস্মাদ্রাজন্য
বৈশ্যৌ অপি ব্রাহ্মণ ইত্যেবাবেদয়তি॥"

অর্থাৎ যে দীক্ষা গ্রহণ করে, সে ব্রাহ্মণ হইয়া যায়। সুতরাং ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও দীক্ষা গ্রহণান্তর "ব্রাহ্মণ" বলিয়া আবেদন করিতে হইবে।

এই সকল বৈদিক বচনকে আশ্রয় করিয়াই পুরাণসমূহ বৈষ্ণবকে "দ্বিজাধিক" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যথা নারদীয়ে—

"শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিকঃ।"

অর্থাৎ হে রাজন্! বিষ্ণুভক্তিবিহীন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অপেক্ষা শ্বপচ কুলোৎপন্ন বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণবের মহিমা ও গৌরব অধিক।

এই জন্যই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের টীকায় লিখিয়াছেন—

"যতঃ শূদ্রেষন্ত্যজেষপি যে বৈষ্ণবা স্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে।"

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত।

অর্থাৎ শূদ্র কি অন্ত্যজ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণান্তর বৈষ্ণব-সদাচার পালন দ্বারা যদি "বৈষ্ণব" সংজ্ঞা লাভ হয়, তবে আর তাহাকে শূদ্রাদি নীচজাতি বলা যায় না। পরন্তু ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে তাঁহাদের বিপ্র-সাম্য সিদ্ধ হয়।

"কিন্তু ভগবদ্দীক্ষা প্রভাবেন শূদ্রাদীনামপি বিপ্র-সাম্যং সিদ্ধমেব।"

ফলতঃ যে ব্যক্তি দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনিই বিপ্রের ন্যায় শ্রীভগবৎ-যজন-যোগ্যতা লাভ করিয়া থাকেন।

এই বৈদিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন—

"অতএব বিপ্রৈঃ সহ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা।"

বৈষ্ণব বিপ্রতুল্য।

অর্থাৎ বৈষ্ণবকে বিপ্রের সহিত একত্র গণনা করিবে। যেহেতু হরিভক্তি-সুধোদয়ে শ্রীভগবদ্-ব্রহ্মসংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রা স্তথাষয়ং।
মদ্ভক্তাশ্চেতিবিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥"

অর্থাৎ তীর্থ, অশ্বত্থতরু, বৈষ্ণব এই পাঁচটী আমার তনু বলিয়া জানিবে।

শ্রীগোস্বামীপাদ শ্রীমদ্ভাগবতাদি হইতে আরও বহু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে—

" ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি।
কিঞ্চ, বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদিত্যাদি বচনৈরবৈষ্ণব
ব্রাহ্মণেভ্যো নীচজাতি-জাতানামপি বৈষ্ণবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং
নির্দ্দিশ্যতেতরাং।"

অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্রৌতপ্রমাণ ও তদনুগত পৌরাণিক বচন অনুসারে বুঝা যাইতেছে যে, জাতি পূজ্য নহে, গুণই পূজ্য। পরন্তু গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই বর্ণ নির্ণয় হইয়া থাকে। যথা—

" ন জাতি পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥"

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা। ২১ অঃ।

অর্থাৎ হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও যদি বৃত্তস্থ হয় অর্থাৎ যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদাচার পরায়ণ হয়, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞাত হয়েন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ বলিলে লোকে বুঝিয়া থাকেন, যাঁহার পিতা ব্রাহ্মণ জাতি এবং মাতা ব্রাহ্মণী তিনিই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের ঔরসে এবং ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাঁহার জন্ম হয় নাই, তিনি কিছুতেই ব্রাহ্মণ হইতে পারেন না। বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণজাতি বিষয়ে লোকের সাধারণ ধারণাই এইরূপ। কিন্তু বেদ-ধর্ম্মসংহিতা-পুরাণাদিতে ইহার বিপরীত বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ বিবৃত করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত ব্যতীত অন্যান্য সূক্তের যেখানেই ব্রাহ্মণশব্দ কোন ব্যক্তিকে বোধ করাইবার উদ্দেশে প্রযুক্ত হইয়াছে, সেইখানেই দেখিতে পাওয়া যায়

ব্রাহ্মণ শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি বিশেষকে বোধ না করাইয়া স্তুতিপাঠক ঋত্বিক-মাত্রকেই বোধ করাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন 'বিপ্র' শব্দের যে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাও কোন জাতি বিশেষকে বুঝায় না। উহার অর্থ মেধাবী বা বুদ্ধিমান্। পরন্তু ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের বর্ণোৎপত্তি-বোধক ঋকৃটি আলোচনা করিলে, চারি বর্ণের সৃষ্টি যে গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। ১১শ, ঋকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—

ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।

"যৎপুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহু কা উরুপাদা উচ্যতে॥"

১২শ, ঋকে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" ৮।৪।১৯।

প্রশ্ন হইতেছে—"যাঁহাকে পুরুষ বলিয়া বিধান করা হইল, তিনি কি প্রকার কল্পিত হয়েন? অর্থাৎ তিনি বাস্তবিক শরীরী নহেন, তবে কবিগণ কিরূপে তাঁহার শরীর কল্পনা করেন? তাঁহার মুখ কি? বাহুদ্বয় কি? উরু ও পাদদ্বয়ই বা কি?"

ইহারই উত্তরে বলা হইয়াছে—"ব্রাহ্মণকে তাঁহার মুখ স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছিল, ক্ষত্রিয়কে তাঁহার বাহুদ্বয় কল্পনা করা হইয়াছিল, বৈশ্য, সেই পুরুষের উরু কল্পিত হইয়াছিল এবং শূদ্রকে তাঁহার পদরূপে কল্পনা করা হইয়াছিল। যদিও শূদ্র সম্বন্ধে "পদ্ভ্যাং শূদ্র অজায়ত" অর্থাৎ পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল, স্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথাপি প্রশ্নে যখন "ব্যকল্পয়ন্" শব্দ রহিয়াছে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য যথাক্রমে তাঁহার মুখ, বাহু ও উরু রূপেই কল্পিত হইয়াছে, তখন পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনরূপ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

সে যাহা হউক, বৈদিক-কালে যে, কোন জাতিভেদ প্রথা ছিলনা, তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। জীব-সৃষ্টির পরে যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা সেইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। প্রথমতঃ মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণ বা জাতিগত কোন পার্থক্য ছিলনা—

চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

" ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্ব সৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১০।

অর্থাৎ আদিকালে কোন বর্ণ বা জাতিভেদ ছিলনা, জগৎ ব্রহ্মময় ছিল, সুতরাং মনুষ্যমাত্রেই দ্বিজ বা ব্রাহ্মণ নামে সমাখ্যাত ছিলেন। কেবল কর্ম্ম দ্বারাই বর্ণভেদ সূচিত হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে—

" দৈব্যো বৈ বর্ণো ব্রাহ্মণঃ আসুর্য্যো শূদ্রঃ।" ১২।৬।৭

অর্থাৎ দেবভাব হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণের ও আসুরভাব হইতে শূদ্রবর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে।

" অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রাঃ॥" ৩।২।

অর্থাৎ এই শূদ্র অসৎ-সম্ভূত।

অতএব সমাজের আদিম অবস্থায় মানবের স্বস্ব গুণ ও কর্ম্মের উচ্চনীচ অনুসারেই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছিল। জন্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। যাঁহারা সৎ—সদাচারী তাঁহারা আর্য্য বা ব্রাহ্মণ এবং যাঁহারা অসৎ বা অসদাচারী তাঁহারা অনার্য্য বা শূদ্র।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে—

" এক এব পুরা বেদ প্রণব সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেব নারায়ণো নান্য একাগ্নি বর্ণ এব চ॥" ৯।১৪।৪৮।

পুরাকালে সর্ব্ববাঙ্ময় প্রণব একমাত্র বেদ ছিলেন, এবং এক অগ্নি ও এক বর্ণ

বা জাতি ছিল। এই একবর্ণের নাম "হংস। যথা—"আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।" এই হংসবর্ণের নারায়ণ-পরায়ণত্ব হেতু সকলেই যে বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এই বেদ-প্রণীহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সাহায্যে যেমন সহজে ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়, সেরূপ আর কোন সাধনাতেই হয় না। উক্ত মৌলিক হংস বর্ণ হইতেই সমাজের সুশৃঙ্খলতা-সাধন ও অভাব পূরণ উদ্দেশে বিভিন্ন সময়ে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

"কামভোগ-প্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত-স্বধর্ম্মরক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ১৮৮।১১

অর্থাৎ যে সকল দ্বিজ রজগুণপ্রভাবে কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধ-পরতন্ত্র সাহসিক কর্ম্মে অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণধর্ম্ম ত্যাগ হেতু রক্তবর্ণ ক্ষত্রিয় হইলেন।

"গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্ নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥" ঐ।১২

যে সমুদয় দ্বিজ রজ ও তমগুণপ্রভাবে পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ হেতু পীতবর্ণ বৈশ্য হইলেন।

"হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥" ঐ।১৩

যে সকল দ্বিজ তমগুণপ্রভাবে হিংসা-পরতন্ত্র মিথ্যা-প্রিয়, লোভী ও শৌচ-পরিভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মের দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন।

এই জন্যই সমস্ত উপনিষদের সার ভাগ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন—

"চাতুর্ব্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" ৪।১৩।

"গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি।" আরও বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈর্গুণৈঃ॥" ১৮।৪১।

জীবমাত্রই ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাদের প্রত্যেকের ক্রিয়ারও পার্থক্য আছে। মনুষ্যের মধ্যেও উক্ত গুণত্রয়ের ইতর বিশেষ থাকাতে স্বভাবেরও অনেক প্রকার পার্থক্য আছে। তন্মধ্যে সাত্বিক-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ, রজঃ স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষত্রিয়, তম-স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শূদ্র এবং রজস্তম-গুণ-মিশ্রিত স্বভাবের ব্যক্তিগণ বৈশ্য। এই জন্যই ইহাদের পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম প্রবিভক্ত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত গীতা-বচনের ব্যাখ্যান্তর করিয়া বলেন যে, সৃষ্টির প্রথমে ভগবান্ চারিবর্ণের আত্মা চারি প্রকার করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণের আত্মা সত্বপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের রজঃপ্রধান. বৈশ্যের রজস্তমপ্রধান এবং শূদ্রের আত্মা তমঃ-প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তি ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। আত্মা গুণাতীত পদার্থ, গীতাতেই উল্লিখিত হইয়াছে। (১৩অঃ ১৯শ্লোঃ দ্রষ্টব্য) গুণাদি জীবের জন্মগত নহে, সাধনাদি উৎকৃষ্ট উপায় দ্বারা তাহাদের এই সকল গুণ লব্ধ হইয়া থাকে। এই সকল গুণ মনুষ্যের জন্মগত হইলে আর জ্ঞান প্রাপ্তির আবশ্যকতা উপলব্ধি হয় না। অতএব জাতি নির্বিশেষে যিনিই সত্বগুণসম্পন্ন হইবেন তিনিই প্রধান হইবেন—তিনিই ব্রাহ্মণ হইবেন। ইহাই সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান্ কথিত ভাগবত ধর্ম্ম। ফলতঃ যাঁহাতে যে বর্ণাভিব্যঞ্জক লক্ষণ দৃষ্ট হইবে, তিনি সেই বর্ণ বলিয়া সংজ্ঞিত হইবেন, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের মত—ইহাই উদার-প্রকৃতি আর্য্যঋষিগণের অভিপ্রায়।

কর্ম্মফলে দ্বিজগণ শূদ্রাদি বর্ণ প্রাপ্ত হইলেও তাঁহারা চিরকালই যে ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে বঞ্চিত থাকিবেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সত্বস্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া সত্বধর্ম্মকে আশ্রয় করিবেন, তিনি অবশ্যই জাত্যুৎকর্ষ লাভ করিবেন।

" ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্ম যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥" ১৮।১৪।

মহাভারত (শান্তিপর্ব্ব)।

অর্থাৎ এই সমস্ত কর্ম্ম দ্বারা দ্বিজগণ অন্যান্য বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধর্ম্ম ও যজ্ঞ-ক্রিয়া যে চিরকাল ইঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা নহে।

যিনি বেদবিহিত আচারাদির অনুষ্ঠান করেন এবং যাঁহাতে সত্ত্ব গুণের বিকাশ দৃষ্ট হয়, তিনি শূদ্র হইলেও তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। যথা—

" ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥"

বৃদ্ধ গৌতম সংহিতা, ২১ অঃ।

পুনশ্চ—

অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায় নিরতান্ শুচীন্।
উপবাসরতান্ দান্তাং স্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥ ঐ

অর্থাৎ ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে, আর সকলে শূদ্র। যাঁহারা অগ্নিহোত্রব্রত এবং স্বাধ্যায়-নিরত, শুচী, উপবাসরত ও দান্ত, দেবতাগণ তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। এই প্রকার মহাভারত বনপর্ব্ব, ২০৫ অধ্যায়েও উক্ত হইয়াছে।

মহাভারত বনপর্ব্বে, অজগর পর্ব্বাধ্যায়ে সর্পরূপী রাজা নহুষ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

" ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্ বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ।
ব্রুবীহ্যতিমতিং ত্বাং হি বাক্যৈরনুমিমামহে॥" ১৮০ অঃ।

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণ কে হইতে পারেন? এবং কোন্ বস্তু বেদ্য? ইহা তুমি বল, তোমার বাক্য শুনিয়া অনুমান হয়—তুমি বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী।

এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির কহিলেন—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥" ঐ

অর্থাৎ যাহাতে সত্যপরায়ণতা, দানশীলতা, ক্ষমাশীলতা, অনিষ্ঠুরতা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও দয়া এই কয়েকটী গুণ লক্ষিত হয়, হে সর্পরাজ! সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

অতএব এইসকল গুণবান্ ব্যক্তি যে-কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ব্রাহ্মণ হইতে পারেন কি না, এইরূপ মনে করিয়া সর্প আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"শূদ্রেম্বপি চ সত্যঞ্চ দানমক্রোধ এব চ।
আনৃশংস্য মহিংসা চ ঘৃণা চৈব যুধিষ্ঠির॥"

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! সত্য, দান, অক্রোধ, অনিষ্ঠুরতা, অহিংসা, প্রভৃতি গুণ শূদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং তাদৃশ শূদ্রকে কি ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন—

"শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥" ঐ

অর্থাৎ শূদ্রের যাহা চিহ্ন তাহা কথনই ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না। শূদ্র-জাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে শূদ্র হয় তাহাও নহে। এইরূপ ব্রাহ্মণজাতিতে জন্মগ্রহণ করিলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। হে সর্প! আমি যে কয়েকটী গুণের কথা বলিলাম, সেই গুণ কয়েকটী যদি শূদ্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। আর যদি ব্রাহ্মণ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াও কেহ ঐ সকল গুণের ভাজন না হয়, তাহা হইলে তাহাকেই শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

মহাভারতীয় অনুশাসন পর্ব্বে ১৪৩ অধ্যায়ে আরও বর্ণিত আছে—

"এভিস্তু কর্ম্মভি র্দ্দেবি শুভৈ রাচরিতৈ স্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্য ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥ ২৬॥

* * * * * *

এতৈঃ কর্ম্মফলৈ র্দ্দেবি ন্যূনজাতি কুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥ ৪৬॥
ব্রাহ্মণোঽপ্যসদ্‌বৃত্তঃ সর্ব্ব সঙ্কর ভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুৎস্বজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥ ৪৭॥
কর্ম্মভি শুচিভি র্দ্দেবি শুদ্ধাত্মা বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
শূদ্রোঽপি দ্বিজবৎ সেব্য ইতি ব্রহ্মানুশাসনং॥ ৪৮॥
স্বভাবং কর্ম্ম চ শুভং যত্র শূদ্রেণোঽপি তিষ্ঠতি।
বিশিষ্টঃ সদ্বিজাতে র্বৈ বিজ্ঞেয় ইতি মে মতিঃ॥ ৪৯॥
ন যোনি র্নাপি সংস্কারো ন শ্রুতঃ ন চ সন্ততিঃ!
কারণানি দ্বিজত্বস্য বৃত্ত মেব তু কারণম্॥ ৫০॥
সর্ব্বোভয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন চ বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি॥ ৫১॥
ব্রহ্মস্বভাব কল্যাণি সমঃ সর্ব্বত্র মে মতিঃ।
নির্গুণং নির্ম্মলং ব্রহ্ম যত্র তিষ্ঠতি স দ্বিজঃ॥ ৫২॥

* * * * * *

এতত্তে গুহ্যমাখ্যাতং যথা শূদ্রো ভবেদ্দ্বিজঃ।
ব্রাহ্মণো বা চ্যুতোধর্ম্মাৎ যথা শূদ্রত্বমাপ্নুতে॥ ৫৩॥

হে দেবি! শূদ্র এই সকল শুভকর্ম্ম ও শুভ আচরণ করিলে ব্রাহ্মণ হয়েন এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের আচরণ করিলে ক্ষত্রিয় হয়েন। হীন কুলোদ্ভব শূদ্র এই সকল কর্ম্ম করিলে আগম-সম্পন্ন সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ হয়েন। ব্রাহ্মণ অসদাচারী ও সর্ব্ব

সঙ্কর-ভোজনকারী হইলে ব্রাহ্মণ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক শূদ্র হয়েন। শুদ্ধ কর্ম্ম দ্বারা শূদ্র শুদ্ধাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় হইলে ব্রাহ্মণের ন্যায় পূজনীয় হন, ইহাই ব্রহ্মের অনুশাসন। শূদ্রসন্তান যদি শুভকর্ম্মবিশিষ্ট ও সৎস্বভাব হয়েন, তবে তিনি দ্বিজাধিক হয়েন, ইহাই আমার অভিপ্রায়। উত্তমকুলে জন্ম, সংস্কার, বেদপাঠ ও উত্তমের সন্তান দ্বিজত্বের কারণ নহে, স্বভাবই কারণ। সুতরাং স্বভাবের দ্বারাই সকলে ব্রাহ্মণ হয়। শূদ্র সচ্চরিত্র হইলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মের স্বভাব সর্ব্বত্রই সমান। অতএব নির্গুণ নির্ম্মল ব্রহ্ম যাঁহার হৃদয়ে আছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যে প্রকারে শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়েন এবং ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে শূদ্র হয়েন, সেই গুহ্যবাক্য তোমাকে বলিলাম।

এই সকল শ্রুতি-মূলক পুরাণ ইতিহাসের প্রমাণ অনুসারেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এই শ্রুতি-সম্মত উদার মতের পোষণ করিয়া শ্রীভগবৎ-জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন এবং সেই ভগবৎ-জ্ঞানীকেই উপাসনাদি কার্য্যের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। যে কোন কুলে জন্ম হউক না কেন, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইলেই তিনি ব্রাহ্মণ-তুল্য হইবেন। ফলতঃ যাঁহাতে ব্রাহ্মণের লক্ষণাদি দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ। কেবল যজ্ঞোপবীতধারী ভগবৎ-জ্ঞানবর্জ্জিত ব্যক্তি কদাচ ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইতে পারেন না তদপেক্ষা হীন কুলোৎপন্ন ভগবদ্ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

বৈষ্ণব কোন বর্ণ

সৃষ্টির আদিতে বৈষ্ণব বর্ণই প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল—শ্রীসনক, সনাতনাদি, শ্রীনারদ প্রভৃতি। আর সত্যযুগেও বর্ণভেদ ছিল না—একবর্ণ ছিল, নাম হংস—পরমহংস—বৈষ্ণব। এই বৈষ্ণব স্বতন্ত্র বর্ণ—স্বাধীন—নিজের দ্বারাই নিজে শাসিত ও পরিচালিত। এই বৈরাগ্য-ধর্ম্মাবলম্বী বৈষ্ণবগণের দ্বারা সৃষ্টিধারা সুচারুরূপে প্রবাহিত না হওয়ায় ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিলেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের অধীনে ও শাসনে আরও তিনটী বর্ণের সৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই চারিবর্ণ হইতে গুণ-কর্ম্মের তারতম্যানুসারে ও অনুলোম বিলোম মিশ্রণের ফলে এক্ষণে বহুতর জাতির উদ্ভব হইয়াছে। যত জাতিরই উৎপত্তি হউক না কেন তাহারা সকলেই অধিকার ও আচার ভেদে উক্ত চারিবর্ণেরই অন্তর্গত।

বৈষ্ণবের সহিত ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের যতই মিশ্রণ হউক না কেন—বৈষ্ণব—একজাতি। কেবল অধিকারী ও আচার ভেদে শ্রেণীভেদ মাত্র। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শাসক ও পরিচালক—বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ নহেন। কেন না ব্রাহ্মণ জ্ঞানী, বৈষ্ণব ভক্ত। এই যে জ্ঞানী ও ভক্ত,—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব এদু'টী চির স্বতন্ত্র—চির স্বাধীন। বেদাদি শাস্ত্র হইতে পুরাণ তন্ত্র আধুনিক সংগ্রহ-স্মৃতি (রঘুনন্দনের স্মৃতি) পর্য্যন্ত শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব দুইটী বর্ণের বা দুইটী জাতির বা দুইটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের পার্থক্য—গঙ্গা-যমুনা-প্রবাহের ন্যায় একস্থান হইতে উদ্ভূত হইয়া ঠিক পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। অনন্তকাল হইতে এ দুয়ের প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। কেহ, কাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। তবে পারমার্থিক মাহাত্ম্যে—তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবত্বেরই অধিক গৌরব ঘোষিত হইয়াছে। কারণ বৈষ্ণবত্ব লাভই মানবধর্ম্মের চরম পরিণতি। বৈষ্ণবই আদিবর্ণ তত্ত্ব। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও বৈষ্ণব—পদ্মযোনি। মহাদেবের ত কথাই নাই—তিনি হরিনামে পাগল ভোলা।—"বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ।"

বৈষ্ণব—শুভ্রবর্ণ—কৃষ্ণ-রক্ত-নীল-পীতাদি সপ্তবর্ণের একত্র সংমিলনের ফলই শুভ্রবর্ণ; শুভ্রবর্ণকে বিশ্লেষণ করিলে যেমন সপ্তবর্ণ পৃথক দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বৈষ্ণব এই শুভ্রবর্ণের মধ্যেও ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণই আছে। কেননা, মূলে বৈষ্ণবত্ব হইতেই ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের পৃথক সত্তা বিকসিত হইয়াছে। নারদ, কপিল, শাণ্ডিল্যাদি আদি বৈষ্ণব। দক্ষ, ভৃগু, কশ্যপাদি আদি ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-ধারা চির-স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান আছে। ব্রাহ্মণ বর্ণ যেমন ব্রাহ্মণ জাতি হইয়াছেন, সেইরূপ বৈষ্ণব বর্ণও বৈষ্ণব জাতিতে পরিণত। ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেও যেমন বহু মিশ্রণ (ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যে নহে) দোষ আছে—বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বহু মিশ্রণ দোষ বিদ্যমান। এস্থলে বাউল নেড়ানেড়ী দরবেশাদি বৈষ্ণব নামধারী তান্ত্রিক বামাচারিদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। গৃহস্থ বৈষ্ণবজাতির কথাই, বিশেষতঃ গৌড়াদ্য বৈদিক-বৈষ্ণবদের লক্ষ্য করিয়াই এই কথার অবতারণা করা হইয়াছে। বৈষ্ণব,

যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় একটী স্বতন্ত্র মূলবর্ণ না হইবেন, তবে শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিবেন কেন ?—

"তীর্থান্যশ্বত্থতরবো গাবো বিপ্রা স্তথাব্যয়ং।
মদ্ভক্তাশ্চেতি বিজ্ঞেয়াঃ পঞ্চৈতে তনবো মম॥"

হরিভক্তি-সুধোদয়।

তীর্থ, অশ্বত্থতরু, গো, বিপ্র ও বৈষ্ণব এই পাঁচটী আমার তনু।

সংখ্যা-বাচক শব্দ সমান জাতিতেই প্রযুক্ত হয়। অতএব ব্রাহ্মণ যেমন ভাগবতী তনু বৈষ্ণবও সেইরূপ ভাগবতী তনু।

আবার শ্রীভাগবতে শ্রীপৃথু মহারাজ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র শাসনে মুঞি হই দণ্ডধৃক।
বিনে যে অচ্যুতগোত্র বৈষ্ণব সর্ব্বাধিক॥
"অন্যত্র ব্রাহ্মণ কুলাদন্যত্রাচ্যুত-গোত্রতঃ।"
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব স্থানে সাবধান হৈতে।
পূর্ব্বাপর কহে শাস্ত্রে দুই স্বতন্ত্রেতে॥
বিপ্র কহি পুনশ্চ বৈষ্ণব কহি যবে।
ইহাতে বুঝহ অন্যবর্ণ যে বৈষ্ণবে॥
পণ্ডিত যে হবে ইহা বুঝহ বিচারি।
মূর্খ কুতার্কিকগণ নহে অধিকারী॥"

শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব আমারই দেহ স্বরূপ উঁহাদের পূজা করিলে আমারই পূজা করা হইবে।

"সূর্য্যোঽগ্নির্ব্রাহ্মণা গাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলম্।
ভূরাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপদানি মে॥ শ্রীভা ১১।১১

হে ভদ্র! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, ভূমি, আত্মা ও নিখিলপ্রাণী এই একাদশটী আমার পূজার উৎকৃষ্ট অধিষ্ঠান।

অতএব এই সকল প্রমাণে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈষ্ণবও একটী অনাদি-সিদ্ধ স্বতন্ত্র বর্ণ। ব্রাহ্মণ বর্ণাশ্রম-আচার-পরায়ণ কর্ম্মজ্ঞাননিষ্ঠ ব্রহ্মবাদী। বৈষ্ণব ভক্তি-অনুকূল আশ্রম-আচার-পরায়ণ শুষ্ক-কর্ম্মজ্ঞান-বর্জ্জিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভজন-নিষ্ঠ-শুদ্ধাভক্তিবাদী। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ শুদ্ধা-ভক্তিনিষ্ঠ হইলেই—ভক্তির অমৃত-প্রবাহে তাঁহার শুষ্ক কর্ম্মজ্ঞান মিশিয়া গেলে—ব্রহ্মজ্ঞান প্রেমভক্তিপ্রবাহে মূর্চ্ছিত হইয়া ডুবিয়া গেলে ব্রাহ্মণাভিমান থাকে না, বৈষ্ণবাভিমান দৈন্যতা-মণ্ডিত হইয়া ভাসিয়া উঠে। ছোট বড় ভেদ জ্ঞান থাকে না একটী বিশ্বজনীন সাম্যভাব উদারতার মধ্য দিয়া—বিশ্বমানবের হৃদয়ে সজীব আনন্দের স্পর্শ স্পন্দন উঠায়। আপনার মহত্বকে ছোট ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে ছোটকেও নিখিলের মধ্যে বড় করিয়া তুলে। ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না,—আপনার মহত্বকে ছোট করিতে পারে না। সকলের উপর নিজের শাসন-শক্তি ছড়িয়ে দিয়ে নিজের মহত্বে বড় হ'য়ে থাকতে ভালবাসেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবে ইহাই প্রভেদ। ব্রাহ্মণ চান—সকলকে ছোট ক'রে নিজে বড় হয়ে থাক্‌তে। বৈষ্ণব চান্ নিজেকে ছোট ক'রে ছোটর সঙ্গে মিশে, ছোটর মহত্ব বাড়াতে "অমানিনা মানদেন।" বৈষ্ণবের এইখানেই বৈষ্ণবত্ব—মহত্ব। বৈষ্ণব বিশ্ব-মানবতার আদর্শ মূর্ত্তি। বৈষ্ণব চান্, বিশ্ব-প্রাণকে একই ধর্ম্মসূত্রে গাঁথিয়া সকলকেই আপনার মত করিতে। ব্রাহ্মণ চান্ বর্ণাশ্রমের দৃঢ়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া নিজেদের স্বার্থের অধীনে সকলকে বিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিতে।—শাস্ত্রে সদাচারে জ্ঞানে বঞ্চিত করিয়া রাখিতে—সকলকে শূদ্র করিয়া রাখিতে "যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এবহি।" অথচ নিজেরা (সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ-লক্ষণ বর্জ্জিত হইলেও) ব্রাহ্মণই থাকিবেন। "অনাচারী দ্বিজঃপূজ্যঃ নচ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।" এইখানেই উদারতার সঙ্কোচ।

"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ হইয়া যান। "বিষ্ণুবিদ্ বৈষ্ণবো ভবতি" বিষ্ণুবিদ্ ভক্তজনও বৈষ্ণব হইয়া যান। ব্রহ্মার সৃষ্ট ব্রাহ্মণ হইলে, বৈষ্ণবও ব্রহ্মার সৃষ্ট বৈষ্ণবও ব্রাহ্মণ—বৃত্ত-ব্রাহ্মণ—বর্ণ-ব্রাহ্মণ নহেন। বৈষ্ণব

ব্রাহ্মণশাসিত বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নহেন। স্বাধীন স্বতন্ত্র বর্ণ। "স্বতন্ত্রা এক জাতি তু বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা।" যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদি কর্ম্মে কি সদাচারে কি শাস্ত্র-বিচারে বৈষ্ণব কোন অংশে ব্রাহ্মণাপেক্ষা ন্যূন নহেন, বরং পারমার্থিক ব্যাপারে—বৈষ্ণবের মহিমা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক অধিক। তাই, ব্রাহ্মণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্য শাস্ত্রের উপদেশ আছে। কারণ,—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।" শ্রীভা ৭।৯।৯

কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশগুণযুক্ত বিপ্র অপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ। এইজন্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তি-বিলাসের টীকায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন —"ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিদ্ধতি।"

কোন প্রচ্ছন্ন বর্ণের জাতি-নির্ণয় করিতে হইলে, তাহার কর্ম্ম ও আচার দেখিয়াই নির্ণয় করিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। যথা—

"প্রচ্ছন্না বা প্রকাশ্যা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ।" মনু ১০।৪০

জাতি প্রচ্ছন্নই থাকুক বা প্রকাশিতই থাকুক, বর্ত্তমান কর্ম্ম দ্বারাই তাহা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য।

মনু বলিয়াছেন—

"বর্ণাপেতমবিজ্ঞাতং নরং কলুষযোনিজং।
আর্য্য রূপ মিবানার্য্যং কর্ম্মভিঃ স্বে র্বিভাবয়েৎ॥ ১০।৫৭

যদি কোন বর্ণ সংস্কার হইতে পরিভ্রষ্ট, অজ্ঞাত কুলশীল, নিকৃষ্ট জাতি হইতে উৎপন্ন অনার্য্য ব্যক্তি হয় এবং আপনাকে আর্য্যরূপে পরিচয় দেয়, তাহা হইলে তাহার কর্ম্ম বা ব্যবসায় দেখিয়া তাহার বর্ণ বা জাতি নির্ণয় করিবে। তাই, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশ-খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"কর্ম্মণা ব্রাহ্মণো জাতঃ করোতি ব্রহ্মভাবনাম্।
স্বধর্ম্ম নিরতঃ শুদ্ধ স্তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়। যিনি সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করেন, যিনি স্বধর্ম্মনিরত ও শুদ্ধ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এই বিধান অনুসারেই, বৈষ্ণবের কর্ম্ম ও আচরণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে বলিয়া, বরং কোন কোন বিষয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বলিয়া শ্রীপাদ্ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বৈষ্ণবগণেক বিপ্রের সমতুল্য কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে ;—

"জাতকর্ম্মাদিভি র্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দান মথাদ্রোহ আনৃশংস্যং ত্রপা ঘৃণা।
তপস্তু দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড।

যিনি জাত-কর্ম্মাদি সংস্কার দ্বারা শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নে রত হইয়া প্রতিদিন ষট্‌কর্ম্ম অর্থাৎ সন্ধ্যা, বন্দনা, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথি-সৎকার করেন, যিনি শৌচাচারে থাকেন, দেবতার প্রসাদ ভোজন করেন, গুরুপ্রিয় হয়েন, এবং যিনি ব্রতনিষ্ঠ ও সত্যপর হয়েন তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলে। যাঁহাতে সত্য, দান, অদ্রোহ, অনৃশংসতা, ঘৃণা ও তপ দৃষ্ট হয় তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

এই ব্রাহ্মণাচারের সহিত বৈষ্ণবজনের কর্ম্ম ও আচরণের তুলনা করিলে সর্ব্বৈব সামঞ্জস্য লক্ষিত হইবে, পরন্তু কোন কোন বিষয়ে বৈষ্ণবের লক্ষণ উৎকৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইবে। নতুবা ব্রাহ্মণকেও বৈষ্ণব হইবার জন্য শাস্ত্রে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিবেন কেন? অতএব বৈষ্ণবত্ব লাভই যে মানবজীবনের চরম উৎকর্ষ—বৈষ্ণবত্বই যে চাতুর্ব্বর্ণ্যের চরম লক্ষ্য ও নিত্য বাঞ্ছনীয় তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চারিবর্ণের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকেও বৈষ্ণব হইবার জন্য শ্রীভগবান্ আদেশ করিয়াছেন।

যথা—

" বৈষ্ণবেষু গুণাঃ সর্ব্বে দোষ লেশো ন বিদ্যতে।
তস্মাচ্চতুর্ম্মুখ ত্বঞ্চ বৈষ্ণবো ভব সাম্প্রতম্ ॥"

পাদ্মে, ক্রিয়াযোগসারে।

অর্থাৎ বৈষ্ণবের গুণই সব, বৈষ্ণবে দোষের লেশমাত্র নাই। অতএব হে চতুরানন! তুমি সম্প্রতি বৈষ্ণব হও।

এই জন্যই বৈষ্ণব-মহিমা শাস্ত্রে ভূরি ভূরি কীর্ত্তিত হইয়াছে। "শ্রীবৈষ্ণব গীতার" কয়েকটী প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। তদ্ যথা—

" কৈবল্যদায়িনী গীতা শ্রীবৈষ্ণব-গীতাভিধা।
শৃণুষ্ব পরয়া ভক্ত্যা ভববন্ধ-বিমুক্তয়ে॥
বৈষ্ণবানাং গতির্যত্র পাদস্পর্শশ্চ যত্র বৈ।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি তিষ্ঠন্তি নৃপসত্তম॥
আলাপং গাত্র সংস্পর্শং পাদাভিবন্দনং তথা।
বাঞ্ছন্তি সর্ব্বতীর্থানি বৈষ্ণবানাং সদৈব হি॥
বিষ্ণু মন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং শুভং।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি ভূপতে॥

শ্রীনারদঋষি, মহারাজ অম্বরীষকে কহিলেন—

রাজন্! শ্রীবৈষ্ণবগীতা নাম্নী গীতাই কৈবল্যদায়িনী; তুমি ভববন্ধ-মোচনার্থ পরমাভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ কর। হে নৃপসত্তম! যে স্থানে বৈষ্ণবেরা গমন করেন, যে স্থানে তাঁহাদের পাদস্পর্শ হয়, সেই সেই স্থানেই সর্ব্বতীর্থ অবস্থান করেন। কেননা, বৈষ্ণবদিগের সহিত আলাপ করিতে, তাঁহাদের গাত্র স্পর্শ করিতে এবং তাঁহাদের পাদাভিবন্দন করিতে সর্ব্বতীর্থ সর্ব্বদা বাঞ্ছা করিয়া থাকে। বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকদিগের শুভপ্রদ পবিত্র পাদোদক সর্ব্বতীর্থ ও বসুধাকেও পবিত্র করে।"

এই জন্য " তুলসী গীতাতেও উক্ত হইয়াছে—

" ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনং।

তৎ শ্মশান সমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ॥"

যে স্থানে ফলবতী আমলকী বৃক্ষ নাই, যে স্থানে শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহ বা শ্রীতুলসী কানন দৃষ্ট হয় না এবং যে স্থানে বৈষ্ণবগণ অবস্থিতি না করেন সেস্থান শ্মশান সদৃশ।

এইরূপ বৈষ্ণবমাহাত্ম্য দর্শনে কেহ কেহ অসূয়া-পরবশ হইয়া বলিয়া থাকেন—বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী গায়ত্রী মন্ত্র জাপকাদি হেতু ব্রাহ্মণই আদি বৈষ্ণব। সুতরাং ব্রাহ্মণ মাত্রেই বৈষ্ণব। আমরা এ বাক্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। কারণ শাস্ত্রে দেখিতে পাই—

" ব্রাহ্মণাঃ শাক্তিকাঃ সর্ব্বে ন শৈবা নচ বৈষ্ণবাঃ।

যত উপাসতে দেবীং গায়ত্রী বেদমাতরং॥

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত মনুস্মৃতি।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রেই শাক্তিক, তাঁহারা শৈবও নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। যেহতু, তাঁহারা বেদমাতা গায়ত্রীর উপাসনা করিয়া থাকেন।

বিশেষতঃ গায়ত্রী-গ্রহণমাত্রেই যদি ব্রাহ্মণের বৈষ্ণবত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সকলেই বৈষ্ণব ; কারণ, সকলেই গায়ত্রী মন্ত্রগ্রহণ করিয়া থাকেন। অপিচ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কংস ও জরাসন্ধ প্রভৃতি বিষ্ণু বিদ্বেষিগণও ত বৈষ্ণব ? তবে কি, বিষ্ণু-বিরোধীকেও বৈষ্ণব বলিতে পারা যায় ? তাহা হইলে কপিল, চার্ব্বাক, বৃহস্পতি, ঔলুক্য প্রভৃতি নাস্তিকগণকেও বৈষ্ণব বলিয়া গুরুত্বে স্বীকার করিতে পারা যায়। যেহেতু, ইহাঁরা সকলেই গায়ত্রীমন্ত্র-জাপক। সুতরাং কেবল গায়ত্রী মন্ত্রগ্রহণেই বৈষ্ণবতা সিদ্ধ হয় না।

অতএব ব্রাহ্মণ 'আদি বৈষ্ণব' 'নহেন' আদি শাক্তেয়। তবে যখন যে সাম্প্রদায়িক মন্ত্রকে আশ্রয় করেন, তখন তিনি শৈব, শাক্ত বা বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন।

সাধনতত্ত্বেও দেখিতে পাওয়া যায়, শান্তরতির ফলেই ব্রাহ্মণত্ব এবং শান্তিরতির উপরে দাস্যরতির ফলেই বৈষ্ণবত্ব বা দাস্য ; ব্রাহ্মণ জ্ঞাননিষ্ঠ, বৈষ্ণব ভক্তিনিষ্ঠ। অতএব ব্রাহ্মণত্ব ও বৈষ্ণবত্ব এক পদার্থ নহে। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব যদি পৃথক্ ধর্ম্মশীল না হইতেন অর্থাৎ ব্রাহ্মণই বৈষ্ণব হইতেন তাহা হইলে শাস্ত্রে "বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" ও "অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ" এরূপ উল্লিখিত হইত না এবং ব্রাহ্মণ মহিমা ও বৈষ্ণবমহিমা পৃথকভাবে বর্ণিত থাকিত না। এক ব্রাহ্মণ মহিমা বর্ণনেই বৈষ্ণব মহিমা বর্ণন সিদ্ধ হইয়া যাইত। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের পৃথকত্ব প্রতিপাদক দুই একটী প্রমাণ ইতঃপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। পুনরায় এস্থলে দেখাইতেছি—

"অশ্বত্থ তুলসী ধাত্রী গোভূমিসুর বৈষ্ণবাঃ।
পূজিতা নমিতা ধ্যাতা ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘং॥

সূর্য্যোঽগ্নি ব্রাহ্মণো গাবো বৈষ্ণবাঃ খং মরুজ্জলং।
ভূবাত্মা সর্ব্বভূতানি ভদ্র পূজাপ্রদানি মে॥" শ্রীভা ১১।১১

আবার শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব মহিমা কেমন সামঞ্জস্যরূপে বর্ণিত আছে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

ব্রাহ্মণের অঙ্গে সমস্ত তীর্থাদি অবস্থান করেন। যথা—

"ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদা করে হরিঃ।
গাত্রে তীর্থাণি যাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতি স্ত্রিবৃৎ॥"

বহ্নীপুরাণ।

বৈষ্ণবের সম্বন্ধেও বর্ণিত আছে—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি পুণ্যান্যপি চ জাহ্নবি।
মদ্ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে॥

আবার ব্রাহ্মণকেই দান করিতে হইবে, এইরূপ বর্ণিত আছে—

" সর্ব্বেসামেব বর্ণানাং ব্রাহ্মণঃ পরমো গুরুঃ।
তস্মৈঃ দানানি দেয়ানি ভক্তিশ্রদ্ধা সমন্বিতৈঃ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ।

বৈষ্ণব সম্বন্ধেও উক্ত হইয়াছে—

ন মে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

ইতিহাস সমুচ্চয়।

বরং দান বিষয়ে ব্রাহ্মণাপেক্ষা বৈষ্ণবকে অধিক সম্মান দেওয়া আছে। যথা, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্রে—

" মূর্ত্তিপানান্তু দাতব্যা দেশিকার্দ্ধেন দক্ষিণা।
তদর্দ্ধং বৈষ্ণবানান্তু তদর্দ্ধং তদ্দ্বিজন্মনাং॥"

তারপর অনাচারী ব্রাহ্মণ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষাও পূজ্য, এরূপ উক্ত হইয়াছে—

" অনাচারা দ্বিজা পূজ্যাঃ ন চ শূদ্রাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ।
অভক্ষ্য ভক্ষকা গাবঃ কোলাঃ সমুতয়ঃ ন চ॥"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

এস্থলে অনাচারী দ্বিজ জিতেন্দ্রিয় শূদ্র অপেক্ষা পূজ্য; কিন্তু শূদ্রোদ্ভব বৈষ্ণব হইতে পূজ্য নহে, ইহাই তাৎপর্য্য। কারণ, বৈষ্ণব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—

" হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণঃ।
কুবৃত্তো বা সুবৃত্তো বা তেষাং নিত্যং নমোনমঃ॥"

অর্থাৎ বৈষ্ণব সুবৃত্ত হউন কি দুর্ব্বৃত্তই হউন, বৈষ্ণব নিত্য পূজনীয়। এইরূপ ভাবে সমস্ত পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে ব্রাহ্মণ মহিমার সহিত বৈষ্ণব মহিমার তুলনা প্রদর্শন করিতে গেলে রামায়ণ মহাভারতের ন্যায় একটী পুস্তক হইয়া যাইবে। এজন্য বিরত হওয়া গেল। শ্রীবৈষ্ণবমহিমা পরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

একাদশ উল্লাস।

গুণ কর্ম্মগত জাতি ভেদ।

——:০:——

প্রাচীনকালে উদারনীতিক আর্য্যঋষিগণ নীচকুলোদ্ভব ব্যক্তি, সদাচারসম্পন্ন হইলে কি ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপাধিমণ্ডিত করিয়া আপনাদের মণ্ডলীতে সসম্মানে গ্রহণ করিতেন। আবার পরবর্ত্তী কালেও, যখন চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তখনও অনেক বৈশ্য, শূদ্র গুণমাহাত্ম্যে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়া ছিলেন। যথা ভবিষ্যপুরাণে, ব্রাহ্মপর্ব্বে। ৪২অঃ।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজ।

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ সুতোঽভবৎ॥
মৃগীজোঽর্থ্যশৃঙ্গোঽপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালোমুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যোমুনিরাজস্তু মণ্ডূকী গর্ভসম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববৎ দ্বিজাঃ॥

বেদবিভাগকর্ত্তা ব্যাসদেব কৈবর্ত্তকন্যা-সম্ভূত, তৎপিতা পরাশর—চণ্ডালিনী গর্ভসম্ভূত, শুকদেব শুকী—ম্লেচ্ছরমণীর গর্ভে, বৈশেষিক দর্শনকর্ত্তা মহর্ষি কণাদ অনার্য্যজাতি উলুকীর গর্ভজাত, ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণীর গর্ভসম্ভূত, বশিষ্ঠ স্বর্গবেশ্যা উর্ব্বসীর গর্ভজাত, মন্দপাল মুনি নাবিক-কন্যাগর্ভজাত, মাণ্ডব্য—মণ্ডূকী নাম্নী—

মুণ্ডাজাতীয়া রমণীর গর্ভসম্ভূত। এইরূপ বহু হীনমাতৃক দ্বিজ, কর্ম্ম ও গুণের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন। হরিবংশে কথিত আছে—

" দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
শূদ্রীগর্ভসমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ॥

৯।১০ অধ্যায়।

আবার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকুলও আচারভ্রষ্ট হইলে শূদ্রকুলে সমানীত হইতেন। ফলতঃ বেদান্ত-পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়, সত্য,—ত্রেতা,—দ্বাপরযুগে দ্বিজাতির শূদ্রত্ব এবং অন্যান্য জাতির দ্বিজাতিত্ব-লাভ অসম্ভব ছিল না। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি হইয়াছিলেন। ইনি বেদমাতা গায়ত্রীর রচয়িতা এবং আজও সেই গায়ত্রীর দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব রক্ষিত হইতেছে। অধিকন্তু গর্গের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র গার্গ, ক্ষত্রিয়জাতি হইতে ব্রাহ্মণজাতিতে পরিণত হইয়াছিলেন। যথা—

" গর্গাচ্ছিনি স্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্মহ্যবর্ত্তত।"

ভাঃ ৯।২১।১৯

" অজমীঢ়স্য বংশ্যা স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ।"

ভাঃ ৯।২১।২১

অজমীঢ় স্বয়ং ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার বংশে উৎপন্ন প্রিয়মেধাদি বহুব্যক্তি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

" মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মণি বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্য সংজ্ঞিতং।"

ভাঃ ৯।২১।৩৩

আবার বলিরাজার (দৈত্য বলিরাজ নহেন) মহিষী সুদেষ্ণার দাসীর গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমার ঔরষে কক্ষীবান্ ও চক্ষু নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই—কক্ষীবান্—

"ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কক্ষীবান্ সহস্র মসৃজৎ সুতান্॥

বায়ুপুরাণ—উত্তরখণ্ড ৩৭অঃ।

এই কক্ষীবান্ ঋগ্বেদের ১ম, মণ্ডলের—১১৬—১২১ সুক্ত পর্য্যন্ত রচনা করেন।

আবার ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায়, শূদ্র কবষ বেদমন্ত্র প্রকাশক ঋষিগণ্য হইয়াছিলেন।

"দাস্যা বৈ ত্বং পুত্রোঽসি ন বয়ং ত্বয়া সহ ভক্ষয়িষ্যামঃ। ২।১৯

তিনি একবার সরস্বতী তীরে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত ছিলেন, ঋষিগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার সহিত পংক্তিভোজন করিতে স্বীকৃত হন নাই। বলিয়াছিলেন—"তুমি দাসীপুত্র" আমরা তোমার সহিত ভোজন করিব না।"

বোধ হয়, এই সময় হইতেই একজাতির মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী বিভেদের সূত্রপাত হয়। এই কবষও ঋগ্বেদের ১০ম, মণ্ডলের ৩০—৩৪ সূক্তের মন্ত্রগুলি রচনা করেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৪র্থ প্রপাঠকে বর্ণিত আছে—

রৈক্যঋষি রাজা জানশ্রুতিকে শূদ্র জানিয়াও তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দেন। শুধু তাই নয়, ধীবরগণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন—পূর্ব্বে কেবল রাজ্যে ব্রাহ্মণ ছিল না। ভৃগুবংশাবতংশ পরশুরাম তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

অব্রাহ্মণো তদা দেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেক্ষ্য ভার্গবঃ।

* * * * যজ্ঞসূত্র মকল্পয়ৎ।

স্থাপয়িত্বা স্বকীয়ে সঃ ক্ষেত্রে বিপ্রান্ প্রকল্পিতান্।

যামদগ্ন্য স্তদোবাচ সুপ্রীতে নান্তরাত্মনা॥"

স্কন্দপুরাণ।

মুদ্গল নামক ক্ষত্রিয় হইতে একজন ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন কুলই মৌদ্গল্য গোত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"উরুক্ষবাসুতা হেতে সর্ব্বে ব্রাহ্মণতাং গতাঃ।" ৪৯।৪০

প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সমাজের উদারতা।

উরুক্ষবের ত্রুষণ, পুষ্করী ও কবি নামক পুত্রত্রয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চতুর্ব্বর্ণ্যং প্রবর্ত্তয়িতাভূৎ।" ৪।৮

গৃৎসমদের পুত্র শৌনক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন।

আরও হরিবংশে বর্ণিত আছে—

"নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ।"

নাভাগারিষ্টের বৈশ্য পুত্রদ্বয় ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

পুত্রে গৃৎসমদস্যাপি শুনকো যস্য শৌনকা।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াশ্চৈব বৈশ্যা শূদ্রাস্তথৈবচ॥"

হরিবংশ ১।২৯।৭

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রেআসীৎ" অগ্রে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল। ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রাহ্মণকেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তৎপরে বিভিন্ন বর্ণ বা জাতি তাঁহাদের বংশেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব "তস্মাৎ বর্ণা-স্বজবো জ্ঞাতিবর্ণাঃ সংসৃজ্যন্তে তস্য বিকার এব।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৬০।৪৭

ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় যখন ব্রাহ্মণ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে তখন এই তিন বর্ণ ব্রাহ্মণেরই জ্ঞাতিস্বরূপ। ফলতঃ গুণ ও কর্ম্মের দ্বারাই বর্ণভেদ বা জাতিভেদ সূচিত হইয়া থাকে। সত্যযুগে ছোট বড় কোন ভেদাভেদ ছিল না, সকলেরই আয়ু ও রূপ সমান ছিল। পরে ত্রেতা যুগ হইতে গুণ ও কর্ম্মের বিভেদ অনুসারে

বর্ণভেদ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যথা, বায়ুপুরাণে—

"তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তম-বর্জ্জিতাঃ।
বর্ণানাং প্রবিভাগশ্চ ত্রেতায়াং সংপ্রবর্ত্তিতঃ॥ ৮অঃ

যাঁহারা শূদ্রের প্রতি কঠিন বিধি প্রণয়ন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, সেই মহর্ষি মনু আপস্তম্ব প্রভৃতি বিধিকর্ত্তৃগণও একবারে অনুদারতা দেখাইতে পারেন নাই। মনু বলিয়াছেন—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥

মনু ১০।৬৫

এই ক্রমানুসারে যেরূপ শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণেরও শূদ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে।

আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রের বচনে দৃষ্ট হয়—

"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণ মাপদ্যতে
জাতিপরিবৃত্তৌ।
অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং বর্ণ মাপদ্যতে জাতি
পরিবৃত্তৌ॥"

যেরূপ শূদ্রাদি বর্ণ ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা পর পর বা একবারে উচ্চজাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণও অধর্ম্মাচরণ দ্বারা পর পর বা একবারে অধম জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব শূদ্রবংশজ হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, তাহা নহে। যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয়, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ, আর যাহাতে লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র। কবষ ঐলুষঋষি একজন শূদ্র। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, এই ঋষি ব্রাহ্মণদিগের সহিত কলহ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ঋগ্বেদ ১০ম, মণ্ডলের ৩০ হইতে ৩৪ সূক্তের

প্রণেতা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম না হইলেও অনেকে বিদ্যা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও যশ দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া সানন্দে রাজর্ষিকে বর প্রদান করেন। তদবধি জনক ব্রাহ্মণ হইয়া যান। ইলুষের পুত্র কাকষ দাসীপুত্র, অব্রাহ্মণ, তাঁহাকে ঋষিগণ যজ্ঞভূমি হইতে বিতাড়িত করেন। কিন্তু দেবতাগণ কাকষকে জানিতেন, কাকষও দেবতাগণকে জানিতেন, তাই কাকষ ঋষি মধ্যে গণ্য হইলেন।

শৈবপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"এতৈশ্চ কর্ম্মভির্দেবি ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
শূদ্রশ্চ বিপ্রতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈব শূদ্রতাম্॥

হে দেবি! ব্রাহ্মণ মিথ্যা, চৌর্য্য, ক্রোধ, হিংসাদি দোষদুষ্ট হইলে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া শূদ্র হইয়া যান। শূদ্র যদি সদ্গুণান্বিত ও সদাচারী হন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়া যাইবেন।

এই গুণ-কর্ম্মগত ব্রাহ্মণত্ব বৈষ্ণবতার মধ্যদিয়া যেরূপ সহজে লভ্য হয়, অন্য দুশ্চর সাধন-প্রভাবেও সেরূপ হয় না। শুদ্ধাচারী শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণব মাত্রেই বৃত্তব্রাহ্মণ। ইহাই সনাতন বৈষ্ণবশাস্ত্রের—আর্য্যশাস্ত্রের অভিমত। বৈদিক পৌরাণিক এমন কি তান্ত্রিক যুগেও এ রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন ব্রাহ্মণত্ব বা বৈষ্ণবত্ব কি শূদ্রত্ব জন্মগত হইয়া পড়িয়াছে।

সে যাহা হউক এক ব্রাহ্মণই যখন কার্য্য দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন সকল বর্ণেরই নিত্য ধর্ম্ম ও নিত্য যজ্ঞে অধিকার আছে। যথা মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অধ্যায়ে—

"ইত্যেতৈ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মযজ্ঞে ক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে।"

আবার শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৪ অঃ) পাঠে অবগত হওয়া যায় ক্ষত্রিয়-বংশোদ্ভব ভগবানের অন্যতম অবতার ঋষভদেবের একশত পুত্র। এই শত পুত্রের মধ্যে ভরত শ্রেষ্ঠ, মহাযোগী, ইহাঁরই নামানুসারে এই বর্ষ ভারতবর্ষ নামে অভিহিত। অপর পুত্রগণের মধ্যে কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রাবিড়, চমস ও করভাজন এই নয় পুত্র ভাগবতধর্ম্ম-প্রদর্শক মহাভাগবত অর্থাৎ বৈষ্ণব হইলেন এবং তাঁহাদের কনিষ্ঠ ৮১ জন পিত্রাজ্ঞাপালক, বিনয়াম্বিত, বেদজ্ঞ, যজ্ঞশীল ও বিশুদ্ধ কর্ম্মী হওয়ায়, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ হইলেন। এস্থলে গুণ ও কর্ম্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব হইলেন। নিকৃষ্ট কুলসম্ভূতা রমণীগণও স্বামীর গুণে উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন। যথা—

"অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাধমযোনিজা॥
শারঙ্গী মন্দপালেন জগামাভ্যর্হনীয়তাম্॥
এতাশ্চান্যাশ্চ লোকেস্মিন্নপকৃষ্ট প্রসূতয়ঃ।
উৎকর্ষং যোষিতঃ প্রাপ্তাঃ স্বৈর্ভর্তৃগুণৈঃ শুভৈঃ॥"

মনু ৯।২৩।২৪।

নিকৃষ্ট-শূদ্রকন্যা অক্ষমালা ও শারঙ্গী যথাক্রমে বশিষ্ঠ ও মন্দপাল ঋষির সহিত বিবাহিতা হইয়া পরম পূজনীয়া ব্রাহ্মণী হইয়াছিলেন। উক্ত রমণীদ্বয় ও সত্যবতী প্রভৃতি কতিপয় রমণী অপকৃষ্ট বংশীয়া হইলেও ভর্ত্তৃগুণে উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বলিরাজ-মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে মহর্ষি দীর্ঘতমা যে পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন তাঁহারা রাজ্য লাভ করেন। সেই সকল রাজ্যই তাঁহাদের নামে প্রসিদ্ধ। যথা—অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম (রাঢ়) ও পুণ্ড্র (বারেন্দ্র)। আর উক্ত সুদেষ্ণার দাসী উশিজের গর্ভে উক্ত মহর্ষির যে পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্য কক্ষীবান্ সহস্র মসৃজৎসুতান্।"

আবার ক্ষত্রিয় রাজা যযাতি বংশীয় অপ্রতিরথের বংশে কণ্ব জন্মগ্রহণ

করেন। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। এই মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

"অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ
কাণ্বায়নাঃ দ্বিজাঃ বভূবুঃ।" বিষ্ণুপুরাণ।

রাজা দশরথ যে অন্ধমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে নিহত করিয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই সিন্ধুমুনি শূদ্রার গর্ভে বৈশ্যপিতা অন্ধমুনির ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। "শূদ্রায়ামস্মি বৈশ্যেন শৃণু জানপদাধিপ।" রামায়ণ।

প্রকৃত গুণকর্ম্মগত ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক আখ্যায়িকা এস্থলে বিবৃত হইতেছে। কথিত আছে, একদা লোমশমুনি সর্ব্বাঙ্গ লোম-পরিব্যাপ্ত দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার আরাধনা করেন। ব্রহ্মা স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, লোমশমুনি স্বীয় অঙ্গের লোমভার হইতে যাহাতে নির্ম্মুক্ত হইতে পারেন, সেই বর প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা কহিলেন "ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ভোজনেই তোমার লোম-সঙ্কট দূরীভূত হইবে।" লোমশও তদবধি বহু ব্রাহ্মণের প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার একগাছি লোমও স্খলিত হইল না। লোমশ পুনরায় ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন। ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "বৎস! তুমি বংশ ও উপবীত দেখিয়াই প্রতারিত হইয়াছ। প্রকৃতপক্ষে উহারা কেহই ব্রাহ্মণ নহে। তোমার আশ্রমের অনতি দূরে যে চণ্ডালপল্লী আছে, তথায় হরিদাস নামে এক হরিভক্ত চণ্ডাল সপরিবারে বাস করে, তুমি তাহার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলেই সফল-মনোরথ হইবে।" মুনিবর চণ্ডাল-ভবন গমন করিলে মহাভাগবত চণ্ডাল মহর্ষিকে উচ্ছিষ্ট প্রদানে ঘোর আপত্তি করিলেন। কিন্তু একদা ঐ হরিদাস ভোজনে বসিয়াছে, মহর্ষি অজ্ঞাতসারে তাঁহার উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া প্রস্থান করিলেন এবং পরমানন্দে সেই উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবামাত্র তাঁহার দেহ নির্লোম ও নির্ম্মল হইল। এই জন্যই শাস্ত্র জলদগম্ভীর স্বরে বৈষ্ণবের মহিমা ঘোষণা করিয়া বলিয়াছেন—

"চণ্ডালোঽপি ভবেদ্ বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তি-বিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

অতএব বৃত্ত অর্থাৎ সদাচারই ব্রাহ্মণত্বের জ্ঞাপক। জন্মাধীন জাতিত্ব বৃথা মাত্র। উচ্চ সাধন ভজন বলে ভাগবত-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেই বৃত্তব্রাহ্মণ রূপে শ্রেষ্ঠ পূজা লাভ করিবে। যেহেতু মনুষ্যত্বই মনুষ্যের জাতি। "জাতিরত্র মহাসর্প! মনুষ্যত্বে মহামতে।" মহাভারত, বনপর্ব্ব।

"যস্তু শূদ্রো দমে সত্যে ধর্ম্মে চ সততোত্থিতঃ।
তং ব্রাহ্মণমহং মন্যে বৃত্তেন হি ভবেদ্দ্বিজঃ॥
মহাঃ, বন।

আবার গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাব-প্রভবৈগুণৈঃ॥" ১৮ অঃ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের স্বভাবজাত গুণানুসারেই কর্ম্মের বিভাগ হইয়াছে। যে ব্যক্তি যেরূপ গুণসম্পন্ন, তাহার পক্ষে তদুপযোগী কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অতএব ভগবৎ-জ্ঞানবিবিশিষ্ট ব্যক্তিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ভগবৎ-জ্ঞানীই উপাসনা ও দীক্ষার্চ্চনাদি কার্য্যের সম্পূর্ণ অধিকারী। নতুবা যজ্ঞোপবীতধারী ভগবৎজ্ঞান-বর্জ্জিত ব্যক্তি ব্রাহ্মণপদবাচ্য নহেন। অবশ্য জাতি-ব্রাহ্মণ হইতে পারেন। এই ব্রাহ্মণপদলাভ কেবল যজ্ঞসূত্রধারণ দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ব্রহ্মোপনিষদে বর্ণিত আছে—

"সূচনাৎ সূত্রমিত্যাহুঃ সূত্রং নাম পরংপদং।
তৎ সূত্রং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ॥"

অর্থাৎ পরমপদ ব্রহ্মকে সূচনা করে বলিয়া ইহার নাম ব্রহ্মসূত্র। যিনি এই সূত্রের যথার্থ মর্ম্ম জানেন তিনিই বিপ্র ও বেদজ্ঞ।

অতএব যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেননা, কেবল যজ্ঞসূত্রধারণেরই গর্ব্ব করেন, অত্রি-সংহিতায় তাহার বিশেষ নিন্দা আছে, তাহাকে পশুবিপ্র বলা হইয়াছে। অত্রি ধর্ম্ম ও প্রকৃতি অনুসারে দশপ্রকার ব্রাহ্মণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"দেবো মুনি দ্বিজো রাজা বৈশ্যঃ শূদ্রোনিষাদকঃ।
পশুর্ম্লেচ্ছোঽপি চণ্ডালো বিপ্রাঃ দশবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

ইহার মধ্যে দেব, মুনি ও দ্বিজ এই তিন প্রকারই ব্রাহ্মণ নামের যোগ্য, অবশিষ্ট নিন্দিত।

"সন্ধ্যাং স্নানং জপং হোমং দেবতা নিত্যপূজনম্।
অতিথিং বৈশ্বদেবঞ্চ দেবব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
শাকে পত্রে ফলে মূলে বনবাসে সদা রতঃ।
নিরতোঽহরহঃ শ্রাদ্ধে স বিপ্রো মুনিরুচ্যতে॥
বেদান্তং পঠতে নিত্যং সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজেৎ।
সাংখ্যযোগ-বিচারস্থঃ স বিপ্রো দ্বিজ উচ্যতে॥
অস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে
কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্য উচ্যতে॥
লাক্ষা-লবণ-সম্মিশ্র কুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং স বিপ্রঃ শূদ্র উচ্যতে॥
চৌরশ্চ তস্করশ্চৈব সূচকো দংশকস্তথা।
মৎস্য মাংসে সদা লুব্ধো বিপ্রো নিষাদ উচ্যতে॥
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

বাপীকূপতড়াগানা মারামস্ত সরঃস্থ চ।
নিঃশঙ্কং রোধকশ্চৈব স বিপ্রো ম্লেচ্ছ উচ্যতে॥
ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥
বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণপাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো ভবন্তি
ভ্রষ্টা স্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥"

এই শেষের শ্লোকটীর অর্থ এই যে, বেদপাঠে অকৃতকার্য্য হইলে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করে, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে পুরাণপাঠী হয়, পুরাণপাঠেও অপারগ হইলে কৃষিকার্য্যে রত হয়, কৃষিকর্ম্মেও বিফল-মনোরথ হইলে অবশেষে ভ্রষ্ট ভাগবত অর্থাৎ ভণ্ড বৈষ্ণবরূপে পরিচিত হয়। আবার—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্ব মাশুগচ্ছতি সান্বয়ঃ।" মনু।

অধুনা ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়নের পরিবর্ত্তে অর্থকরী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। ইহাতে তাঁহারা শূদ্রতুল্য গণ্য হন। ভগবানের অর্চ্চনা করা, ত্রিসন্ধ্যা করা, বিষ্ণুপ্রসাদ ভোজন ও বিষ্ণুপাদোদক পান করাই ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম।

"ব্রাহ্মণস্য স্বধর্ম্মশ্চ ত্রিসন্ধ্যা মর্চ্চনং হরেঃ।
তৎপাদোদক নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চ সুধাধিকম্॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

নতুবা যে সকল ব্রাহ্মণ—

"বিষ্ণুমন্ত্রবিহীনশ্চ ত্রিসন্ধ্যা-রহিতো দ্বিজঃ।
একাদশী বিহীনশ্চ বিষহীনো যথোরগঃ।"
* * * *
শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসিজীবী মসীজীবী বিষহীনো যথোরগঃ।

* * * *

সূর্য্যোদয়ে চ দ্বির্ভোজী মৎস্যভোজী চ যো দ্বিজঃ।
শিলা পূজাদিরহিতো বিষহীনো যথোরগঃ॥” ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

বিষ্ণুমন্ত্রবিহীন, ত্রিসন্ধ্যাবর্জ্জিত, একাদশীবিহীন, শূদ্রের পাচক, শূদ্রযাজক, যুদ্ধজীবী, মসীজীবী (কেরানী), একসূর্য্যে দুইবার ভোজনকারী, মৎস্যভোজী ও শ্রীশালগ্রাম শিলা পূজাদি-বর্জ্জিত তাঁহারা, বিষহীন সর্পের ন্যায়।

বিশেষতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের ন্যায় অপবিত্র। যথা—

“অশুদ্ধাঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ।”
হঃ ভঃ বিঃ ৫ম বিঃ ধৃত বিষ্ণুযামলে।

এই সকল হীনাচার-সম্পন্ন নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ব্রাহ্মণত্বের বড়াই করিয়া প্রায়শঃ বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় অধুনা অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখেও বৈষ্ণব নিন্দা শুনিতে পাওয়া যায়। যদি শাস্ত্র মানিতে হয়, তবে তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, বৈষ্ণবের পক্ষে যেরূপ ব্রাহ্মণ-সম্মান কর্ত্তব্য, ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৈষ্ণব-সম্মান অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ উভয়ই ভাগবতীতনু। এই সকল বৈষ্ণব-নিন্দক ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে—

“এই সকল রাক্ষস ব্রাহ্মণ নামমাত্র।
এই সব জন যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষসসকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥
এই সব বিপ্রের স্পর্শ কথা নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥

বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

“রাক্ষসা কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণকুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥

জেলা ফরিদপুর—কাশীপুর নিবাসী ভক্তবর শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত চক্রবর্ত্তী ভক্তিবিশারদ মহাশয় তাঁহার স্বপ্রণীত "সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ" নামক পুস্তকে উক্ত পয়ারের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইতেছি—

"রাক্ষস-প্রকৃতি যে সব কলির ব্রাহ্মণ।
শুন হরি বলি তার কর্ত্তব্য এখন॥
মদ্য মাংস তথা মৎস্য করিবে ভক্ষণ।
সংক্ষেপে করিয়া কহি অপর লক্ষণ॥
পিতৃ মাতৃ ভ্রূণহত্যা পরস্ত্রীগমন।
অযাজ্য যাজন আর পরস্ব হরণ॥
পতিত জনের প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া।
সন্ধ্যা বন্দনাদি ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া॥
দাসবৃত্তি মিথ্যা কথায় পতিত হইয়া।
ছদ্মবেশী বিপ্ররূপে বেড়ায় ঘুরিয়া॥
সাক্ষাৎ পাতক এরা শুন শচীসুত।
অথবা ব্রাহ্মণবেশে যেন কলিরভুত॥"

কলিপ্রভাবে ব্রাহ্মণ সমাজেরও যে ঘোর অধঃপতন হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ-সমাজের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া বহু দুঃখে কবিবর নবীন সেন লিখিয়াছেন—

"লুপ্ত স্মৃতি—নাই সেই বিশাল সমাজ-ধ্যান।
আছে মূর্খ ব্রাহ্মণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান।"

এই বাক্য সকল উদ্ধৃত করিতেছি বলিয়া, কেহ যেন মনে না করেন আমরা ব্রাহ্মণের নিন্দা করিতেছি। বৈষ্ণব যেমন ভাগবতী তনু, ব্রাহ্মণও সেইরূপ ভাগবতী তনু; সুতরাং ব্রাহ্মণ উন্মার্গগামী অসদাচারী হইলেও (যদিও শাস্ত্রে

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সদৃশ বলিয়া তাহার দর্শন, স্পর্শন, আলাপাদি নিষিদ্ধ আছে "শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্" (পাদ্মে মাঘমাহাত্ম্যে) ভাগবতী তনু বলিয়া হেয়বুদ্ধি কর্ত্তব্য নহে। তবে আসক্তি পূর্ব্বক দর্শনাদি করিতে নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। অতএব "বৈষ্ণব" নামধারী অসদাচারিগণও সমদর্শী* ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের চক্ষে একেবারে বর্জ্জিত হইতে পারেন না, বরং অনুগ্রহের পাত্রই হইবেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তে আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, কেবল ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা নহে। ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ নামে সংজ্ঞিত অবশ্যই হইবেন, কারণ, তাঁহাতে পূর্ব্ব আর্য্যঋষির শোণিত-সম্পর্ক আছে। পরন্তু সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন হইলে শূদ্রের পুত্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের এই ব্রাহ্মণত্ব-লাভ তপস্যাদি অপেক্ষা ভক্তিধর্ম্মের আশ্রয়ে যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতে পারে, কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাই বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাই, শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্যগণও বৈষ্ণবকে ব্রাহ্মণ সমতুল্য বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অতএব ব্রাহ্মণ কি বস্তু, ব্রাহ্মণ শব্দ কাহাকে নির্দ্দেশ করে, এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ বিচার বজ্রসূচিকোপনিষদ্ হইতে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে—

"কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম? কিং জীবঃ? কিং দেহঃ? কিং জাতিঃ? কিং ধর্ম্মঃ? কিং পাণ্ডিত্যং? কিং কর্ম্ম? কিং জ্ঞানমিতি বা?"

ব্রাহ্মণ কে?

ব্রাহ্মণ কাহার নাম? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন—

"তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্য জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রাহ্মণত্বাপত্তিঃ শরীর ভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণ

* বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

স্বরূপো যো জীব স্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদি দেহসম্বন্ধে অস্য বর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণ দেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহার-মূলকমেব ন তু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদস্তীতি। তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

যদি জীবাত্মাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়, তাহা হইলে সকল লোকের জীবাত্মাই তো একরূপ, সুতরাং সকল লোকেরই ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করিতে হয়। আবার দেহ ভেদে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলে, এই জন্মে যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কর্ম্মাধীন, জন্মান্তরে শূদ্রাদি দেহপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে তাঁহার শূদ্রত্বাদি তবে না হউক। আরও যদি বলা যায়, দেহ ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে অবস্থিত ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহারমূলক হইল, পরমার্থত কিছুই নহে। অতএব জীবাত্মা ব্রাহ্মণ নহেন। তবে দেহ ব্রাহ্মণ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"দেহো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি চণ্ডাল পর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তিত্বেন জরামরণাদি ধর্ম্মত্বেন চ তুল্যত্বাদিত্যাদি। তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

দেহ ব্রাহ্মণ হইলে আচণ্ডাল সকল মনুষ্যের দেহই ব্রাহ্মণ হইবে। যেহেতু মূর্ত্তিতে এবং জরামরণাদি কর্ম্মানুসারে সকল দেহ তুল্যভাবাপন্ন, পরন্তু এমন কোন নিয়ম নাই, যদ্দ্বারা অন্য দেহ হইতে ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। দেহ ব্রাহ্মণ হইলে পিতামাতার মৃতদেহ দাহ করিলে পুত্রাদিকে ব্রহ্মহত্যা পাপে পতিত হইতে হইবে। অতএব দেহ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে জাতি ব্রাহ্মণ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যোঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যাবর্ণাঃ
পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্ত্বেষাং
ন ব্রাহ্মণত্বং যদি চ জাতি শব্দেন শাস্ত্র-বিহিতং ব্রাহ্মণ-
ব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতি-স্মৃতি
প্রসিদ্ধ মহর্ষীনাম্ ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত। তেষাং

তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেনাপি সম্যক্ জ্ঞান বিশেষাৎ ব্রাহ্মণং
শ্রূয়তে। তস্মাজ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

জাতি ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতিও এক একটী জাতিবিশিষ্ট, তবে তাহারাও ব্রাহ্মণ হউক। জাতি শব্দে জন্ম কহিলে অর্থাৎ শাস্ত্র-বিহিত বিবাহদ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে যাঁহার জন্ম হয়, সেই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষির (ঋষ্যশৃঙ্গ, কৌশিক মুনি, মাতঙ্গ, অগস্ত, মাণ্ডুক্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি) তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অতএব জাতিদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে। তবে বর্ণ ব্রাহ্মণ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ব্রাহ্মণঃ শ্বেতবর্ণঃ
সত্ত্বগুণত্বাৎ; ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্ত্বরজঃ স্বভাবাৎ,
বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃ প্রকৃতিত্বাৎ; শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণ
স্তমোময়ত্বাৎ, শূদ্রস্থ ইদানীং পূর্ব্বস্মিনপি চ
কালে শ্বেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচার দর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো
ন ভবত্যেব।"

বর্ণ ব্রাহ্মণ হইলে সত্ত্বগুণনিবন্ধন ব্রাহ্মণের বর্ণ শুক্লবর্ণ, সত্ত্ব-রজগুণ নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের বর্ণ রক্তবর্ণ, রজস্তমগুণনিবন্ধন বৈশ্যের বর্ণ পীতবর্ণ এবং তমোগুণপ্রযুক্ত শূদ্রের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যেমন, অতীত কালেও তেমনি। শূদ্রের শুক্লাদিবর্ণের ব্যভিচার দর্শনে বুঝা যাইতেছে বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ নহে। তবে ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হউক? তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োঽ
পীষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মকারিণো নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো
বহবো দৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণো ভবেয়ুঃ? তস্মাদ্ধর্ম্মো
ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হইলে ক্ষত্রিয়াদি অনেক ইষ্ট (অগ্নিহোত্রাদি) পূর্ত্ত (বাপী কূপাদি প্রতিষ্ঠা) প্রভৃতি ধর্ম্ম-কার্য্য ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ? কদাচ নহে। অতএব ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি জনকাদি
ক্ষত্রিয় প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূপলভ্যতে
অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি করণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যে
কিন্তু ন ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হইলে জনকাদি ক্ষত্রিয়ের মহাপাণ্ডিত্য ছিল এবং এখনও কারণসত্ত্বে অন্যজাতীয়দিগেরও পাণ্ডিত্যলাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে; অথচ তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ নহে। তবে কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হউক। তদুত্তরে বলিতেছেন—

"অন্যচ্চ কর্ম্মণো ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যাদান গজ-পৃথিবী-হিরণ্যাশ্বমহিষদানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।"

কর্ম্মকেও ব্রাহ্মণ বলা যায় না। যেহেতু, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র প্রভৃতি কন্যাদান হস্তী-ভূমি-স্বর্ণ-অশ্ব-মহিষদানাদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে কে ব্রাহ্মণ? জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের কারণ। যথা—

"করতলামলকমিব পরমাত্মোঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি যত্নশীলো দয়ার্জ্জবক্ষমা সত্য সন্তোষ বিভবো নিরুদ্ধমাৎসর্য্য দম্ভসম্মোহো যঃ সএব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি—জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাত্তবে-দ্বিপ্রো ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥ ইতি অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম—যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি (তৈত্তীরিয়ে)। তজ্জ্ঞান-তারতম্যেন ক্ষত্রিয়

বৈশ্যো তদ্ভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ।

করতলন্যস্ত আমলকী ফলের ন্যায় পরমাত্মা সত্তাতে অর্থাৎ শ্রীভগবানে যাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে এবং যিনি শম-দমাদিসাধনে যত্নশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদি দমনে যত্নবান্, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়েন, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন।" সেই ব্রহ্ম কে?—"যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে অবস্থিতি করে, জীবলীলার অবসানে যাঁহাতে প্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাঁহাতে সম্যক প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করে, তিনিই ব্রহ্ম।" অতএব এই শ্রুতি-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুতে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস বা ভক্তি সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ভগবদ্ভক্তই প্রকৃত ব্রাহ্মণপদবাচ্য। ফলতঃ শ্রীভগবান্‌কে সর্ব্বভূতের প্রাণস্বরূপ জানিয়া শুষ্কজ্ঞান ও তর্ক পরিত্যাগ করতঃ যিনি প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধাভক্তির অনুশীলন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যথা—শ্রুতি—

"তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।" (বৃহদারণ্যক) ৪৪।১।২।

অতএব শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে (ভগবান্‌কে) জানিয়া যিনি প্রজ্ঞার (শুদ্ধাভক্তির) অনুশীলন করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। সেই শুদ্ধজ্ঞানের তারতম্যানুসারে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এবং তাহার অভাব দ্বারাই শূদ্রত্ব লাভ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। এইরূপ বর্ণ-বিভাগ যে সমাজের অশেষ কল্যাণকারক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এইজন্য পুরাকালে নিজাপেক্ষা বর্ণোৎকর্ষ লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য সকলেরই জ্ঞানানুশীলন করিবার একান্ত আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু অধুনা বর্ণ বা জাতি জন্মগত হইয়া পড়ায় বর্ণোৎকর্ষ লাভের নিমিত্ত জ্ঞানানুশীলন করিবার প্রায় কাহারও প্রয়োজন হয় না। এখনকার জ্ঞানানুশীলন প্রায়শঃ প্রতিষ্ঠা ও অর্থোপার্জ্জনের উপায় স্বরূপ হইয়াছে। কাজেই

হিন্দুসমাজ উদার-স্বভাব আর্য্যঋষিদের প্রবর্ত্তিত সনাতন ধর্ম্ম-পথ ও লক্ষ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হইয়েছে। হিন্দুর প্রত্যেক বিষয় ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত। সুতরাং জাতীয়তার মূলও ধর্ম্ম। জাতীয় উন্নতি করিতে হইলে ধর্ম্মোন্নতি সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অতএব অসার জন্মগত জাতীয় উন্নতি চেষ্টা করিবার অগ্রে ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত গুণকর্ম্মগত জাতিনির্ণয়ের বিধান পুনঃ প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। ইহার ফলে উপরিতন জাতির আবর্জ্জনারাশি স্বরূপ অকর্ম্মণ্য মনুষ্য সকল শূদ্রবর্ণের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে অথবা শূদ্রাদি সমাজ হইতে সদাচার-সম্পন্ন মহাত্মজন উচ্চবর্ণে গৃহীত হইলে সকলের হৃদয়েই আত্মোন্নতিমূলক জ্ঞান-চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে সমুদিত হইবে। ইহাতে শাস্ত্র-বিহিত প্রকৃত জাতীয়-উন্নতির সূত্রপাত হইবার অধিক সম্ভাবনা, বলিয়া বোধ হয়।

অন্যান্য জাতি-সমাজ অপেক্ষা বৈষ্ণব সমাজে স্বভাব ও গুণের আদর অধিক পরিদৃষ্ট হয়। শূদ্রাদি কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলে ও বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়া সদাচার পালন করিলে প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের পদাঙ্কানুসরণকারী উদার বৈষ্ণব-সমাজ অনায়াসে " বৈষ্ণব " সংজ্ঞা প্রদান করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণতুল্য সম্মান প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু সেই আর্য্যঋষিদের বংশধর বলিয়া যাঁহারা গর্ব্ব করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এরূপস্থলে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উদারনীতিকে বিসর্জ্জন দিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে নিজের হাতগড়া কথায় উত্তর করেন—

" অনাচারো দ্বিজপূজ্যঃ ন হি শূদ্রঃ জিতেন্দ্রিয়ঃ। "

এরূপ অনুদারতা ও সঙ্কীর্ণতা বৈষ্ণব-সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে অন্যান্য বর্ণ-সমাজ হইতে সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া যেরূপ ব্রাহ্মণ-সমাজের অঙ্গপুষ্টি ও বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বিভিন্ন বর্ণ-সমাজ হইতে সত্ত্বগুণসম্পন্ন ভগবদ্ভক্তগণ বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অঙ্গপুষ্টি ও বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং আজও করিতেছেন। সত্য বটে, বৈষ্ণব-সমাজ-নেতৃগণের অমনোযোগিতা

ও ঔদাসীন্যের ফলে অধুনা বৈষ্ণব-সমাজে বহুতর আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় আজকাল বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি সমাজনেতা ও পরিচালকগণের তীব্রদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। তাঁহারা স্থানে স্থানে বৈষ্ণব-সম্মিলনী বা বৈষ্ণব-সমিতি স্থাপন করিয়া উহার প্রতিষেধ ও সংস্কারের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নশীল হইয়াছেন।

সে যাহা হউক, জাতি-চতুষ্টয়ের উৎপত্তি যদি গুণ কর্ম্মের বিভাগানুসারে না হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতেই হইয়াছে, এরূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হয়, তাহা হইলে একের সন্তান জাতি-চতুষ্টয়ে পার্থক্য ঘটিবে কেন? তাই ভবিষ্য-পুরাণ বলিয়াছেন—

"বঞ্চনং দুর্ব্বচস্থাপি ক্রিয়তে সর্ব্বমানবৈঃ।
শূদ্রব্রাহ্মণয়ো স্তস্মাৎ নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চন॥
ন ব্রাহ্মণাশ্চন্দ্র মরীচি শুক্লা, ন ক্ষত্রিয়াঃ কিংশুক পুষ্পবর্ণাঃ।
ন চাপি বৈশ্যা হরিতালতুল্যাঃ শূদ্রা ন চাঙ্গার সমান বর্ণাঃ॥
স এক এবাত্র পতিঃ প্রজানাং কথং পুনর্জ্জাতিকৃতঃ প্রভেদঃ।
প্রমাণ দৃষ্টান্ত নয়প্রবাদৈঃ পরীক্ষমানো বিঘটত্বমেতি॥
চত্বার একস্য পিতুঃ সুতাশ্চ তেষাং সুতানাং খলু জাতিরেকা।
এবং প্রজানাং হি পিতৈক এব পিত্রোকভাবাৎ ন চ জাতিভেদঃ॥
ফলান্যথ ডুম্বুরবৃক্ষ জাতে যথাগ্রমধ্যান্ত ভবানি যানি।
বর্ণাকৃতি স্পর্শরসৈঃ সমানি তথৈকতা জাতেরিতি প্রচিন্ত্যাম্॥"

পিতা এক, পুত্র চারিটী, ইহারা কি প্রকারে এক না হইয়া, ভিন্নজাতিক হইতে পারে? ব্রাহ্মণ চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুক্লবর্ণ নহেন, ক্ষত্রিয়ও কিংশুক পুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ নহেন, বৈশ্যও হরিতালের ন্যায় পীতবর্ণ নহেন এবং শূদ্রও অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ নহেন। দেহাদিগতও কোন পার্থক্য নাই। আবার একই প্রজাপতি, সুতরাং কিরূপে জাতিভেদ হইতে পারে? চারি জাতিরই পিতা এক, সুতরাং

মানুষের জাতিও এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না। ব্রহ্মার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রভব বলিয়াই যদি জাতিভেদ সূচিত হয়, তাহা হইলে ডুম্বুর বৃক্ষের কাণ্ডে, শাখায় ও প্রশাখায় যে ফল হয়, তাহার বর্ণ, আকৃতি, রস কি সমান হয় না? উহাদের এক নাম কি ডুম্বুরই নহে? তবে ভিন্নাঙ্গ-প্রভব হইলে জাতি পৃথক্ হইবে কেন? ফলতঃ মূর্খদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্তই এইরূপ জন্মগত জাতিভেদ-প্রথা পরিকল্পিত হইয়াছে। ভগবানের নিকট ব্রাহ্মণ-শূদ্র বলিয়া জন্মত কোন ভেদ নাই ও থাকিতেও পারে না। ফলতঃ সমাজের অভাবপূরণ ও শৃঙ্খলা-সাধন উদ্দেশ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে চারিবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে শ্রুতিই তাহার প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।১০)—

"ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সৎ ন ব্যভবৎ।"

পূর্ব্বে কোন জাতিভেদ ছিল না, সকল মনুষ্য ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সেই একটী ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণবর্ণ দ্বারা সমাজের বড়ই বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। তখন সমাজ-নেতৃগণ সেই ব্রাহ্মণবর্ণ হইতে লোক-নির্ব্বাচন করিয়া সমাজের শান্তিরক্ষা উদ্দেশ্যে ক্ষত্রিয়বর্ণ গঠন করিলেন।

"তচ্ছ্রেয়োরূপ মত্যসৃজত ক্ষত্রং তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরো নাস্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় মধস্তাদুপাস্তে। রাজসূয়ে ক্ষত্রিয় এব তদ্ যশো দধাতি সৈষা ক্ষত্রস্য যোনির্যদ্ ব্রহ্ম।" ঐ ১।৪।১১।

ক্ষত্রিয়গণ আততায়ীর উৎসাদন দ্বারা লোকের ধন, প্রাণ ও ঋষিগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান কার্য্য সুরক্ষিত করিয়া দিতেন। তাই, ক্ষত্রিয়বর্ণ সমাজে প্রাধান্যলাভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অধীন থাকিয়া তাঁহাদের সম্মান করিতে লাগিলেন। রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়গণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেন এবং তাঁহারাই উক্ত যজ্ঞের যশোভাগী হইতেন। ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতির উৎপত্তিস্থান।

কিন্তু শুদ্ধ ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বর্ণ দ্বারা সমাজের অভাব পূর্ণ না

হওয়াতে সমাজ-নেতৃগণ উক্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইতে লোক নির্ব্বাচিত করিয়া বৈশ্য-বর্ণের গঠন করিলেন। যথা—

"স নৈব ব্যভবৎ স বিশমসৃজত।" ঐ ১।৪।১২।

কিন্তু এই তিনবর্ণ দ্বারাও সমাজের শৃঙ্খলা ও অভাব পূরণ না হওয়ায় উক্ত তিন বর্ণ হইতে লোক-নির্ব্বাচন করিয়া শূদ্রবর্ণের গঠন করিলেন।

"স নৈব ব্যভবৎ স শৌদ্রং বর্ণমসৃজত।" ঐ

এইরূপে একই বর্ণ-সমাজ, চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি সাধন করিতে লাগিল। এই মৌলিক-বর্ণ-চতুষ্টয় হইতে অনুলোম-প্রতিলোম ক্রমে এক্ষণে ছত্রিশ বা ততোধিক বর্ণ উৎপন্ন হইয়া সমাজে নানা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করিয়াছে এবং সমাজ-শরীরকে একবারে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছে। প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি করিতে হইলে গুণকর্ম্মানুসারে এই ছত্রিশবর্ণকে পুনরায় চতুর্ব্বর্ণে পরিণত করিতে হইবে। এইরূপে সমাজের বিক্ষিপ্ত-শক্তি যতদিনে না কেন্দ্রীভূত, হইবে ততদিনে ভারতের প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি সুদূর-পরাহত। সমাজের এই বিক্ষিপ্ত-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে এবং পবিত্র ধর্ম্মজীবনের সহিত উন্নত জাতীয়তা গঠন করিতে যেমন সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সমর্থ, তেমন আর কিছু নাই।

——:০:——

দ্বাদশ উল্লাস।

——:o:——

সংস্কার তত্ত্ব।

বেদে ৪৮ প্রকার সংস্কারের বিষয় উল্লিখিত আছে, যথাক্রমে সেই সকল সংস্কারে সংস্কৃত হওয়া অতীব দুরূহ ব্যাপার। বিশেষতঃ নানা উপদ্রবে উপদ্রুত অল্পায়ু কলির জীবের পক্ষে তাহা একরূপ অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এইজন্য পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণ সেই ৪৮টী সংস্কারের মধ্যে ক্রমশঃ সংক্ষেপ করিয়া ২৫টী, পরে ১৬টী, অবশেষে ১০টী মাত্র প্রচলিত রাখিয়াছেন। যথা, বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন (সমাবর্ত্তনসমেত)। অধুনা এই দশটীর মধ্যেও অধিকাংশ স্থলে নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ এই চারিটী সংস্কার মাত্র দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন স্থলে ইহারও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত সংস্কার সকলের মধ্যে উপনয়ন-সংস্কার একটী প্রধানতম সংস্কার। ইহা মানসিক ব্যাপারের সহিত অধিক সম্বন্ধযুক্ত। যে সময়ে বালকের বুদ্ধির উন্মেষ আরম্ভ হয়, সেই সময়ে এই সংস্কার বিহিত। সুতরাং ইহা একরূপ বুদ্ধির সংস্কার-বিশেষ। যজ্ঞোপবীতধারণ, গায়ত্রী উপদেশ, সন্ধ্যাবন্দনা ও বেদপাঠারম্ভ উপনয়ন-সংস্কারের প্রধান অঙ্গ। উপনয়ন গুরুকুলে বাস, গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্য, অগ্ন্যুপস্থান ও ভিক্ষাচরণ শিক্ষা প্রদান করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় প্রধানতঃ এই সংস্কারের পর "দ্বিজ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু বৈষ্ণবী-দীক্ষা প্রভাবে মনুষ্যমাত্রেই "দ্বিজত্ব" লাভ করেন। যথা—"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং ॥" (হরিঃ ভঃ বিঃ

ধৃত তত্ত্বসাগরবচন) অতএব একমাত্র দীক্ষা-সংস্কার দ্বারাই বেদোক্ত উপনয়নাদি-সংস্কার সিদ্ধ হইয়া থাকে। বৈদিক শাস্ত্র এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানকেই 'তন্ত্র' নামে অভিহিত করিয়াছেন। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রে বলেন—

"কর্ম্মানাং যুগপদ্ভাবস্তন্ত্রম্।" ১৯।৮।১

অর্থাৎ যুগপৎ বহু ক্রিয়ানুষ্ঠানের নাম তন্ত্র। সুতরাং বেদোক্ত উপনয়নাদি সংস্কার, এক দীক্ষা-সংস্কার দ্বারা সংসিদ্ধ হওয়ায় ইহা তান্ত্রিক নামে অভিহিত। যে সকল দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞ করিতে হয়, একমাত্র বিষ্ণু আরাধনা দ্বারা সেই নিখিল দেবতার আরাধনা সিদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে তান্ত্রিক পূজা কহে। অতএব বৈষ্ণবী দীক্ষা ও বিষ্ণু পূজা তান্ত্রিকী নামে অভিহিত হইলেও ইহা যে সম্পূর্ণ বেদাচার-সম্মত, ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পরন্তু শিব প্রোক্ত তন্ত্র-শাস্ত্রই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি, ইহা কদাচ স্বীকার্য্য নহে।

যাঁহারা বলেন, দীক্ষা বৈদিক-সংস্কার হইলে বিনা উপনয়নে দীক্ষা হইতে পারে না, তাঁহারা এই বৈষ্ণবী-দীক্ষার মাহাত্ম্য আদৌ অবগত নহেন।

যজ্ঞোপবীত গ্রহণের পর গায়ত্রী মন্ত্রোপদেশ গ্রহণ করিলে বেদ পাঠে অধিকার জন্মে। সুতরাং উপনয়ন ও গায়ত্রী বেদপাঠের দ্বার স্বরূপ। বেদ-পাঠান্তে পদার্থ-জ্ঞান হইলে, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে, উহার সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানের জন্য দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যে ব্যক্তি বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলেন তাঁহার উপনয়নাদি গৌণ-সংস্কারের তত প্রয়োজন হয় না। বৈষ্ণবী-দীক্ষাই মুখ্য সংস্কার। বিশেষতঃ উপনয়ন-সংস্কার অনিশ্চিত। উপনয়ন একবার হইলেও পুনরায় প্রয়োজন হইয়া থাকে। যথা—শাঠ্যায়ন ব্রাহ্মণে—

"নান্যত্র সংস্কৃতো ভৃগ্বঙ্গিরোঽধীয়ত।"

(অন্যত্র অন্যবেদার্থং ভৃগ্বঙ্গিরোঽথর্ববেদং) উপনীতস্যাপি অথর্ব্ব বেদা-ধ্যয়নার্থং পুনরুপনয়নং শ্রূয়তে।

অর্থাৎ ঋগ্বেদাদি অধ্যয়নের নিমিত্ত যিনি উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি

যদি অথর্ব্ববেদ না পাঠ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অথর্ব্ব বেদ পাঠ করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করিতে হইবে। সুতরাং একবার উপনয়নের পর পুনরায় যখন উপনয়ন-সংস্কারের বিধি দৃষ্ট হইতেছে, তখন উপনয়নের প্রতি নিষ্ঠা কি? অধিকন্তু স্ত্রীলোকেরও উপনয়ন-সংস্কারের বিধি শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। যথা—

"দ্বিবিধা স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোবধ্বশ্চ।
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনামুপনয়নং অগ্নি ধনং
বেদাধ্যয়নং স্বগৃহে ভৈক্ষচর্য্যা চেতি।
সদ্যো বধূনা মুপনয়নং কৃত্বা বিবাহঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূ ভেদে স্ত্রীলোক দ্বিবিধ। ব্রহ্মবাদিনীর পক্ষে উপনয়ন, অগ্নি, ধন বেদাধ্যয়ন, স্বগৃহে ভিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্যা প্রশস্ত এবং সদ্যোবধূর উপনয়নান্তে বিবাহ প্রশস্ত।

আরও গোভিল গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে—

"প্রাবৃতাং যজ্ঞোপবীতিনী মভ্যুদানয়জ্জপেৎ।" ২ প্রঃ, ১।১৯

যজ্ঞোপবীতযুক্তা কন্যাকে বস্ত্রাবৃতা করিয়া বেদীর নিকট আনিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে।

আবার উপবীত গ্রহণ না করিলেও তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করা দোষাবহ হয় না। যথা, শতপথ ব্রাহ্মণে—

"অনুপেতায়ৈব ত এতৎ প্রব্রবাণি।" কাণ্ড ১১।২

শাঠ্যায়ন যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিতেছেন,—"বিনা উপনয়নে এই তত্ত্ব তোমাকে কহিলাম।"

সুতরাং উপনয়ন ব্যতিরেকে তত্ত্বোপদেশরূপ দীক্ষা হইতে পারে। এই জন্যই করুণাময় আচার্য্যগণ অনুপনীত ব্যক্তিকেও দীক্ষা দান করিয়া থাকেন।

আজকাল উপনয়ন-সংস্কার বেদপাঠের বা ব্রহ্মচর্য্যের দ্বার স্বরূপ নহে—

কার্য্য সম্পাদনার্থ উপবীত গৃহীত হয় বলিয়া, উহা যজ্ঞোপবীত।

উপবীতে ৩টী করিয়া সূত্র একটী করিয়া গ্রন্থি থাকার নিয়ম। তিনটী করিয়া সূত্র থাকায় ইহার নাম "ত্রিবৃৎ।"

"ত্রিবৃতা গ্রন্থিনৈকেন ত্রিভিঃ পঞ্চভিরেব বা। মনু ২।৪৩

শব্দকল্পদ্রুমের উপনয়ন শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে—

"ততঃ প্রবর সংখ্যায়া পঞ্চ ত্রয়ো বা মেখলা
যজ্ঞোপবীতরূপ গ্রন্থয়ঃ কর্ত্তব্যাঃ।"

সুতরাং স্ব স্ব বংশের প্রবর সংখ্যানুসারেই গ্রন্থির সংখ্যা কল্পিত হইয়াছে। বংশোজ্জ্বলকারী প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই "প্রবর" নামে অভিহিত। ইহাঁদের নামানুসারে গ্রন্থি বন্ধন করায়, মনে হয়, বংশের আদিপুরুষের গৌরব-প্রভাব স্মৃতপটে চির অঙ্কিত রাখাই উক্ত গ্রন্থি-বন্ধনের উদ্দেশ্য। প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা যজ্ঞ সম্পাদনের পবিত্র স্মৃতি সর্ব্বদা জাগরূক রাখিবার জন্যই ত্রিসূত্র কল্পিত হইয়াছে। আমরা যজ্ঞোপবীত গ্রহণের মন্ত্রেও দেখিতে পাই—

"যজ্ঞোপবীত মসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতেনোপনহ্যামি।"

তুমি যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞের উপবীতরূপেই তোমার গ্রন্থি বন্ধন করিতেছি।

দিনে ৩ বার যজ্ঞানুষ্ঠানের নিয়ম সম্বন্ধে বেদে যে আভাস পাওয়া যায়, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋকটী আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে—

"স সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ পরিব্যত তন্তুং তন্বানস্ত্রিবৃতং যথা বিদে।"

ঋঃ ১০ম, ৮৬সূ।

এই সোম যেন সূর্য্যকিরণময় পরিচ্ছদ ধারণ করিতেছেন; আমার মনে হয় ত্রিগুণ সূত্র টানিতেছেন (অর্থাৎ দিনের মধ্যে ৩ বার যজ্ঞ হয়)। (রমেশ বাবুর অনুবাদ)।

মনুক্ত যজ্ঞোপবীতের "ত্রিবৃৎ" বিশেষণ বেদের এই ত্রিবৃৎ হইতেই গৃহীত মনে হয়। সূত্র কথাটীও বেদের এই "তন্তু" হইতে কল্পিত। এখন ৩ বার যজ্ঞস্থলে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

আবার উপবীতের আর একটী নাম "ত্রিদণ্ডী"। কায়, বাক্য ও মনের উপর এই উপবীতের দ্বারা শাসন দণ্ড পরিচালিত হয় বলিয়াই ইহার নাম "ত্রিদণ্ডী"। "কায়বাঙ্‌মনোদণ্ডযুক্তঃ" ইতি শ্রীভাগবতম্‌। অতএব বুঝা যাইতেছে বৈদিক যুগে উপবীত গ্রহণেই মানুষের ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। তাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্‌ দ্বিজ উচ্চতে।" প্রথমে শূদ্ররূপেইজন্ম হয়, পরে সংস্কার দ্বারা দ্বিজ নামে কথিত হইয়া হইয়া থাকে।

বৈদিক ধর্ম্মসূত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, উত্তরীয় অর্থাৎ চাদরকে উপবীত করিবে। চাদরের অভাবে সূতাকে উপবীত করিবে। যজ্ঞের সময়ে যেরূপ বস্ত্র ধারণ করা হয় তাহারই নাম যজ্ঞোপবীত। অধুনা প্রত্যেক শুভ কর্ম্মে ব্রাহ্মণেতর জাতিকে যে ভাবে উপবীত-আকারে উত্তরীয় পরিধান করাইয়া থাকেন ইহাই প্রাচীন বৈদিক প্রথা। উপবীত না হইলে কোন দৈব বা পৈত্র্য কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। বর্ত্তমানে যজ্ঞোপবীত শব্দটী যজ্ঞ সময়ের চাদর পরিধান বা সূতা পরিধান হইতে উন্নত পদ পাইয়া সর্ব্বদা স্কন্ধস্থিত সূত্ররূপে স্থান পাইয়াছে। আমাদের এই কথায় দ্বিজাতি-সমাজ চমকিত হইতে পারেন। কিন্তু চমকিত হইলে চলিবে কেন? এ সকল কথা যে তাঁহাদেরই পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্য ঋষিদের উদার-নীতি। ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া যায়, মহারাজ বল্লাল সেন বৌদ্ধ ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-তান্ত্রিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, হিন্দু-তান্ত্রিকগণের উন্নতি কল্পে ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধি প্রবর্ত্তিত করেন। এই সময়ে দেশের লোক বৈদিক-সংস্কারাদির উপর তেমন বিশেষ আস্থাবান ছিলেন না। তান্ত্রিকতার অবাধ প্লাবনে দেশ ডুবিয়া গিয়াছিল। যাঁহারা বেদাচার অনুসারে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা সময়ে সময়ে তাহা ফেলিয়াও দিতেন। উপবীত ধারণ তখন একরূপ লোকের স্বেচ্ছাধীন ছিল। বল্লাল ইহার সংস্কার সাধনে তাদৃশ কৃতকার্য্য হন নাই। পরে তৎপুত্র মহারাজ লক্ষ্মণ সেন এইরূপ রাজ-আইন বিধিবদ্ধ করেন যে, "যে ব্যক্তি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা

করিবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা উপবীত ধারণ করিতেই হইবে। নতুবা ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে পারিবেন না।" এই রাজ-শাসনে দেশস্থ অনেকেই উপবীত গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইলেন। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ ও বৈদিক-বৈষ্ণবগণের যে সর্ব্বদা উপবীত ধারণের রীতি প্রচলিত দেখা যায়, উহা উক্ত রাজ-শাসনের ফল বলিয়া অনুমিত হয়। এই সময়ে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত হওয়ায় সমাজ-শাসনের ভয়ে অন্ন-বিচারও প্রবর্ত্তিত হয়।" একটু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে, বর্ত্তমানে যজ্ঞোপবীত ধারণের যে রীতি দেখা যায়, উহা বৈদিক বিধানের নয়। কারণ উহার গ্রন্থি শিথিল করা যায় না। বিশেষতঃ চাদরের উপবীত করা চাই, অভাবে সূতার। কিন্তু ভারতবর্ষ নির্ধন, কাজেই চাদরের স্থলে সূতাই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। আরও কৌতুকের বিষয় "পারস্কর গৃহ্য-সূত্রে" উপনয়নের সময়ে উপবীত ধারণের বিধান নাই। ভাষ্যকারেরা টানাটানি করিয়া উপবীতের বিষয় আনিয়াছেন। যথা:—

"অত্র যদ্যপি সূত্রকারেণ যজ্ঞোপবীত ধারণং ন সূত্রিতং তথাপ্যেক বস্ত্রা প্রাচীনাবীতিন ইতি প্রেতোদকদানে প্রাচীনাবীতিত্ব বিধানাৎ "ইত্যুপক্রম্য" যজ্ঞোপবীত-ধারণং তাবদুপনয়ন প্রভৃতি প্রাপ্তম্। তচ্চ কুত্র কর্ত্তব্য ইত্যবসরাপেক্ষায়াং ঔচিত্যাৎ মেখলাবন্ধনানন্তরম্ যুজ্যতে। এতদেব কর্কোপাধ্যায় বাসুদেব দীক্ষিত রেণুদীক্ষিত প্রভৃতয়ঃ স্ব স্ব গ্রন্থে যজ্ঞোপবীত ধারণ মাত্রাবসরে লিখিতবন্তঃ।" হরিহর ভাষ্য, ২য় কাণ্ড, ২য় কণ্ডিকা ৯।১০ সূত্র।

এই স্থানে যদ্যপি সূত্রকার যজ্ঞোপবীত ধারণ লেখেন নাই, তথাপি একবস্ত্র ও প্রাচীনাবীতী হইয়া প্রেত কার্য্য করিবার বিধান থাকায় (প্রেতের উদকদান-প্রকরণে প্রাচীনাবীতিত্ব অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত ধারণ বিধান থাকায়) যজ্ঞোপবীত ধারণ কোথা করা চাই? এই অপেক্ষায় ঔচিত্য হেতু মেখলা বন্ধনের পর ধারণ করা উচিত। অতএব কর্কোপাধ্যায়, বাসুদেব দীক্ষিত ও রেণু দীক্ষিত প্রভৃতি

নিজ নিজ গ্রন্থে এই অবসরে যজ্ঞোপবীত ধারণ লিখিয়াছেন।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, উপনয়নের সময়ে যজ্ঞোপবীত ধারণ পারস্কর আচার্য্যের মতে তত আবশ্যক বিবেচিত হয় নাই। অনুমান হয়, বৈদিক সময়ে যজ্ঞাদি কর্ম্মের সময়েই উপবীত চাদররূপে ঝুলাইবার প্রথা ছিল। চাদরের অভাবে সূত্র ধারণ করা হইত। পরে স্মার্ত্ত যুগে নিজেকে সর্ব্বদা যাজ্ঞিক বলিয়া পরিচয় দিবার জন্য সর্ব্বকালে উপবীত ধারণের বিধান হইল। পরে তাহার ধারণের মন্ত্র, প্রস্তুতের রীতি ও পরিত্যাগের দোষাদি প্রচলিত হইল।

যজ্ঞোপবীত ধারণের মন্ত্র—

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরম পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ
সহজং পুরস্তাৎ আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ,
শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ।"

(ব্রহ্মোপনিষদ্ ২৪।)

আরও রহস্যের বিষয়, উপনয়নেও যজ্ঞোপবীত ধারণের বিধান নাই। আরুণি, উদ্দালক ঋষির যজ্ঞে বৃত হইয়া উদীচ্য দেশে গমন করেন। তথায় শৌনকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার নিকট সমিধ্‌হস্তে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"আমাকে উপনীত করুন।" শৌনক বলিলেন—"তুমি অধ্যয়ন করিবে"? আরুণি বলিলেন—

"যানেব মা প্রশ্না ন প্রাক্ষিস্তানেব মে ব্রূহীতি।"

যজুর্ব্বেদ, শতপথ ব্রাহ্মণে ১১।২।৭।৯।

আপনি যে সমস্ত প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাই পাঠ করিব।"

তখন শৌনক কহিলেন—

"স হোবাচানুপেতায়ৈব ত এতান্ ব্রবানিতি।"

তোমাকে উপনীত না করিয়াই আমি এ সকল তোমাকে বলিব।

ইহাতে জানা যায়, তৎকালে উপনয়ন এক জীবনে কয়েকবার হইত এবং উপনীত না করিয়াও শিক্ষা দেওয়া হইত।

ইহার পর আরও একটী রহস্যের কথা আছে, তৎকালে শূদ্রগণেরও উপনয়ন বিধান ছিল—পারস্কর গৃহ্যসূত্রে হরিহর ভাষ্যধৃত আপস্তম্বসূত্রম্—

"শূদ্রাণা মদুষ্টকর্ম্মণামুপনয়নম্।"

অদুষ্টকর্ম্মণাং মদ্যপান-রহিতানামিতি কল্পতরুকার।

অর্থাৎ অদুষ্ট-কর্ম্ম শূদ্রের উপনয়ন করা কর্ত্তব্য। মদ্যপান-রহিতকে অদুষ্ট-কর্ম্ম বলা হয়, ইহা কল্পতরুকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক সময়ে মদ্যপানাদি রহিত ও সদাচারী শূদ্রগণেরও উপনয়ন দিবার বিধান দৃষ্ট হয়।—এই জন্য বেদে শূদ্রেরও অধিকার দৃষ্ট হয়— যজুর্ব্বেদ মেঘ-মন্দ্রে গর্জ্জন করিয়া সমভাবে আচণ্ডাল সকলের জন্য বিদ্বেষ-বৈষম্যের অন্ধ-তমসা বিনষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মাবদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্ম রাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়॥"

যজু, ২৬।২।

ভগবান্ বলিতেছেন—আমি যেমন সমস্ত মনুষ্যের জন্য এই পরমকল্যাণকারী ঋগ্বেদাদি বেদবাণীর উপদেশ দিতেছি, তোমরাও সেইরূপ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র, দাসদাসী ও অত্যন্ত নীচ ব্যক্তিকেও ইহার উপদেশ দিবে অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি করাইবে।

ইতি পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—উপবীতের একটী নাম "পবিত্র"। এই "পবিত্র" শব্দের অপভ্রংশ "পৈতা"। শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৫শ, বিলাসে, বৌধায়ন-সংহিতা মতে পবিত্রারোপণ বিধি উদ্ধৃত হইয়াছে। যাঁহারা অনুপবীতী বা ব্রাত্য বৈষ্ণব, সংস্কার করিয়া উপবীত গ্রহণের আর সময় নাই, দীক্ষাও হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা এই শ্রীহরিভক্তি বিলাসোক্ত "পবিত্রারোপণ" বিধান অনুসারে "পবিত্র" বা পৈতা ধারণ করিতে পারেন। ইহার মাহাত্ম্য ও নিত্যতা বিশেষ-

ভাবে উক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিক আলোচনা অনাবশ্যক। দুইজন সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যের অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

(১)

বিরাট শ্যামানন্দী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মুকুটমণি—ভক্তিরাজ্যের বৈষ্ণব-রাজচক্রবর্ত্তী, ময়ুরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, ময়নাগড়াদি অষ্টাদশ রাজবংশ, শতাধিক জমিদার বংশ ও শতসহস্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বংশের প্রপূজ্য গুরুদেব প্রভুপাদ শ্রীলশ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের—

বৈষ্ণবের উপবীত-ধারণ সম্বন্ধে অভিমত।

"পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব জাতি গণের উপবীত ধারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাষ-পত্র পরে পাঠাইব। তবে তাহার মর্ম্ম এই যে,—বৈষ্ণব ইচ্ছা করিলে শ্রীভগবৎ-প্রসাদ স্বরূপে উপবীত ধারণ করিতে পারেন। সেজন্য নিত্যতাও নাই, নিষেধও নাই। বৈষ্ণব জাতির গর্ভাধানাদি উপনয়ন পর্য্যন্ত বৈদিক সংস্কার ইচ্ছানুসারে হইতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে উহার প্রয়োজনীয়তা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি হইতেছে। কিন্তু সংস্কার সকল কৃত হইলে যেন শ্রীভগবৎ-প্রাধান্য থাকে, অন্য দেবের প্রাধান্য না হয়।"

স্বাঃ শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীপাঠ গোপীবল্লভপুর।"

(২)

প্রসঙ্গক্রমে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি "শ্রীহরিভক্তি-বিলাস" ও "সৎক্রিয়াসারদীপিকাদি" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামি-প্রতিষ্ঠিত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউর সেবাইৎ মাধ্বগৌড়েশ্বরাচার্য্য শ্রীল শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম-রচিত 'সংস্কার-তত্ত্ব' নামক পুস্তক হইতে বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

"গর্ভাধান সে আরম্ভ কর অস্পৃহা পর্য্যন্ত আড়তালীসো সংস্কারো দীক্ষা মেঁ হোতে হৈ। যো যথাবিধি সাম্প্রদায়িক আচার্য্যোসে দীক্ষা গ্রহণ করতে হৈঁ উন্‌কে অড়তালীসো হী সংস্কার হো জাতে হৈ।

যজ্ঞোপবীত সংস্কার ভী ইন্ আড়তালিসোঁ সংস্কারোঁ কে অন্তর্গত হৈ। দীক্ষা গ্রহণ করনে কে সময় বহ ভী হো জাতা হৈ। ইসী সে দীক্ষা-গ্রহণ-করনেবালোঁ কো যজ্ঞোপবীত কো কুছ বিশেষ অপেক্ষা নহী রহতী হৈ। জিন্ লোগোঁ কো দিখাবা হী অধিক প্রিয় হৈ, ধর্ম্মকে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান হি সে বিশেষ রুচি হোতী হৈ, উনকো শ্রীগুরুদেব দীক্ষা কে সময় মালা তিলক আদি বৈষ্ণব চিহ্নো কে সাথ যজ্ঞোপবীত ভী দেদিয়া করতে হৈঁ॥”

সে যাহা হউক, উপনয়ন-সংস্কারের চিহ্ন যেরূপ যজ্ঞোপবীত, সেইরূপ দীক্ষা-সংস্কারের চিহ্ন মালা, তিলকাদি। কিন্তু অনেক যজ্ঞপবীতধারী বর্ণাভিমানী তুলসী মালা ধারণ বৃথা কাষ্ঠবহন বলিয়া নিন্দাবাদ করিয়া থাকেন; তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—মালা যেমন বৃক্ষের অঙ্গ বিশেষ, যজ্ঞোপবীতও কি বৃক্ষোৎপন্ন নহে? তুচ্ছ কর্পাসকে, ‘চরখায়’ কাটিয়া উপবীত প্রস্তুত করিতে হয়। আর পবিত্র তুলসী-শাখাকে কুঁদযন্ত্রে কুঁদিয়া মালা প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যজ্ঞসূত্রে ও মালায় কি বিভেদ তাহা সুধীজনের বিবেচ্য। আবার অনেকে বলেন—তিলক-মালা ধারণ করিলেই কি ভগবান্ ও ভক্তিকে কিনিয়া লওয়া হয়? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে,—উপবীত-সংস্কারে কি দ্বিজত্ব একচেটিয়া? বিনা উপবীতে কি কেহ দ্বিজ হইতে পারেন না, কি কেহ বেদ পাঠ করিতে পারেন না? যাঁহারা বেদ-সম্মত বৈষ্ণবী-দীক্ষার মাহাত্ম্য অবগত আছেন, তাঁহাদের মুখে কদাচ এরূপ অসার কুতর্কবাদ শোভা পায় না।

উপবীত ও মালায় প্রভেদ কি।

ফলতঃ উপবীত যেমন দ্বিজত্বের দ্যোতক, সেইরূপ দীক্ষালব্ধ মালা-তিলকও বৈষ্ণবত্ব বা দ্বিজত্বের দ্যোতক। উপবীত ব্যতীত যেমন যজ্ঞাদিতে অধিকার হয় না, সেইরূপ তিলক মালা ব্যতীত ভজন, যজন, ধ্যান, উপাসনাদিতে অধিকার জন্মে না। এই জন্যই দীক্ষা-সংস্কারে মালা তিলক ধারণের বিধি দৃষ্ট হয়। দীক্ষিত

ব্যক্তি অর্থাৎ বৈষ্ণবজন উহা উপবীতের ন্যায় নিত্য ধারণ করিয়া থাকেন।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যের নিকট যথাবিহিত দীক্ষা গ্রহণ করিলে, যখন বেদোক্ত ৪৮ সংস্কারই সংসিদ্ধ হয় এবং বিজত্ব লাভ ঘটে, তখন দীক্ষার সময় উপনয়ন-সংস্কারও সিদ্ধ হইয়া যায়। যেহেতু যজ্ঞোপবীত সংস্কার উক্ত ৪৮ সংস্কারেরই অন্তর্গত। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তির যজ্ঞোপবীতধারণের

দীক্ষাসূত্র।

বিশেষ অপেক্ষা দেখা যায় না। তথাপি যাঁহারা ধর্ম্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানে অধিক নিষ্ঠাবান হয়েন, শ্রীগুরুদেব দীক্ষার সময়ে তাঁহাকে যজ্ঞোপবীতও প্রদান করিয়া থাকেন। এজন্য অনেকে ইহাকে "দীক্ষাসূত্র" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে শত আছে তাহাতে পঞ্চাশও আছে, এই শত-পঞ্চাশ ন্যায়ানুসারে দীক্ষিত ব্যক্তির উপনয়ন-সংস্কারের চিহ্ন-ধারণ কদাচ অবৈধ নহে, পরন্তু শাস্ত্রসম্মত। এইরূপেও আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে উপবীত-ধারণ প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। তবে যখন সাধক, সাধনায় চরম সীমায় উপনীত হন, তাঁহার বাহ্য যজ্ঞসূত্র ধারণের আর প্রয়োজন হয় না। ফলতঃ তখন আর তাঁহার কোন চিহ্নই থাকে না। যথা—ব্রহ্মোপনিষদে—

"বহিঃ সূত্রং ত্যজেদ্বিদ্বান্ যোগমুত্তমমাস্থিতঃ।
ব্রহ্মভাবময়ং সূত্রং ধারয়েদ্ যঃ সঃ চেতনঃ॥"

উত্তম যোগাশ্রিত (ভক্তিযোগাবলম্বী) বিদ্বান্ (তত্ত্ববিদ্) ব্যক্তি বাহ্যসূত্র ত্যাগ করিবেন। যিনি ব্রহ্মভাবময় সূত্র ধারণ করেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। অতএব—

"ইদং যজ্ঞোপবীতন্তু পরমং যৎ পরায়ণম্।
স বিদ্বান্ যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ স যজ্ঞঃ স চ যজ্ঞবিৎ॥" ঐ

এই পরম জ্ঞানময় অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানময় যজ্ঞোপবীতই যাঁহার আশ্রয়, সেই বিদ্বান্ ব্যক্তিই প্রকৃত যজ্ঞোপবীতী—তিনি বিষ্ণুস্বরূপ ও বিষ্ণুবিৎ অর্থাৎ

পরম বৈষ্ণব।

এরূপ সাধনায় উচ্চস্তরস্থিত বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের আবশ্যকতা না থাকিলেও, গৃহস্থ জাতি-বৈষ্ণবগণের পক্ষে বহিঃসূত্র ধারণ বা উপনয়ন-সংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু, এই বহিঃসূত্র সেই ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানময় যজ্ঞোপবীতের স্মারক-চিহ্ন। আরও তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ শ্রীগুরু সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়ার নিমিত্তই এই সংস্কারের নাম 'উপনয়ন'। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজনোন্মুখ হইতে হইলে জাতি-বৈষ্ণবের পক্ষে উপনয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণবের উপবীত ধারণের প্রয়োজনীয়তা।

সামান্যতঃ বিষ্ণু-মন্ত্র দীক্ষাপ্রাপ্ত বা তন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবাচারী সামান্য বৈষ্ণব অপেক্ষা আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবগণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাঁরা ধর্ম্মে, কর্ম্মে, বর্ণে সর্ব্বাবয়ব বৈষ্ণব। শাস্ত্র যে বৈষ্ণবকে বিপ্রতুল্য বা "বৃত্ত ব্রাহ্মণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা প্রধানতঃ এই বৈদিক-বৈষ্ণবকেই বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিজাতি বর্ণের ন্যায় বৈদিক-বৈষ্ণব জাতিরও যজ্ঞোপবীত-সংস্কারের যে প্রয়োজন আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

যদিও চিহ্ন বস্তুর স্বরূপ নহে, তথাপি ইহার আবশ্যকতা যে একবারেই নাই, এমত নহে। ১, ২, ৩, ৪, প্রভৃতি চিহ্ন না থাকিলে গণিত-শাস্ত্র যেমন অসম্ভব, সেইরূপ বাহ্যচিহ্ন ব্যতিরেকে কার্য্যক্ষেত্রে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে সহজে নির্ব্বাচন করিবার পক্ষেও বিশেষ অসুবিধা। তবে বস্তুর সহিত উহার ভ্রম হওয়া কদাচ উচিত নহে। সুতরাং বাহ্য চিহ্নেরও যে আবশ্যকতা আছে, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইল। এইরূপ প্রথমে বাহ্যচিহ্ন ধারণে আসক্তি আসিলে ক্রমে উহার অনুরূপ শক্তি-লাভ-প্রবৃত্তিরও উদয় হওয়া যথেষ্ট সম্ভাবনা। এ অবস্থায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের উপবীত-সংস্কার প্রধানতঃ ভগবদ্ভজনেরই অনুকূল বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ অর্চ্চন-মার্গে শ্রীভগবানকে উপবীত নিবেদন করিতে হয়; ভগবন্নির্ম্মাল্য ভক্তের প্রাপ্য। অতএব বৈষ্ণবজন অন্ততঃ ভগবৎ-নির্ম্মাল্য স্বরূপে উপবীত

ধারণ করিলেও ভক্তির বাধক না হইয়া বরং পোষকই হইয়া থাকে। "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা'।"

বৈষ্ণব-বালকের 'সংস্কার' চিরপ্রসিদ্ধ ও সাধুজনাচরিত। ইহা বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলনের ফল বা নূতন কল্পিত নহে এবং সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণবৎও নহে। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মহাজনগণ যে প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়াছেন ও করিতেছেন সেই প্রথানুযায়ী সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব-বালকদিগের সংস্কার হওয়া কর্ত্তব্য। "সৎক্রিয়া-সারদীপিকাদি" বৈষ্ণব পদ্ধতিতে বৈষ্ণবোপনয়ন ও বিবাহাদি সংস্কার সুন্দররূপে বিধিবদ্ধ আছে।

বৈষ্ণব দুই প্রকার,—সামান্য ও সাম্প্রদায়িক। যথা—

"বৈষ্ণবোঽপি দ্বিধাপ্রোক্তঃ সামান্য সাম্প্রদায়িকঃ।
সামান্যস্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো **বৈদিকঃ** সাম্প্রদায়িকঃ॥
সাম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্যাদ্ গৃহী ন্যাসী প্রভেদতঃ॥" সংস্কার-দীপিকা।

যাঁহারা সামান্যতঃ বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন অথবা যাঁহারা তন্ত্রোক্ত বৈষ্ণবাচারী, তাঁহারা সামান্য বৈষ্ণব এবং সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবই বৈদিক। এই সাম্প্রদায়িক বা বৈদিক বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ ভেদে দ্বিবিধ। এই গৃহস্থ বৈদিক বৈষ্ণব-জাতি বৈদিক বিধান অনুসারে ভক্তি-অনুকূল বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালন করেন বলিয়া ইহাঁদের ক্রিয়াঙ্গ এই বহিঃসূত্র অবশ্য ধারণীয়। যথা—ব্রহ্মোপনিষদে—

কর্ম্মাণ্যধিকৃতা যে তু বৈদিকে ব্রাহ্মণাদয়ঃ।
তৈঃ সন্ধ্যার্ঘ্যমিদং সূত্রং ক্রিয়াঙ্গং তদ্বিধৈ স্মৃতম্॥"

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বৈদিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে তাঁহাদের ক্রিয়াঙ্গ এই বহিঃসূত্র অবশ্য ধারণ করা বিধেয়। তবে ন্যাসী-বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা। তাঁহারা উপবীত রাখিতেও পারেন, না রাখিলেও কোন দোষ হয় না। ফলতঃ গৃহস্থ-

বৈদিক-বৈষ্ণবগণ দীক্ষার দ্যোতক তিলক মালার সহিত দ্বিজত্বের দ্যোতক যজ্ঞো-পবীতও ধারণ করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণবের উপবীত ধারণ অবৈদিকী নহে।

বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদমূলক। বৈষ্ণবজন বৈদিক বিধান অনুসারেই সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণবের উপবীত-সংস্কার অবৈদিকী নহে। আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র বলেন—(প্রপা ২। পঃ ২। কঃ ৪)।

" নিত্যমুত্তরং বাসং কার্য্যম্॥ ২১॥
অপি বা সূত্রমেবোপবীতার্থে॥২২॥"

ভাষ্য।—কেস্বুচিৎ কালেষু যজ্ঞোপবীতং বিহিতং ইহ তু প্রকরণাদ্‌গৃহস্থস্য নিত্যমুত্তরং বাসং কার্য্যমিত্যুচ্যতে। অপি বা সূত্র মেব সর্ব্বেষামুপবীত কৃত্যে ভবতি ন বাস এব॥ ২১। ২২॥"

অর্থাৎ কোন্ কোন্ কালে যজ্ঞোপবীত বিহিত, তাহা এই প্রকরণে কথিত হইতেছে যে, গৃহস্থের নিত্য উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত করা আবশ্যক। বস্ত্রের অভাবে সকলে সূত্রদ্বারা উপবীত করিবে। বস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, সূত্রদ্বারাই একরূপ কার্য্যোদ্ধার হইবে। আপস্তম্ব শ্রৌতসূত্র আরও বলেন—

" যজ্ঞোপবীতানি প্রাচীনাবীতানি কুর্ব্বতে বিপরিক্রামন্তি চ।"

ভাষ্য।—অথ সর্ব্বে যজ্ঞোপবীত কৃতানাং বাসসাং সূত্রানাং বা গ্রন্থীন্ বিশ্রংস্য প্রাচীনাবীতানি কৃত্বা গ্রথ্নীয়ুঃ ব্যত্যয়েন পরিক্রামন্তি চ।"

বস্ত্র বা সূত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত করিতে হইবে। বামস্কন্ধে স্থাপন করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে আলম্বিত করিতে হইবে। পরে উহার গ্রন্থি শিথিল করিয়া প্রাচীনা-বীত করিতে হয়, অর্থাৎ দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপন করিয়া বামপার্শ্বে আলম্বিত করিতে হয়। দক্ষিণাবর্ত্ত হইতে বামাবর্ত্ত পরিক্রমণ করিতে হয়।

এই সকল শ্রৌত প্রমাণ ও যুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্তিত হইল যে,

আলোচ্য-বৈদিক বৈষ্ণবদিগের উপবীত-সংস্কার স্বেচ্ছাচার প্রসূত নহে, সম্পূর্ণ বেদ-সম্মত ও প্রকৃত যুক্তিমূলক। অধুনা বৈষ্ণব-জাতি-সমাজে উপবীত-গ্রহণের দ্বিবিধ প্রথা দৃষ্ট হয়। যথা সময়ে বৈষ্ণব-বালকদিগকে উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া উপবীত প্রদান এবং কেহ কেহ দীক্ষার সময়ে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতেও গ্রহণ করিয়া থাকেন; উভয় বিধানই প্রশস্ত। তথাপি যথারীতি সংস্কার পূর্ব্বক উপবীত গ্রহণই অধিক প্রশস্ত।

ত্রয়োদশ উল্লাস।

——:o:——

বৈষ্ণবের অধিকার।

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেতর বর্ণোৎপন্ন হইলেও তাঁহার যে শ্রীশালগ্রাম শিলার্চ্চনে অধিকার আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগোবর্দ্ধন-শিলার্চ্চন-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। ভগবৎপর স্ত্রী শূদ্রাদিরও শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকার আছে। যথা—শ্রীহরিভক্তি বিলাসে—

" এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈ শালগ্রাম-শিলাত্মকং।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শূদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতপরৈঃ॥"

টীকাকার এই শ্লোকোক্ত " ভগবতপরৈঃ " পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—" যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎ-পূজা পরৈঃ সদ্ভিরিত্যর্থঃ।" অতএব যে ব্যক্তি যথাবিধি বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হইয়াছেন, তিনি অবশ্যই বিষ্ণু পূজাধিকারী হইবেন। কারণ, দীক্ষা দ্বারাই তাঁহার দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয় এবং সকল পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার অধিকার জন্মে। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষিত ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ পূজার নিত্যতা সম্বন্ধে উল্লিখিত আছে—

"লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্র-দেবতাং।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতাং॥" আগমে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চ্চনা না করে, তাহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্র-দেবতা তদীয় অনিষ্ট সাধন করেন। আবার " পুংসো-গৃহীত-দীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ

সনাতন লিখিয়াছেন " পুংসঃ পুংমাত্রস্যেত্যর্থঃ, শ্রীবিষ্ণু-দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ॥" অতএব অনন্যশরণ সদাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীশালগ্রামার্চ্চনে অধিকারী তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। ফলতঃ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ করিলেই তাঁহার শ্রীবিষ্ণু পূজায় অধিকার জন্মে।

যদি বলেন " শূদ্রাদি কুলোৎপন্ন সংসার-ত্যাগী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাত্মারাই শ্রীশিলার্চ্চনে অধিকারী। * * যাঁহারা পুত্রদারাদি সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সেইরূপ শূদ্রাদি শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণব হইলেও তাঁহাদের শিলার্চ্চনাদি গ্রহণ দস্ততা মাত্র।"

এরূপ সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, টীকাকার—"শ্রীকৃষ্ণ-দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ সর্ব্বেষামেব তত্রাধিকারাৎ" বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ পূজায় গৃহী ও ত্যাগী নির্ব্বিশেষে ভগবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই শ্রীশালগ্রামপূজায় অধিকার দিয়াছেন।" যদি বলেন—" অধিকার লাভ করিলেও স্বয়ং পূজা করিতে পারেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণই করিবে?"—এরূপ আশঙ্কাও থাকিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে—

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রী-শূদ্র-কর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রাম-শিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণী গমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥" স্মৃতি।

এই স্মৃতির বচনকে অবৈষ্ণবপর বলিয়া খণ্ডন করিবেন কেন? শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়—

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা।
শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥"

স্কান্দে শ্রীব্রহ্ম নারদ-সংবাদ।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও সৎশূদ্র অর্থাৎ শূদ্র-কুলোৎপন্ন বৈষ্ণবের কেবল শ্রীশালগ্রাম পূজায় অধিকার আছে, অসৎ শূদ্রের নাই।

আবার এই শূদ্রের অধিকার প্রসঙ্গে বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

" অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থ মাচরেৎ।
পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েৎ ॥"

শূদ্র অযাচক হইয়া দান, কৃষিবৃত্তি, পুরাণ শ্রবণ ও নিত্য শ্রীশালগ্রাম পূজা করিবেন।

" এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহমিতি বচনস্য বিরোধান্মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈ কৈশ্চিৎ কল্পিত মিতি মন্তব্যঃ।"

সুতরাং উক্ত মহাপুরাণের বচনের সহিত " ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোহং " এই স্মৃতি বাক্যের বিরোধ দর্শনে বুঝা যায় কোন মাৎসর্য্যপর স্মার্ত্তজন কর্ত্তৃকই উক্ত প্রমাণ কল্পিত হইয়াছে। যদি বা যুক্তিমুখে উহা সমূলক বলিয়াই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবৈষ্ণব স্ত্রীশূদ্রাদি কর্ত্তৃক শ্রীশালগ্রাম পূজা কর্ত্তব্য না হইতে পারে ; কিন্তু—" যথাবিধি গৃহীত বিষ্ণুদীক্ষাকৈ স্তৈঃ কর্ত্তব্যেতি ব্যবস্থাপনীয়ম্ " অর্থাৎ যাঁহারা যথাবিধি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশাল-গ্রাম পূজা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই ব্যবস্থা।

সত্য বটে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

" শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরের্ভক্তি রুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥"

পুনশ্চ—

"শ্রুতি স্মৃতি মমৈবাজ্ঞে যস্ত উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মমদ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥"

এই সকল শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণাদিতে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবাদি সকল সম্প্রদায়ের জন্যই বিধিনিবদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই বিধি সমূহের মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের অনুকূল বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় লিখিয়াছেন—

"শ্রুত্যাদয়োঽপাত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকারা প্রাপ্তা স্তদ্ভাগা এব জ্ঞেয়াঃ। যে স্বেঽধিকার ইত্যুক্তেঃ।"

অতএব বৈষ্ণবজনকে শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবাধিকারের বিধিই মানিয়া চলিতে হইবে। শাক্ত শৈবাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধি বৈষ্ণবের আচরণীয় নহে। তবে শ্রুতিস্মৃতিপুরাণোক্ত বৈষ্ণব বিধির অনাদরে আত্যন্তিকী হরিভক্তিও উৎপাতের কারণ হয়। অন্য অবৈষ্ণব বিধি-লঙ্ঘনে নহে, ইহাই তাৎপর্য্য।

শ্রীশালগ্রাম বিষ্ণুপূজায় বৈষ্ণবের যখন নিত্যাধিকার, তখন সেই বিষ্ণু-বাচক প্রণব বা ওঙ্কারেও যে অধিকার আছে, তাহা লেখা বাহুল্য মাত্র। আজকাল আমরা অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাই বলিয়াই এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার যাহাতে অধিকার, তাহা প্রাপ্ত হইলে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ বিশেষ প্রসরতর ও সুগম হইয়া থাকে। অতএব ন্যায্য অধিকার লাভ করিয়া সকলেরই ন্যায়পথে ও ধর্ম্মপথে বিচরণ করা কর্ত্তব্য। নতুবা কদাচ আত্মোন্নতি লাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

প্রণবে অধিকার

বিষ্ণুই বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা—বিষ্ণুই বৈষ্ণবের প্রাণ, সেই বিষ্ণু-বাচকই প্রণব। গীতাভাষ্যে উক্ত হইয়াছে— "ওঙ্কারোবিষ্ণুরব্যয়ঃ। ভগবদ্বাচকঃ প্রোক্তঃ।" অতএব বিষ্ণু ও ওঙ্কারে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ। "অয়মস্য পিতা, অয়মস্য পুত্র," এই পিতাপুত্র সম্বন্ধের ন্যায় বিষ্ণুই বাচ্য, এবং প্রণবই সেই বিষ্ণুর বাচক অর্থাৎ বিষ্ণুর স্থিতিনির্দ্দেশকারী। বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সঙ্কেতকৃত্যং বাচ্যবাচকত্বম্। সঙ্কেতস্ত ঈশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে 'অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্রঃ ইতি।"

আবার কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যানে রামভদ্র বলিয়াছেন—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষ
বিশেষঃ ঈশ্বরঃ। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।"

অতএব এই বিষ্ণু-প্রতিপাদক ওঙ্কারে যে বিষ্ণুগতপ্রাণ বৈষ্ণবের নিত্যাধিকার আছে, তাহা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে।

আবার ওঙ্কার বিষ্ণু-প্রতিপাদক বলিয়াই অন্তকালে ওঙ্কার স্মরণের বিধান শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"ওঙ্কারং বিপুলমচিন্ত্যমপ্রমেয়ং
সূক্ষ্মাখ্যাং ধ্রুবমচরং চ যৎ পুরাণম্।
তদ্বিষ্ণোঃ পদমপি পদ্মজ প্রসূতং
দেহান্তে মম মনসি স্থিতিং করোতু॥

অর্থাৎ যিনি বিপুল, অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, সূক্ষ্ম, ধ্রুব, অচর ও পুরাণ, সেই ওঙ্কাররূপী বিষ্ণুর শ্রীচরণ-কমল আমার দেহান্তকালে চিত্তে অবস্থিতি করুক।

"ও মিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম আহরণ্ মামনুস্মরন্।
য প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥ গীতা।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন,—যে ব্যক্তি দেহত্যাগের সময় ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম-প্রতিপাদক মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে জীবন ত্যাগ করে সে পরমাগতি লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ ভাবে এই উপদেশ প্রদান করায় ভগবৎপর ব্যক্তি মাত্রেরই যে ওঙ্কারে অধিকার আছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অতএব যাঁহারা কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছু জানেন না, সেই কাষ্ণ বা বৈষ্ণবগণের যে ওঙ্কারে সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শ্রুতি বলেন,—

"ওঙ্কার রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাথ সারথিম্।
ব্রহ্মলোকে পদান্বেষী রুদ্রারাধনতৎপরঃ॥"

অমৃতনাদোপনিষৎ।

অর্থাৎ রুদ্রারাধনতৎপর সাধক ওঙ্কার রূপ রথে আরোহণ করিয়া এবং বিষ্ণুকে সেই রথের সারথি করিয়া ব্রহ্মলোকপদের অন্বেষণ করিবেন।

অতএব বিষ্ণুকে লাভ করিতে হইলে বিষ্ণুর রথ স্বরূপ ওঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ বৈষ্ণব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ওঙ্কার মন্ত্রেই বিষ্ণুর অর্চ্চন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তদ্‌যথা—

"তল্লিঙ্গৈ র্বর্চ্চয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বান্ সমাহিতঃ।
নমস্কারেণ পুষ্পানি বিন্যসেত্তু যথাক্রমম্॥
আবাহনাদিকং কর্ম্ম যন্ন সূক্তং ময়া ত্বিহ।
তৎসর্ব্বং প্রণবেনৈব কর্ত্তব্য চক্রপানয়ে॥
যস্তাং পুরুষসূক্তেন যঃ পুষ্পাণ্যপ এব বা।
অর্চ্চিতং স্যাজ্জগদিদং তেন সর্ব্বং চরাচরম্॥
বিষ্ণু ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ বিষ্ণুরেব দিবাকরঃ।
তস্মাৎ পূজ্যতমং নান্যমহং মন্যে জনার্দ্দনাৎ॥"

অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে সর্ব্বদেবগণকেই তল্লিঙ্গ মন্ত্রে অর্চ্চনা করিবে এবং নমস্কারের দ্বারা অর্থাৎ 'নম' বলিয়া যথাক্রমে পুষ্প অর্পণ করিবে। কিন্তু আবাহনাদি কর্ম্ম যাহা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইল না, তৎসমস্তই যথাক্রমে ওঙ্কার পুটিত করিয়া চক্রপাণি শ্রী বিষ্ণুর উদ্দেশে করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পুরুষসূক্তমন্ত্রে তাঁহাকে পুষ্প-জল অর্পণ করে, তাহাতে তাহার চরাচর সর্ব্ব জগতই অর্চ্চিত হইয়া থাকে। যেহেতু, বিষ্ণুই ব্রহ্মা, বিষ্ণুই রুদ্র, এবং বিষ্ণুই দিবাকর। সুতরাং বিষ্ণু ব্যতীত পূজ্যতম আর কেহ নাই।

অতএব সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে প্রণবোপাসনা একান্ত বিধেয়। প্রণবোচ্চারণ করিলে সাধকের ভগবৎ সাক্ষাৎকার লাভ সহজে হইয়া থাকে। যথা—

"ঘণ্টাশব্দবদোঙ্কারমুপাসীত সমাহিতঃ।
পুরুষং নির্ম্মলং শুদ্ধং পশ্যত্যেব নাত্র সংশয়ঃ।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ঘণ্টাশব্দ তুল্য ওঙ্কারের উপাসনা করেন, তিনি সেই নির্ম্মল পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অতএব ওঙ্কার উচ্চারণে যে কেবল দ্বিজাতি বর্ণেরই অধিকার আছে, তাহা নহে। ভগবৎপর সকল ব্যক্তিই ইহার ধ্যানানুস্মরণে অধিকারী। তাই, শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণে ওঙ্কার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে সাধারণ ভাবে উক্ত হইয়াছে যে—

"ইত্যেতদক্ষরং ব্রহ্ম পরমোঙ্কার সংজ্ঞিতম্।
যস্তং বেদ নরঃ সম্যক্ তথা ধ্যায়তি বা পুনঃ॥
সংসার চক্রমুৎসৃজ্য ত্যক্ত ত্রিবিধ বন্ধনঃ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মনিলয়ং পরমং পরমাত্মনি॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই পরম ওঙ্কার সংজ্ঞিত অক্ষরাত্মক ব্রহ্মকে সম্যক্‌রূপে বিদিত হয় বা ধ্যান করে, সে ব্যক্তি সংসার-চক্র হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া ও ত্রিবিধ বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মধামে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যদি বল, যাঁহারা যোগমার্গাবলম্বী সাধক, তাঁহারা দ্বিজাতি বর্ণোৎপন্ন না হইলেও ওঙ্কার উচ্চারণে অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু যাহারা সর্ব্বদা কর্ম্মজালে আচ্ছন্ন, তাহারা কিরূপে ওঙ্কার এই ব্রহ্ম প্রতিপাদক মন্ত্র গ্রহণের অধিকারী হইতে পারে? এই আশঙ্কা-নিরসনার্থ উক্ত শ্রীমার্কণ্ডেয় পুরাণেই উক্ত হইয়াছে—

"অক্ষীণ কর্ম্মবন্ধস্তু জ্ঞাত্বা মৃত্যুমুপস্থিতম্।
উৎক্রান্তিকালে সংস্মৃত্য পুনর্যোগিত্বমৃচ্ছতি॥
তস্মাদসিদ্ধ যোগেন সিদ্ধযোগেন বা পুনঃ।
জ্ঞেয়ান্যরিষ্টাণি সদা যেনোৎক্রান্তৌ ন সীদতি।

অর্থাৎ যাহার কর্ম্মবন্ধন পরিক্ষীণ হয় নাই, এমন কর্ম্মজড় ব্যক্তিও যদি মৃত্যু সমুপস্থিত জানিয়া প্রাণত্যাগকালে ওঙ্কার স্মরণ করে, তবে সে ব্যক্তি পুনরায় যোগীত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহার যোগ সিদ্ধই হউক বা অসিদ্ধ হউক, প্রাণত্যাগের দুঃখ সমূহ অবগত থাকা সত্বেও সে আর মৃত্যুতে অবসন্ন হয় না। বিশেষতঃ—

" যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ম্।
যদমেধ্য মশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ॥
তদোঙ্কার প্রযুক্তেন সর্ব্বঞ্চাবিকলং ভবেৎ॥"

যাহা ন্যূন, যাহা অতিরিক্ত, যাহা ছিদ্রযুক্ত, যাহা অযজ্ঞীয়, যাহা অমেধ্য, অশুদ্ধ ও বিমলিন, তৎ-সমুদায়ই ওঙ্কার প্রয়োগে অবৈকল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব এই পরম মঙ্গলপ্রদ বিষ্ণুবাচক প্রণবে উপাসনাবিহীন অনাচারী শূদ্রদিগের অধিকার না থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহাদের ধর্ম্মে কর্ম্মে, মন্ত্র তন্ত্রে বিষ্ণুই একমাত্র আরাধ্য, বিশুদ্ধ বৈষ্ণবতায় যাঁহাদের নীচ উচ্চ বর্ণাভিমান লয় প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, সেই শ্রেষ্ঠ দ্বিজাচারী বৈষ্ণবগণের বিষ্ণুবাচক প্রণবে অধিকার নাই, একথা যাঁহারা বলিতে সাহসী হন, তাঁহারা নিশ্চয়ই ভ্রান্ত। আর আমাদের যে সকল বৈষ্ণব-ভ্রাতৃবৃন্দ শিক্ষা ও সদাচার হারাইয়া অন্যের ভ্রূকুটীভঙ্গে ভীত হইয়া কোন বৈষ্ণবোচিত কর্ম্ম প্রণব-পুটিত করিয়া সম্পন্ন করিতে সঙ্কোচবোধ করেন, তাঁহারা যে ঘোর মোহাচ্ছন্ন, তাহাতে সন্দেহ কি? বৈষ্ণবের প্রাণস্বরূপ অষ্টাদশাক্ষর শ্রীগোপাল মন্ত্রও ওঙ্কার পুটিত করিয়া জপ করিবার বিধান শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—শ্রীগোপাল তাপনীয় শ্রুতি—

" ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপন্তি,
গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনুং তং।
তস্মৈ চাসৌ দর্শয়েদাত্মরূপং
তথা মুমুক্ষুরভ্যসেন্নিত্যশান্ত্যৈ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা গোবিন্দের সেই পঞ্চপদ মন্ত্র ওঙ্কার পুটিত করিয়া জপ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আত্মরূপ দর্শন করাইয়া থাকেন; সুতরাং মুমুক্ষু মানব অবিনশ্বর শান্তিসুখের জন্য ঐ মন্ত্র অভ্যাস করিবেন।

সুতরাং বৈষ্ণবের ওঙ্কার উচ্চারণে যে নিত্যাধিকার আছে, তাহা এই শ্রুতি-বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। পুনশ্চ উক্ত শ্রুতি বলিয়াছেন—

"এতস্যৈব যজনেন চন্দ্রধ্বজো গতমোহ মাত্মানং
বেদয়িত্বা ওঁকারান্তরালকং মনুমাবর্ত্তয়ৎ সঙ্গ।
রহিতোঽভ্যানয়ৎ। তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা
পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। তস্মাদেনং
নিত্যমভ্যসেদিত্যাদি।"

অর্থাৎ চন্দ্রশেখর শিব ঐ পঞ্চপদ অষ্টাদশার্ণ মন্ত্রের উপাসনা দ্বারা বিগতমোহ হইয়া আত্মাকে বিদিত হইয়াছিলেন এবং ঐ মন্ত্র প্রণব পুটিত করিয়া জপের দ্বারা নিষ্কাম হইয়া তাঁহাকে সমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন অর্থাৎ সেই অপ্রত্যক্ষ পরমাত্মাকেও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যেরূপ গগনে বিস্তৃতনেত্র স্পষ্টরূপে দ্রব্যাদি নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তিরা নিরন্তর বিষ্ণুর ঐ পরম পদ দর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং নিরন্তর ইহা অভ্যাস করিবে।

বিষ্ণুবাচক প্রণবে যে বৈষ্ণবের নিত্যাধিকার আছে তাহা উল্লিখিত হইল। এই প্রণবই বেদ-স্বরূপ। সুতরাং প্রণবোচ্চারণে অধিকার থাকিলে বৈষ্ণবের বেদ-পাঠেও যে অধিকার আছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বিশেষতঃ আমরা সাম্প্রদায়িক গৃহী-বৈষ্ণব, সুতরাং বৈদিক। যথা—

" বৈষ্ণবোঽপি দ্বিধা প্রোক্তঃ সামান্যঃ সাম্প্রদায়িকঃ।
সামান্য স্তান্ত্রিকো জ্ঞেয়ো বৈদিকঃ সাম্প্রদায়িকঃ॥
সম্প্রদায়ী দ্বিভেদঃ স্যাৎ গৃহী ন্যাসী প্রভেদতঃ॥"

সংস্কার-দীপিকা॥

অর্থাৎ সামান্য ও সাম্প্রদায়িক ভেদে বৈষ্ণব দুই প্রকার। তন্ত্রমার্গাবলম্বী সাধক কুলাচার, বীরাচার, শৈবাচারাদি তন্ত্রোক্ত পঞ্চাচারের মধ্যে যখন বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করেন, তখন তিনি সামান্য বা তান্ত্রিক বৈষ্ণব নামে অভিহিত হন। এই বৈষ্ণবাচার গ্রহণের সময়ে সাধক যে-কোন বর্ণোৎপন্ন হউক না কেন, গুরু, তাঁহাকে উপবীত প্রদান করেন। তখন তাঁহার উচ্চনীচ জাতিভেদ নিরস্ত হইয়া যায় এবং

দেবত্ব লাভ করেন। তাই মুণ্ডমালা তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে—

" শাক্তাশ্চ শাঙ্করা দেবি যস্য কস্য কুলোদ্ভবাঃ।
চাণ্ডালাঃ ব্রাহ্মণাঃ শূদ্রাঃ ক্ষত্রিয়াঃ বৈশ্যসম্ভবাঃ॥
এতে শাক্তা জগদ্ধাত্রি ন মনুষ্যাঃ কদাচন।
পশ্যন্তি মনুষ্যাঃ লোকে কেবলং চর্ম্মচক্ষুষা॥"

"সে যাহা হউক, বেদপাঠেও যখন বৈষ্ণবের অধিকার (বিপ্রসাম্য সিদ্ধত্বাৎ) আছে, তখন পারমহংস সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে বৈষ্ণবের যে নিত্যাধিকার আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ৩য়, বিলাসের টীকায় লিখিয়াছেন " এবং শ্রীভাগবত-পাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ!"

—:০:—

চতুর্দ্দশ উল্লাস।

—:০:—

দীক্ষাদানাধিকার।

দীক্ষা বিধানে গুরূপসত্তিতে সদ্‌গুরু আশ্রয় করিবে, এরূপ উক্তি আছে। এস্থলে "সৎ" শব্দে কেবল সদ্‌ব্রাহ্মণই বুঝিবেন না, পরন্তু সদ্বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে। তারপর গুরূপসত্তিতে অর্থাৎ কিরূপ গুরু আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া শ্রীভাগবতের এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে—

"তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন— "পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে শমো মোক্ষ স্তদুপরি বর্ত্তত ইত্যুপশমো ভক্তিযোগ স্তদাশ্রয়ং সদা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরমিত্যর্থঃ।"

অতএব সদ্বৈষ্ণবই যে দীক্ষাদানে অধিকারী এবং ইহাই যে শ্রীহরিভক্তি বিলাসের মত, তাহা টীকাকার স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন বৈষ্ণবদ্বেষী স্মার্ত্তম্মন্য ব্যক্তি "শব্দে পরে চ নিষ্ণাতং" এই বাক্যে শূদ্রাদির বেদাধিকার না থাকার কথা ভুলিয়া উক্ত বাক্যে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকেন, কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈষ্ণবীদীক্ষা লাভ করিলে শূদ্রাদিও বেদাধ্যয়নে অধিকারী হইতে পারে। স্বয়ং বেদই কি বলিয়াছেন দেখুন—

"যথেমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ।
ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়ঃ॥"

যজুর্ব্বেদঃ ২৬।২।

আবার উপনিষদেও শূদ্রের নিকট ব্রাহ্মণের ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার এবং মহাভারতে ব্যাধের নিকট ব্রাহ্মণের ধর্ম্মশিক্ষার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

তুলাধার হইতে জাবালমুনি এবং ধর্ম্মদাস ব্যাধ হইতে ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবিদ্যা সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। পরন্তু যাহাতে সম্যক্ মানব ধর্ম্ম আলোচিত হইয়াছে, সেই স্মৃতি-প্রধান মনুসংহিতা বলিয়াছেন—

"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—"শ্রদ্দধান ইতি। শ্রদ্ধাযুক্তঃ শুভাং দৃষ্টিশক্তিং গারুড়াদিবিদ্যাং অবরাচ্ছূদ্রাদপি গৃহ্ণীয়াৎ অন্ত্যশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি জাতিস্মরাদের্বিহিতযোগ-প্রকর্ষাৎ দুষ্কৃতশেষোপভোগার্থম-বাপ্তচাণ্ডালজন্মনঃ পরং ধর্ম্মং মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানমাদদীত, তথা মোক্ষমেবোপক্রম্য মোক্ষধর্ম্মে প্রাপ্য জ্ঞানং ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যাৎ শূদ্রাদপি নীচাদভীক্ষ্ণং শ্রদ্ধাতব্যমিতি।"

অর্থাৎ শ্রদ্ধাযুক্ত ব্যক্তি শুভ গারুড়াদি বিদ্যা শূদ্রাদি হইতেও গ্রহণ করিবে, এমন কি অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত আত্মজ্ঞান গ্রহণ করিবে। তবে এখন কথা এই, চণ্ডাল হইতে মোক্ষোপায় আত্মজ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তন্নিমিত্ত কহিতেছেন—সেই চণ্ডাল জাতিস্মর বিহিত যোগ-প্রকর্ষ লাভ করিয়া দুষ্কৃত-শেষ উপভোগের নিমিত্ত চণ্ডাল জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে সেই প্রকার মোক্ষ উপক্রম করিয়া মোক্ষধর্ম্মে প্রাপ্য জ্ঞানকে ব্রাহ্মণ হইতে, ক্ষত্রিয় হইতে, বৈশ্য হইতে এবং শূদ্র হইতেও নীচ হইতে সর্ব্বোতোভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

অতএব এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, শিষ্যের সংশয় নিবারণ করিবার উপযোগী যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান আছে তাদৃশ সদ্বৈষ্ণবই গুরুপদবাচ্য। টীকাকারের ইহাই অভিমত। যথা "তত্ত্বজ্ঞং অন্যথা সংশয় নিরসনাযোগ্যত্বাৎ।"

অনন্তর শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকলেরই যে দীক্ষাদানে অধিকার আছে, তাহা "ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহং।"

এবং "ক্ষত্রবিট্ শূদ্র জাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহেক্ষমঃ।" ইত্যাদি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের বচন দ্বারা সামান্য ভাবে প্রদান করিয়াছেন। এই গুরুচতুষ্টয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণই সকল বর্ণের গুরু, ইহা বর্ণী সমাজে কে অস্বীকার করিবে? অতএব বর্ণ-সমাজ স্বদেশে বিদেশে অন্বেষণ করিয়া গুরুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষিত হইবেন। এ বিধান ভাগবতধর্ম্মের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নহে বলিয়া বৈষ্ণব-স্মৃতি-নিবন্ধকার পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, যে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু, যাঁহাকে স্বদেশ বিদেশে খুঁজিয়া গুরু করিতে হইবে তিনি অবৈষ্ণব হইলে ভাগবত ধর্ম্মে তাঁহার দীক্ষাদানে অধিকার নাই। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ যদি মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব হন, তবেই তিনি ভাগবত ধর্ম্ম মতে সকল বর্ণের গুরু হইবার যোগ্য হইবেন। নতুবা ব্রাহ্মণ হইলেই ভাগবতধর্ম্মে গুরু হইতে পারেন না। বৈষ্ণব স্মৃতিকারের ইহাই অভিপ্রায়।

শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে শুদ্ধ বৈষ্ণবমত আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে কোন যুক্তিতর্ক নাই। কিন্তু ভক্তিসন্দর্ভে যুক্তিতর্কবিজ্ঞান বিচার সহ পরমার্থ ভক্তিমার্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই দুই ভক্তিগ্রন্থেই শ্রীহরিভক্তিবিলাস ধৃত "তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতের বচনটী উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু ক্রমদীপিকার বচনটী উদ্ধৃত হয় নাই। কেন হয় নাই?—তাহা বিচার করিলে দেখা যায় ঐ বচনটী সকামপর; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত প্রবুদ্ধ বাক্য সর্ব্বসম্মত এবং ভক্তিসিদ্ধান্ত অনুকূল। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে, শ্রীগুরু লক্ষণে "অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধ ইত্যাতি" ৩২ সংখ্যক শ্লোক হইতে "মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ" ইত্যাদি ৩৯ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত স্মার্ত্তমত উদ্ধৃত করিয়া ৪০ সংখ্যক শ্লোকে নিজমত স্থাপন করিয়াছেন। যথা—

"মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥ ইতি॥ ৪০॥"

টীকাকার লিখিয়াছেন—"ব্রাহ্মণোপি সৎকুল ধর্ম্মাধ্যয়নাদিনা প্রখ্যাতোঽপি

অবৈষ্ণব শ্চেত্তর্হি গুরুর্নভবতীতি সর্ব্বত্রাপবাদং লিখতি। মহাকুলেতি। কুলে মহতি জাতোঽপীতি ক্বচিৎ পাঠঃ। অতএবোক্ত পঞ্চরাত্রে। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্গুরোরিতি। ইতি শব্দ প্রয়োগোঽত্রোদাহৃতানামন্যত্র বচনানাং প্রায়ো নিজগ্রন্থ-বচনতো ব্যবচ্ছেদার্থং। এবমগ্রেঽপ্যন্যত্র যদ্যপি প্রতিপ্রকরণান্তে উদাহৃত তত্তচ্ছাস্ত্র বচনান্তে চ সর্ব্বত্রেতি শব্দো যুজ্যেত।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ সৎকুলপ্রসূত, ধর্ম্মাধ্যয়নাদিগুণযুক্ত ও প্রখ্যাত হইলেও যদি অবৈষ্ণব হন, তাহা হইলে শ্রীগুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিশেষ বিধি লিখিত হইয়াছে। অতএব নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে— "অবৈষ্ণব-উপদিষ্ট মন্ত্র-গ্রহণে নরকে পতিত হইতে হয়, সুতরাং সম্যক বিধিদ্বারা বৈষ্ণবগুরুর নিকট পুনর্ব্বার বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহন করিবে। "ইতি" শব্দ প্রয়োগ, এস্থলে উদাহৃত অন্যত্র বচন সমূহের প্রায় নিজগ্রন্থ-বচন হইতে ব্যবচ্ছেদের নিমিত্ত জানিতে হইবে। যদিও প্রতি প্রকরণান্তে উদাহৃত সেই সেই শাস্ত্রের বচনান্তে সর্ব্বত্র "ইতি" শব্দ যুক্ত আছে, তথাপি সেই সেই প্রকরণের বিচ্ছেদ, পরবাক্য ও নিজবাক্য, প্রকরণে অবিচ্ছেদ ভাবে থাকায় "ইতি" শব্দ দ্বারা নিজবাক্যের বিচ্ছেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এইরূপ পরিভাষা অন্যত্রও বুঝিতে হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ইতি" শব্দে পর-মতবচন বিচ্ছেদ করিয়া নিজমতানুকুল বচন লিখিতেছেন—

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ ৪১॥"—

অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ জীবমাত্রেই বৈষ্ণব নামে অভিহিত; তদ্ভিন্ন জীব অবৈষ্ণব পরিগণিত। শবরী প্রভৃতি স্ত্রীজাতি, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি পশুজাতি, গরুড়, সম্পাতি প্রভৃতি পক্ষীজাতিকেও শাস্ত্রে বৈষ্ণব বলায় এস্থলে নরশব্দে জীবমাত্রকেই বুঝাইতেছে। অতএব উক্ত ৪০ সংখ্যক শ্লোকে

'ইতি' শব্দে স্মার্ত্তমতের বিচ্ছেদ করিয়া স্বমতে অর্থাৎ বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে বৈষ্ণব নরমাত্রেই মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরু, ইহাই এই গুরূপসত্তি প্রকরণের উপসংহার। শ্রীভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে উপশমাশ্রয় শাস্ত্রানুভবী কৃষ্ণানুভবী বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দীক্ষাগুরু বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কই, তাহাতে বর্ণাশ্রমের বিচার উল্লিখিত হয় নাই তো? আরও শ্রীভক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু-প্রকরণে—শ্রবণগুরু, ভজনশিক্ষা গুরু, অন্তর্য্যামীগুরু ও মন্ত্রগুরু এই চতুর্দ্ধা গুরু বিচারে মন্ত্রগুরু নির্দ্দেশ করিতেছেন—

"শ্রীমন্ত্রগুরুস্ত্বেক এবেত্যাহ।—" লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ। মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥" টীকা—"অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। আগমো মন্ত্রবিধিশাস্ত্রম্। অস্যৈকত্ব মেকবচনেন বোধ্যতে। বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতং। গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ। ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদৌ তত্ত্যাগ নিষেধাৎ। তদপরিতোষেণৈবান্যো গুরুঃ ক্রিয়তে। ততোহনেক গুরু করণে পূর্ব্বত্যাগ এব সিদ্ধঃ। এতচ্চাপবাদ বচন দ্বারাপি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিতম্। অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণেত্যাদি।"

অর্থাৎ শ্রীমন্ত্রদাতা গুরু এক। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে—"শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে দীক্ষামন্ত্র গ্রহণরূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক মন্ত্রবিধিশাস্ত্র দৃষ্ট করিয়া নিজাভীষ্ট শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করতঃ মহাপুরুষ শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করিবে। এস্থলে আচার্য্য শব্দে এক বচনের বিভক্তি প্রয়োগ থাকায় দীক্ষা গুরুর একত্ব বোধিত হইয়াছে। যাহারা কলুষিত জ্ঞানের দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গুরু ত্যাগ করে, তাহাদের গুরুত্যাগের পূর্ব্বেই শ্রীহরি তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি বচনে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু অনেক গুরু-করণে, পূর্ব্ব গুরুত্যাগও শাস্ত্রসিদ্ধ হইতেছে। এবিষয়ে বিশেষ বিধি বচনদ্বারা শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বোধিত হইয়াছে। যথা, অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরু করিবে।

অতএব ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীগুরু-প্রকরণে বর্ণাশ্রম ও জাত্যাদির কোন বিশেষ

উল্লিখিত হয় নাই তো ? কেবল অবৈষ্ণব গুরু ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবগুরুর নিকট বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করিবে, এই কথাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীহরিভক্তিবিলাসের নিজবাক্যে কেবল বৈষ্ণব নরমাত্র উল্লেখ থাকায় এবং শ্রীহরিভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ও ভক্তিসন্দর্ভে দীক্ষাগুরু-প্রকরণে "ব্রাহ্মণ" শব্দ উল্লেখ না থাকায় বর্ণাশ্রম-নির্ব্বিশেষে বৈষ্ণব গুরুই সর্ব্বাথা গ্রাহ্য। "পূর্ব্বাপরয়োর্মধ্যে পরবিধি বলবান্"-এই ন্যায়ানুসারে প্রকরণের উপসংহারে যে বিধি নির্দ্দেশিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধি অপেক্ষা বলবান্।

শাস্ত্র আরও কি বলিতেছেন তাহাও শুনুন। শ্রীভগবান বলিতেছেন—

"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্।"

অর্থাৎ আমার বাৎসল্যাদি মাহাত্ম্য যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন এবং আমাতেই যাঁহার চিত্ত অর্পিত হইয়াছে এবং যিনি শান্ত এমত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে। "মদাত্মকম্" পদের বিগ্রহ বাক্য এইরূপ—"ময়ি আত্মা চিত্তং যস্য তং বহুব্রীহৌ কঃ।" সুতরাং ধনে জনে পুত্রে কলত্রে বিষয়ে বাণিজ্যে মামলা মোকদ্দমায় হিংসা—দ্বেষে যাঁহাদের চিত্ত সর্ব্বদা অর্পিত, তাঁহারা বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তানই হউন বা প্রভুবরের সন্তানই হউন কখনই তাঁহারা সদ্‌গুরু হইতে পারেন না, ইহাই শ্রীভাগবত শাস্ত্রের অভিপ্রায়। ইহাই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর ব্যবস্থা।

অতএব যাঁহারা শাস্ত্রের নাম করিয়া শাস্ত্রবিহিত সদ্‌গুরু-গ্রহণ-বিধানের দোহাই দিয়া অপরের শিষ্যহরণে নানাপ্রকার কৌশল-জাল বিস্তার করেন, শাস্ত্রোক্ত গুরুলক্ষণের ও শিষ্যলক্ষণের প্রতি তাঁহাদের একবার দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। গুরু মিলিলেও শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত শিষ্য পাওয়া যাইবে কোথায় ? তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত শিষ্য না পাইলে যাহাকে-তাহাকে মন্ত্র দিতে গেলেই সে গুরুগিরি ব্যবসা নামান্তর হইয়া পড়ে না কি ? আবার শাস্ত্রে আদর্শ লক্ষণ প্রকটিত করা হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ আদর্শ জগতে অতি দুর্ল্লভ। সুতরাং যাঁহারা সদ্‌গুরু গ্রহণ বিধানের দোহাই দিয়া শিষ্যকে গুরুত্যাগের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাঁহারা যেন সর্ব্বাগ্রে কয়েকটী

শাস্ত্রবিহিত সদ্‌গুরুর আদর্শ আবিষ্কার করিয়া জনসমাজে গুরুত্যাগ বিপ্লবরূপ মহাবিপ্লবের অধিনায়ক হন। ইহাই আমাদের বিনীত নিবেদন।

সে যাহা হউক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসকার শ্রীগোপাল মন্ত্র সম্বন্ধে যে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উল্লেখযোগ্য। যথা—

" শ্রীমদ্‌গোপালদেবস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদর্শিনঃ।
তাদৃক্ শক্তিষু মন্ত্রেষু নহি কিঞ্চিদ্বিচার্য্যতে ॥ ১০০ ॥"

টীকা—অস্য এবমুক্তস্য সিদ্ধাদি শোধনস্য ব্যর্থত্বে হেতুং লিখতি শ্রীমদিতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমাধুর্য্য-প্রদর্শক শ্রীমদন গোপালদেবের নাম, মন্ত্র, বিগ্রহ অভেদ, শ্রীবিগ্রহে যেরূপ শক্তি শ্রীনামমন্ত্রেও সেইরূপ শক্তি। অতএব এই সকল মন্ত্র সম্বন্ধে গুরু-শিষ্যাদি বিচার, মাস বার তিথি নক্ষত্র শুদ্ধি, স্বকুল অকুল রাশিচক্র উদ্ধার অকডম চক্র কূর্ম্মচক্র হোম পুরশ্চরণাদি কোন বিচারই করিবে না।

এই জন্যই শাস্ত্রে স্পষ্ট ঘোষিত হইয়াছে—

" বিপ্রক্ষত্রিয়বৈশ্যাশ্চ গুরবঃ শূদ্রজন্মনাম্।
শূদ্রাশ্চ গুরব স্তেষাং ত্রয়ানাং ভগবৎপরাঃ ॥" পদ্মপুরাণ।

অর্থাৎ শূদ্র, শূদ্রের গুরু তো হইবেনই, পরন্তু তিনি যদি বৈষ্ণব হন্, তবে তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই গুরু হইবেন। আরও লিখিত হইয়াছে—

" ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্র তন্ত্রমন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাৎ স্বপচো বৈষ্ণবো গুরুঃ ॥"

পুনশ্চ—

" সহস্রশাখাধ্যায়ী চ সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
কুলে মহতি জাতোঽপি ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥"

অর্থাৎ সহস্র শাখাধ্যায়ী সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং ব্রাহ্মণাদি মহৎ কুলে জন্ম-গ্রহণ করিয়াও তিনি অবৈষ্ণব হইলে গুরুযোগ্য হইবেন না।

এমন কি যাঁহার গুরুতে ও বিষ্ণুতে পরাভক্তি দৃষ্ট হয়, তাঁহার গুরুযোগ্য লক্ষণ না থাকিলেও তিনি গুরুপদ-বাচ্য। যথা, দেবীপুরাণে—

"সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরা ভক্তি র্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ॥
স এব সদ্গুরুজ্ঞেয়ঃ সত্যং তব্বদামি তে॥"

পুনশ্চ আদি পুরাণে—

"বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মঃ বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যঃ বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥"

লঘু নারদ-পঞ্চরাত্রে—

"গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্গৃহীত্বা চ হরিভক্তি র্ন বিদ্যতে॥"

পুনশ্চ—

"জন্তূনাং মানবাঃ শ্রেষ্ঠা মানবানাং দ্বিজা স্তথা।
দ্বিজানাঞ্চ যতী শ্রেষ্ঠঃ যতিনাং বৈষ্ণবো গুরুঃ॥
অগ্নিগুর্রুর্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
সর্ব্বেষাং বৈষ্ণবোগুরু রগ্নিসূর্য্যাদিবৌকসাম্॥"

শাস্ত্রে এইরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। যদি কেহ বলেন—এই সকল গুরু দীক্ষা-বিষয়ক নহে—শিক্ষা-বিষয়ক? তদুত্তর এই যে—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণে কোথাও যখন দীক্ষা বা শিক্ষা গুরুভেদ উল্লেখ নাই; তখন কেবল শিক্ষা-গুরু বুঝিতে হইবে এমন কি কথা আছে? নিরপেক্ষ শাস্ত্র-বিচার ও যুক্তিতে উহা দীক্ষা ও শিক্ষা উভয় গুরুপরই বুঝিতে হইবে এবং ঐ সকল "বৈষ্ণব" শব্দে যে কেবল ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে, আর ব্রাহ্মণেতর কুলোৎপন্ন বৈষ্ণব বুঝাইবে না, ইহাই বা কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবত্ব লাভেই যে ব্রাহ্মণত্বলাভও সিদ্ধ হইয়া থাকে তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত

হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব মাত্রেই গুরু-লক্ষণযুক্ত হইলে দীক্ষাদানে সমর্থ ও অধিকারী হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

শূদ্রাচার ও বৈষ্ণবাচার এক—নহে—শূদ্রাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈষ্ণবাচার গ্রহণ করিলে তাহাতে আর শূদ্রত্ব থাকে না।

শূদ্র ভগবদ্ভক্ত হইলে আর তাঁহাকে শূদ্র বলা যায় না. ভাগবতোত্তম বলিতে হইবে। যথা—

"ন শূদ্রাঃ ভগবদ্ভক্তা স্তেঽপি ভাগবতোত্তমাঃ।"

সুতরাং এই বৈষ্ণব অর্থাৎ প্রায়-ব্রাহ্মণ দীক্ষা দানে অধিকারী অবশ্যই হইবেন, ইহাই শাস্ত্রযুক্তি এবং ইহাই সদাচার।

আবার "যন্নামধেয় শ্রবণানুকীর্ত্তনাদিত্যাদি" শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে শৌক্র, সাবিত্র্য জন্মের অপেক্ষা দেখাইয়াছেন, তাহা বৈদিক যাগ বিষয়ে বুঝিতে হইবে। কারণ, বৈদিক যাগযজ্ঞে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু বিষ্ণু মন্ত্রে আচণ্ডাল সকলের অধিকার। যথা—

"লোকাশ্চাণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ।" তথা ক্রম-দীপিকায়াং—

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু,
নারীষু নানাহ্বয়জন্মভেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্রণেয়ং॥

সকল বর্ণ, সকল আশ্রম, নারীজাতি, এবং যে সকল ব্যক্তির নাম ও জন্ম নক্ষত্রের আদ্য বর্ণের সহিত মন্ত্রের আদ্য অক্ষরের মিল নাই, তাহাদের সম্বন্ধেও এই গোপালমন্ত্র আশু ফলদাতা।

অতএব শ্রীবিষ্ণু কি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র-দীক্ষায় শৌক্র সাবিত্র্য জন্মের বিধি অপেক্ষা করে না। যিনি গুরুযোগ্য সদ্বৈষ্ণব তিনি বৈষ্ণবী দীক্ষাদানে অধিকারী হইবেন। তাহাতে, তিনি ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব হন উত্তম, না হয়, ব্রাহ্মণেতর গুরুতে সে গুণ দৃষ্ট হইলে অবশ্যই গুরু হইবেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে যে,—

" কিবা ন্যাসী কিবা বিপ্র শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥"

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, সকলেরই গুরুত্বে অধিকার আছে। সে স্থলে তিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হইলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ গুরু হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যিনি প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনি তো পরমসিদ্ধার্থ মহাপুরুষ। আবার উক্ত পয়ার যে কেবল শিক্ষাগুরু বিষয়ে উদ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা নহে। দীক্ষাগুরুর শিক্ষা দানে অধিকার থাকা প্রযুক্ত (দীক্ষা শিক্ষাগুরু শ্চৈব চৈকাত্মা চৈকদেহিনঃ) উহা দীক্ষা শিক্ষা উভয় গুরু বিষয়ই বুঝিতে হইবে।

এ বিষয় আমরা বেশী কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখ-পত্র প্রসিদ্ধ "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ও আনন্দ বাজার পত্রিকার" ভূতপূর্ব্ব স্বনামধন্য সুযোগ্য সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, তাঁহার "শ্রীরায় রামানন্দ" নামক গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীমুখোক্ত উল্লিখিত বাক্যের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।—শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীল রামরায়কে বলিতেছেন—

" আমি সন্ন্যাসী সর্ব্ব বর্ণের গুরু ; তাই বলিয়া তুমি আমাকে শিক্ষা দিবে না, আর আমি তোমার কৃপাশিক্ষায় বঞ্চিত হইব, ইহা হইতে পারে না, ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, অথবা শূদ্র হউন, যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু। সুতরাং সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি আমায় বঞ্চনা করিও না।"

মহাপ্রভু এস্থলে অনেক প্রকার শিক্ষা প্রদান করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্যই বহু অর্থ পূর্ণ। আমাদের বোধ হয়, তিনি এস্থলে এই কথায় অনেক তত্ত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন :—

১। সন্ন্যাসীরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, কিন্তু মায়াবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান হইতে যে

ভগবদ্ভক্তি উচ্চতর, তিনি বিনীতভাবে সেই কথা বলিয়া দিলেন।

২। "গুরু কে?" এ প্রশ্নেরও এস্থলে মীমাংসা করিতে হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হউন, সন্ন্যাসী হউন, আর শূদ্রই হউন যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই গুরু।

৩। কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞত্ব যে কত উচ্চাধিকার, ইহাতে তাহাও অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রভু লোকাপেক্ষা ত্যাগ করেন নাই। তথাপি শূদ্র যদি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা হয়েন, তাঁহাকেও গুরু বলিয়া গ্রহণ করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন। শূদ্র শিক্ষাগুরু হইতে পারেন, কিন্তু দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না, এই কথা বলিয়া বর্ণাশ্রম-প্রাধান্য পরিকীর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। কেন না প্রভু কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শূদ্রের কথাই বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তাঁহার জন্মনিবন্ধন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম খণ্ডিত হইয়া যায়। মহাসাগরে মিশিয়া গেলে নদীর যেমন নামরূপ থাকে না। কৃষ্ণপ্রেমসাগরে প্রবেশ করিলে মহৎ ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র বর্ণ বিচার মাত্রও থাকিতে পারে না। নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে স্ত্রীপুরুষ, মহৎ-ক্ষুদ্র, ব্রাহ্মণশূদ্র প্রভৃতি অনন্ত ভেদবুদ্ধি একবারেই নিরস্ত হইয়া যায়। মহাপ্রভু এস্থলে ব্রাহ্মণ বা শূদ্রের নিকট মন্ত্র লইতে বলেন নাই, কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তাকেই (বৈষ্ণবকেই) গুরু বলিয়া স্বীকার করিতে বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য, তাদৃশ নিরুপাধি প্রেম-সাগরে যদি কেহ মজ্জিত হইয়া থাকেন, নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেমে ডুবিয়া যদি কেহ সাংসারিক সর্ব্বোপাধি বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন তবে, তাদৃশ তথাগতকে উপাধিযুক্ত করিয়া অভিহিত করাও অপরাধজনক। এখানে প্রভু কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞাতরই উৎকর্ষ কীর্ত্তন করিয়া মায়াবাদময় সন্ন্যাস-ধর্ম্মের খর্ব্বতা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীচরিতামৃতে অপর স্থলেও লিখিত আছে—

> "মায়াবাদীর সন্ন্যাসীদের করিতে গর্ব্বনাশ।
> নীচ শূদ্র দ্বারায় কৈল ধর্ম্মের প্রকাশ॥"

আবার শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা সদাচার অধিক প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। সদাচার কাহাকে বলে?

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

ক্ষীণদোষ ব্যক্তিগণই সাধু। সৎশব্দ সাধুবাচক। সেই সাধুগণের আচরণ সদাচার নামে অভিহিত। অতএব চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সময় হইতে শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল শ্যামানন্দ, শ্রীল রামচন্দ্র, শ্রীল রসিকানন্দ প্রভৃতি মহাভাগবতগণ—যাঁহাদিগকে ভক্তগণ আবেশাবতাররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর।
চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশাবতার॥" প্রেমবিলাস।

তাঁহারা যে আচার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, চারি শত বৎসর ব্যাপিয়া যে আচার অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণেতর বৈষ্ণব গুরুর প্রাধান্য অব্যাহতরূপে সকল সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা কি সদাচার নহে? একমাত্র বৈষ্ণব ব্রাহ্মণই যদি সকল বর্ণের গুরু হইবেন, এরূপ সঙ্কীর্ণ ব্যবস্থা বৈষ্ণবস্মৃতির মত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কদাচ বৈষ্ণব স্মৃতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতেন না। যদি বলেন, "তাঁহারা মুক্ত—সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা প্রমাদ বশতঃ কোন অবৈধাচরণ করিলেও পাপভাগী হন না।" সিদ্ধপুরুষের প্রমাদ কদাচিৎ একবার হইতে পারে, কিন্তু পুনঃপুন হইতে পারে না তো? হইলেই পাপভাগী হইতে হইবে। কিন্তু শ্রীল নরোত্তম, শ্রীল রামচন্দ্র কি শ্রীল শ্যামানন্দ-রসিকানন্দাদি স্ববর্ণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠবর্ণ বহুব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, রসিক মঙ্গলাদি প্রামাণিক বৈষ্ণব ইতিহাসগ্রন্থে তাঁহাদের বহুতর ব্রাহ্মণ শিষ্য গ্রহণের কথাও বর্ণিত আছে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, তাঁহাদের আচরণ যদি একান্ত অবৈধই হইত, তবে শত শত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের শিষ্যানুগত্য স্বীকার করিতেন কেন? তাঁহারা সকলেই কি মূর্খ ছিলেন? অতএব গুরুযোগ্য সদ্বৈষ্ণবমাত্রেই যে সকল বর্ণের গুরু হইতে পারেন, ইহাই যে ভাগবত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এবং ইহাই যে সদাচার,

তাহাতে সন্দেহ নাই। এজন্য ঐ সকল সিদ্ধ গুরুবংশ ব্যতীত অপর যাঁহারা গুরু-যোগ্য সদ্বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশাবলীও ঐরূপ গুরুরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। সিদ্ধ বংশোৎপন্ন বলিয়া অর্থাৎ সিদ্ধ ঋষির শোণিত-সম্পর্ক আছে বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বংশধরগণ তাদৃশ গুণসম্পন্ন না হইলেও যেমন মাননীয় ও পূজ্য, সেইরূপ সিদ্ধ বৈষ্ণব-গুরুর বংশধরগণও সিদ্ধ বৈষ্ণবের শোণিতসম্পর্ক হেতু অবশ্যই মাননীয় ও পূজ্য হইবেন, ইহাই নিরপেক্ষ বিচার ও যুক্তি। তাহা হইলে তাঁহাদের পরবর্ত্তী যে দুইজন বিশ্ব-বিখ্যাত বৈষ্ণবাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণকে কটাক্ষ করিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। তাহা না করিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, শ্রীল নরোত্তমের মন্ত্র-শিষ্য শ্রীগঙ্গা নারায়ণের পালিত পুত্র শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তীর মন্ত্র-শিষ্য হইলেন, আবার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্যামানন্দী বৈষ্ণব পরিবার ভুক্ত হইলেন। তাঁহারা শূদ্রাদি দোষযুক্ত গুরু বলিয়া দীক্ষাপেক্ষা করেন নাই।

তবে এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, যাঁহারা শুদ্ধ বৈষ্ণব, তাঁহাদের জন্যই উল্লিখিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বীয় বর্ণবিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা মানিয়া চলেন অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী তাঁহাদিগকেই প্রায়শঃ শ্রীরঘু-নন্দনাদির কর্ম্মস্মৃতি ও বৈষ্ণবস্মৃতি এই উভয়স্মৃতির বিধান মানিয়া চলিতে দেখা যায়। অবশ্য তাহা দীক্ষাদি পারমার্থিক বিষয়ে নহে। কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা বিশুদ্ধাচারী তাঁহাদিগকে কেবল বৈষ্ণবস্মৃতির বিধানই মানিয়া চলিতে দেখা যায়। আর যাঁহারা বৈষ্ণবতা রক্ষার প্রতিকূল ভাবিয়া স্বীয় বর্ণ-বিহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারের অপেক্ষা না করিয়া বিশুদ্ধভাবে বৈষ্ণব-সদাচারী, তাঁহারা কেবল বৈষ্ণবস্মৃতিই মানিয়া চলেন। তাঁহারা অন্য স্মৃতির অনুসরণ করেন না। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই এক্ষণে স্বর্ণ সমাজ হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়া গৌড়াদ্যবৈদিক বৈষ্ণব জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইহাঁদের আচার-ব্যবহার সাধারণ বর্ণ সমাজ হইতে বিশুদ্ধ ও ভগবদ্ধর্ম্মানুমোদিত বলিয়া সাধারণ বর্ণ-সমাজে ইহাঁরা

ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত ও পূজিত। প্রধানতঃ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণই অর্থাৎ এই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগৃহিগণই সমাজে গুরুরূপে সম্মান লাভ করিয়া আসিতেছেন, আর যাঁহাদের বংশে কোন ব্যক্তি গুরুযোগ্য হইয়াছিলেন এবং শত শত ব্যক্তি তাঁহার সেই বৈষ্ণবত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্বংশীয়গণই বৈষ্ণব সমাজে দীক্ষা দান করিয়া আসিতেছেন এবং বর্ত্তমান কালেও যাঁহারা সদাচারী বৈষ্ণব, দীক্ষাদানের উপযুক্ত, তাঁহারাও সংসার-তরণেচ্ছু ব্যক্তিগণকে দীক্ষা দানে তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধন করিতেছেন, এবং ভবিষ্যতেও এইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি করিবেন। কিন্তু যে সকল বৈষ্ণবনামধারী ভণ্ড-ব্যভিচারী বা ধর্ম্মধ্বজী আপনা-দিগকে বৈষ্ণবোত্তম পরিচয় দিয়া গুরুগিরি করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়ায় এবং সরল-প্রকৃতি কোমলশ্রদ্ধ লোকদিগকে ভুলায়; অবশ্য তাহাদের সে আচরণের দমন হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া, যাঁহারা সিদ্ধ গুরুবংশ্য বা গুরুযোগ্য বৈষ্ণব তাঁহাদের অধিকার লোপ করিয়া স্বার্থ-সাধনের প্রয়াস, নরক-নিদান বোধে অবশ্য পরিত্যাজ্য।

—:(•):—

পঞ্চদশ উল্লাস।

—:o:—

গোত্র ও উপাধি-প্রসঙ্গ।

গোত্র শব্দের পারিভাষিক অর্থ—বংশ-পরম্পরা প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জাতীয় আদি পুরুষ। সুতরাং ব্রাহ্মণ ভিন্ন ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের গোত্র—ব্রাহ্মণ-পুরোহিত বা গুরু হইতে প্রাপ্ত। "পুরোহিত প্রবরো রাজ্ঞাং।" (আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র) আবার অন্য-বর্ণোপেত ব্রাহ্মণও গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষি হইয়াছিলেন। গোত্র প্রচলনের উদ্দেশ্য এই যে, যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশে বিবাহ করা চলিবে না, ইহাই গোত্র-প্রচলনের উদ্দেশ্য। প্রবর শব্দের অর্থ প্রবর্ত্তক। মাধবাচার্য্য বলেন—যে সকল মুনি গোত্র প্রবর্ত্তক মুনিগণের ভেদ-উৎপাদন করেন—তাঁহারাই "প্রবর" নামে অভিহিত। কাহাদিগকে লইয়া প্রথমতঃ গোত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল—অথবা কাহারা গোত্রভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার এইরূপ আভাস পাওয়া যায়।

গোত্র আর কিছুই নয়—পুরাকালে যে যে ঋষির গোপালনার্থ যতগুলি লোক নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা সেই সেই ঋষির নামানুসারে গোত্র ভুক্ত হইয়াছিলেন। আর্য্য-সমাজে বিবাহের তেমন বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল না। এক গোত্র বা পরিবারের মধ্যেই বিবাহ নির্ব্বাহ হইত। ভাবী অনিষ্টপাতের আশঙ্কায় সমাজ রক্ষকগণ গোত্র-নিয়ম প্রচলন করেন। স্ববংশে বা স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ হইল। বৈষ্ণবের এক ধর্ম্মগোত্র "অচ্যুত গোত্র" দেখিয়া অনেক স্মার্ত্তম্মন্য পণ্ডিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—বৈষ্ণব একগোত্রী—উহাদের স্বগোত্রে বিবাহ হয়। সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বেদ-সিদ্ধ নয়।

আমরা বলি, স্মার্ত্তপণ্ডিতগণ যে দশনামী শাঙ্কর মায়াবাদ-সম্প্রদায়কে অবলম্বন করিয়া নিজেদের গৌরব কীর্ত্তন করেন, সেই মায়াবাদিদিগের বর্ণ, জাতি ও

গোত্রাদি বৈদিক গ্রন্থে কি কোন শাস্ত্র গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় কি? কিন্তু বৈষ্ণবের "অচ্যুত গোত্র" শাস্ত্র-সিদ্ধ। শ্রীভাগবতে পৃথুরাজার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈক দণ্ডধৃক্‌।
অন্যথা ব্রাহ্মণ কুলাদন্যথাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে পৃথুরাজার সময়ে, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—বিশেষতঃ অচ্যুত গোত্র বৈষ্ণব, সমান ভাবে পূজিত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব-দিগকে দণ্ডদান করেন নাই। অতএব এই অচ্যুত-গোত্র, বৈষ্ণব-সাধারণ গোত্র—ধর্ম্মগোত্র। কিন্তু স্মার্ত্ত মায়াবাদ সম্প্রদায়ে দশনামী সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে সমস্ত জাতিবর্ণ ও গোত্রাদি ব্যবহার হয়, তাহা একবারেই অবৈদিক—মনঃ কল্পিত। স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"ইহাদের (দণ্ডী সন্ন্যাসীদের) সকলেরই একজাতি এক পরিবার। জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অনন্ত।" ইহা ত কোন শাস্ত্র গ্রন্থে নাই। কিন্তু বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়, পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"শ্রীব্রহ্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপবনাঃ।"

সুতরাং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব-জাতি অনাদি ও নিত্যসিদ্ধ। ইহা আধুনিক বা মনঃ কল্পিত নয়। শ্রীভগবানেরই অঙ্গীভূত। কিন্তু মায়াবাদীদের যে চারিটী সম্প্রদায় আছে, তাহার সহিত শাস্ত্রের কোন সম্বন্ধ নাই। যথা—

শৃঙ্গেরী মঠ ... ... ভূর্বার সম্প্রদায়।
জ্যোষী মঠ ... ... আনন্দবার সম্প্রদায়।
সারদা মঠ ... ... কীটবার সম্প্রদায়।
গোবর্দ্ধন মঠ ... ... ভোগবার সম্প্রদায়।

সন্ন্যাসী মাত্রেই এই চারি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই চারি সম্প্রদায়ের গোত্রও অদ্ভুত—অবৈদিক। যেমন ভূর্বার সম্প্রদায়ের গোত্র "ভবেশ্বর"।

আনন্দবার সম্প্রদায়ের গোত্র " লাতেশ্বর।" যে সম্প্রদায়ের নাম শ্রুতিস্মৃতিতে নাই, গোত্রের নাম কোন বৈদিক গ্রন্থে নাই, তাঁহারা এবং তাঁহাদের আশ্রিত স্মার্ত্তবাদি-গণ যদি হিন্দু সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেন,—এবং নিজেদিকে বৈদিক বলিয়া গৌরব-প্রকাশ করেন, তবে, সম্পূর্ণ বেদ-প্রণিহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এবং বৈষ্ণব জাতির প্রতি অবৈদিক বলিয়া কোন্ সাহসে কটাক্ষপাত করেন? জানিনা।

বৈষ্ণব-সাধারণ সম্প্রদায়ে এক ধর্ম্মগোত্র অচ্যুতগোত্র প্রচলিত থাকিলেও আমাদের আলোচ্য গৌড়াস্থ বৈদিক বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে আভিজাত্যের পরিচয়ে ঋষিগোত্রের উল্লেখ প্রচলন আছে। বিবাহাদি প্রত্যেক শুভ কর্ম্মে শাস্ত্রোক্ত বৈদিক গোত্র সকল উল্লিখিত হইয়া থাকে। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বৈষ্ণব সমাজে ভার্গব, গৌতম, ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বিষ্ণু, বার্হস্পত্য, শৌনক, কৈশিক, শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, কাণ্ব, হারীত, অনুপ, গার্গ প্রভৃতি বৈদিক গোত্র সমূহ প্রচলিত আছে। এই সকল গোত্রীয় বৈষ্ণববংশ যে সকলেই ব্রাহ্মণের নিকট ' ধারকরা ' গোত্রে গোত্রিত,—পুরোহিতের গোত্র অনুসারে তাঁহাদের এই গোত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহা নহে। এরূপ কল্পনা করাও ভুল। কারণ, বিশেষ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে অধিকাংশই উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আদি পুরুষ হইতে অধস্তন বৈষ্ণববংশের বিস্তার হইয়াছে। আবার এরূপ অনেক বৈষ্ণববংশও শ্রোত্রীয় ও কুলীন ব্রাহ্মণবংশে উন্নীত হইয়াছেন,—অন্বেষণ করিলে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল হইবে না।

সহৃদয় পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্র অনুসারে নিম্নে গোত্র প্রবরের তালিকা প্রদত্ত হইল।—

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
১। ভৃগু।	১ জমদগ্নি ...	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, জামদগ্ন্য।
	২ বৎস ...	

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
১। ভৃগু।	৩ জামদগ্ন্য ...	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, আষ্টিসেন, অনুপ।
	৪ বিদ ...	ভার্গব, চ্যবন, আপ্নবান, ঔর্ব্ব, বৈদ।
	৫ যস্ক ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	৬ বধৌল ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	৭ মৌন ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	৮ মৌক ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	৯ সার্করাক্ষি ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	১০ সার্ষ্টি ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	১১ সালঙ্কায়ন ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	১২ জৈমিনি ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	১৩ দেবন্ত্যায়ন ...	ভার্গব, বৈতহব্য, সাবৎস।
	১৪ সৈত্য ...	ভার্গব, বৈণ্য, পার্থ।
	১৫ মিত্রযুব ...	বাধ্র্যশ্ব বা ভার্গব, দৈবদাস, বাধ্র্যশ্ব।
	১৬ শুনক ...	গাৎর্সমদ, অথবা ভার্গব, শৌনহোত্র, গাৎর্সমদ।
২। গোতম	১ গোতম ...	আঙ্গিরস, আয়াস্য, গৌতম।
	২ উচথ্য ...	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, ঐ
	৩ রহুগণ ...	ঐ রহুগণ, ঐ
	৪ সোমরাজ ...	ঐ সোমরাজ্য ঐ
	৫ বামদেব ...	ঐ বামদেব্য ঐ
	৬ বৃহদুক্থ ...	ঐ বার্হদুক্থ ঐ
	৭ পৃষদশ্ব ...	ঐ পার্ষদশ্ব, বৈরূপ অথবা অষ্টাদংষ্ট্রা, পার্ষদশ্ব বৈরূপ।

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
২। গোতম।	৮ ঋক্ষ ...	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভারদ্বাজ, বান্দন, মাতবাচস।
	৯ কাক্ষিবৎ ...	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, গোতম, ঔশিজ, কাক্ষিবত।
	১০ দীর্ঘতমস	আঙ্গিরস, ঔচথ্য, দৈর্ঘ্যতমস।
৩। ভরদ্বাজ।	১ ভরদ্বাজ ...	আঙ্গিরস, বার্হ্যস্পত্য, ভারদ্বাজ।
	২ অগ্নিবৈশ্য ...	আঙ্গিরস, বার্হ্যস্পত্য, ভারদ্বাজ।
	৩ মুদ্গল ...	ঐ ভার্ম্যশ্ব, মৌদ্গল্য কিম্বা তার্ক্ষ্য, ভার্ম্যশ্ব, ঐ
	৪ বিষ্ণুবৃদ্ধ ...	ঐ পোরুকুৎশ্য, ত্রাসদশ্ব।
	৫ গর্গ ...	ঐ বার্হ্যস্পত্য, ভারদ্বাজ, গার্গ সৈন্য অথবা আঙ্গিরস, সৈন্য, গার্গ।
	৬ হারীত ...	আঙ্গিরস, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব, অথবা মান্ধাতা, আম্বরীষ, যৌবনাশ্ব।
	৭ কুৎস ...	
	৮ পিঙ্গ ...	
	৯ শঙ্খ ...	
	১০ দর্ভ্য ...	
	১১ ভৈমগব ...	
	১২ সঙ্কৃতি ...	আঙ্গিরস, গৌরবীত, সাঙ্কৃত্য অথবা শাক্ত্য, গৌরবীত, সাঙ্কৃত্য।
	১৩ পূতিমাস ...	
	১৪ তাণ্ডি ...	
	১৫ শম্ভু ...	
	১৬ শৈবগব ...	

(অগ্নিবৈশ্য, হারীত–ভৈমগব এবং সঙ্কৃতি–শৈবগব গোত্রগুলি বন্ধনী দ্বারা একই প্রবরে যুক্ত।)

মূল ঋষি।	গোত্র।	প্রবর।
৩। ভরদ্বাজ।	১৭ কণ্ব ...	আঙ্গিরস, আজমীঢ়, কাণ্ব, অথবা আঙ্গিরস, ঘোর, কাণ্ব।
	১৮ কপি ...	আঙ্গিরস, মহীযব, উরুক্ষয়।
	১৯ শৌঢ় ...	আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, কাত্য, উৎকীল।
	২০ শৈশির ...	
৪। অত্রি।	১ অত্রি ...	আত্রেয়, আর্চনানা, শ্যাবাশ্ব।
	২ গবিষ্ঠির ...	ঐ গবিষ্ঠির, গৌরবাতিথ।
৫। বিশ্বামিত্র।	১ চিকিত ...	বৈশ্বামিত্র, দেবরাট্, ঔদল।
	২ গালব ...	
	৩ কালযব ...	
	৪ অমুতন্তু ...	
	৫ কুশিক ...	
	৬ শ্রৌতকামকায়ন	ঐ দেবশ্রাবস, দৈবতারস।
	৭ ধনঞ্জয় ...	ঐ মাধুছান্দস, ধনঞ্জয়।
	৮ অজ ...	ঐ বৈশ্বামিত্র, মাধুছন্দস, আজ্য।
	৯ রৌহিণ ...	ঐ মাধুছান্দস, রৌহিণ।
	১০ অষ্টক ...	ঐ ঐ আষ্টক।
	১১ পূরণ ...	ঐ দেবরাট্ পৌরাণ।
	১২ বারিধাপয়ন্ত্য	
	১৩ কত ...	ঐ কাত্য, আৎকীল।

মূল ঋষি।	গোত্র।		প্রবর।
৫। বিশ্বামিত্র।	১৪ অঘমর্ষণ	...	বৈশ্বামিত্র আঘমর্ষণ, কৌশিক।
	১৫ রেণু	...	ঐ গাথিন, রৈণব।
	১৬ বেণু	...	ঐ ঐ বৈণব।
	১৭ সালঙ্কায়ন ১৮ শালাক্ষ, ১৯ লোহিতাক্ষ ২০ লোহিতজহ্নু,		ঐ সালঙ্কায়ণ, কৌশিক।
৬। কশ্যপ।	১ কশ্যপ	...	কাশ্যপ, আবৎসার, আসিত।
	২ নিধ্রুব	...	ঐ ঐ নৈধ্রুব।
	৩ রেভ	...	ঐ ঐ রৈভ্য।
	৪ শাণ্ডিল্য	...	ঐ আসিত, দৈবল অথবা শাণ্ডিল্য, আসিত, দৈবল।
৭। বসিষ্ঠ।	১ বসিষ্ঠ	...	বাসিষ্ঠ।
	২ উপমন্যু	...	ঐ ভারদ্বাজ, ইন্দ্রপ্রমতি।
	৩ পরাশর	...	ঐ শাক্ত্য, পারশর্য্য।
	৪ কুণ্ডিন	...	ঐ মৈত্রাবরুণ, কৌণ্ডিন্য।
৮। অগস্ত।	১ অগস্তি	...	আগস্ত্য, দার্ঢ্যচ্যুত, ইন্মবাহ অথবা আগস্ত্য, দার্ঢ্যচ্যুত, সোমবাহ।

কিন্তু বর্ত্তমানে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজেও সর্ব্বত্র উল্লিখিত গোত্র-প্রবরের ব্যবস্থা রক্ষিত হয় না। বেদের শাখান্তর আশ্রয়ই তাহার অন্যতম কারণ।

সে যাহা হউক পূর্ব্বোক্ত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অনেকগুলি উপাধিও নিতান্ত গ্রাম্য ও জঘন্য। যথা, "উক্ত ভারতবর্ষীয় উপাসক" নামক পুস্তকে—

"গিরি সন্ন্যাসীদের চুলা, চক্কী, নামে কতকগুলি বিভাগ আছে। যেমন রাম চুলা, গঙ্গা চক্কী, পবন চক্কী, যমুনা কড়াই ইত্যাদি।"

তদ্ভিন্ন অনেক সন্ন্যাসী স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসার করিয়া থাকেন। তাহাও উক্ত হইয়াছে—

"ইহারা দণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ থাকিলেও স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া সংসার করে ও কৃষি কর্ম্মাদি বিষয়কর্ম্মও করিয়া থাকে। ইহারা পূর্ব্বলিখিত দশনামের অন্তর্গত তীর্থ আশ্রমাদি উপাধি ধারণ করে ও মধ্যে মধ্যে দণ্ড কমণ্ডলু লইয়া গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিয়া তীর্থ ভ্রমণ ও ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বিশেষতঃ কাশী জেলার মধ্যে স্থানে স্থানে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বসতি আছে। নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহাদের বিবাহ চলিয়া থাকে। অপরাপর গৃহস্থ লোকের যেমন স্বগোত্রে বিবাহ করিতে নাই, ইহাদেরও সেইরূপ নিজ মঠের দণ্ডী গৃহে পানিগ্রহণ করা বিধেয় নয়। সারদা মঠের অন্তর্গত তীর্থ, আশ্রম, শৃঙ্গেরী মঠের ভারতী ও সরস্বতী গৃহে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আপন মঠের কোন দণ্ডী-কন্যার পানি গ্রহণ করিতে পারে না। দণ্ডী অথচ গৃহস্থ এ কথাটী আপাততঃ সুবর্ণময় পাষাণ পাত্রের মত অসঙ্গত ও কৌতুকাবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

আলোচ্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের **বৈরাগী** অথচ **গৃহস্থ** ঠিক উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়েরই অনুরূপ হইয়াছে। অথবা তাঁহারাই যাযাবর-বেশে এদেশে আসিয়া বৈষ্ণব পরিচয়ে গৃহস্থ হইয়াছেন, এরূপ অনুমানও নিতান্ত অমূলক হইবে না। শ্রী-সম্প্রদায়ী, ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী ও অনেক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী এইরূপে স্ত্রীপুত্র কন্যা লইয়া এই বাঙ্গালার অধিবাসী ও গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। শৈব-উদাসীনই সাধারণতঃ সন্ন্যাসী এবং বৈষ্ণব-উদাসীনই সাধারণতঃ বৈরাগী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বৈরাগী-বৈষ্ণব।

সত্য বটে যাঁহারা বিষয়-বাসনা-বর্জ্জিত হইয়া সংসার-আশ্রম ত্যাগ করেন, তাঁহাকেই বৈরাগী বলা যায়। কিন্তু লোকে তাহার অর্থ-সঙ্কোচ করিয়া বৈষ্ণব মাত্রকেই "বৈরাগী" বা বৈরাগী-ঠাকুর বলিয়া থাকে। প্রবাদ আছে রামানন্দ—যিনি রামাৎ-সম্প্রদায় গঠন করেন তাঁহার এক শিষ্য শ্রীআনন্দ, বিশিষ্টরূপে বৈরাগ্য ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহা

হইতেই বৈরাগীদের প্রবাহ প্রবল হইয়া ভারতের দক্ষিণ ভাগে—এমন কি এই গৌড়বঙ্গেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁরা নানা স্থানে মঠ স্থাপন করেন—বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং এই বৈরাগী আখ্যাটী নিতান্ত আধুনিক বা শ্রীমহাপ্রভুর সমসাময়িক নহে। দাবিস্তান্ গ্রন্থে লিখিত আছে ১০৫০ হিজিরিতে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৩২ শতাব্দিতে মুণ্ডীদিগের সহিত নাগা-বৈরাগীদের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। আবার ১৫৮১ শকে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৫৬০ শতাব্দিতেও একবার শৈব-সন্ন্যাসীদের সহিত নাগা-বৈরাগীদের যুদ্ধ হয়। বৈরাগীরা পরাস্ত হইয়া তথা হইতে একবারে বিতাড়িত হন। সেই বৈরাগীরাও কতক এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। সেই বৈরাগীদের নামানুসারেই বাঙ্গলা দেশে সচরাচর গৃহস্থ-বৈষ্ণবদিগকেও " বৈরাগী " বলে।

এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব আসিয়া এই গৌড় বঙ্গে বাস করেন, পরস্পর বৈবাহিক সূত্রে আদান প্রদান করিতে সঙ্কুচিত হওয়ায় ক্রমশঃ পৃথক্‌ভূত হইয়া এক একটী শ্রেণীতে পরিণত হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর শ্রীমহাপ্রভুর সময় অনেকেই তাঁহার দেখাদেখি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে পিতামাতার অনুরোধে বা অন্যান্য কারণে পুনরায় গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিয়া বিবাহ করিতে বাধ্য হন। শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু দার-পরিগ্রহ করায়, তাঁহার দেখাদেখিও অনেক সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব সংসারী হইয়া পড়েন এবং প্রাগুক্ত গৌড়াদ্য বৈষ্ণব সমাজের পুষ্টিসাধন করেন।

ব্রাহ্মণাদি সকল জাতির মধ্যে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদবী আছে। গৌড়াদ্য বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও সেইরূপ বহু পদবী প্রচলিত আছে। মনে হয়—দাস, বৈরাগী; অধিকারী, মোহন্ত ও গোস্বামী ভিন্ন বুঝি বৈষ্ণবের আর উপাধি নাই। আজ কাল

পদবী বা উপাধি।

অনেকে " দাস " এই উপাধি শূদ্রবাচক বলিয়া উপহাস করেন; তাই আজকাল বৈদ্যের উপাধি " দাস " স্থলে " দাশ " হইয়াছে। যদিও বৈষ্ণব—" দাসভূতো

হরেরেব নাস্ত্যেব কদাচন।" এবং শ্রীমহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ।"

ইহা পারমার্থিক জগতের কথা, ইহার সহিত সামাজিক-মর্য্যাদার কোন সম্বন্ধ নাই।

উৎকলশ্রেণী ব্রাহ্মণদের মধ্যেও 'দাস' উপাধি আছে। বৈষ্ণবদের দাস উপাধি ভগবদ্ভক্তির উদ্দীপক। শূদ্রত্ব-জ্ঞাপক নহে। "দীয়তে অস্মৈ দাসঃ" অর্থাৎ দানের পাত্র, এইরূপ অর্থেও দাস শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। বৈষ্ণবই মুখ্য দানের পাত্র।

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।

তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহং॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত ইতিহাস সমুচ্চয়।

হরিভক্তি বর্ত্তে যদি ম্লেচ্ছ বা চণ্ডালে।

দান গ্রহণের পাত্র সেই বেদে বলে॥"

আবার "উচ্ছিষ্ট ভোজিনো দাসা স্তব মায়াং জয়েম হি।" এই ভাগবতীয় প্রমাণানুসারে বুঝা যায়, বৈষ্ণব শ্রীভগবানের মহাপ্রসাদভোজী দাস, শূদ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্টান্নভোজী দাস নহেন। সুতরাং বৈষ্ণবের দাসোপাধি শূদ্রত্বজ্ঞাপক নহে।

বৈষ্ণবের এই দাসোপাধি ভগবদ্দাস্য-দ্যোতক বৈষ্ণব-সাধারণ-উপাধি। 'অচ্যুতগোত্র' যেরূপ বৈষ্ণব-সাধারণ ধর্ম্মগোত্র, 'দাস' উপাধিও সাধারণ উপাধি।

গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতি সমাজে—দাস উপাধি ভিন্ন, আরও বহু উপনাম বহু প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা—

দাস, অধিকারী, বৈরাগ্য, মোহন্ত, ব্রজবাসী, গোস্বামী, ঠাকুর, উপাধ্যায়, আচার্য্য, ভারতী, পুরী, পূজারী, পাণ্ডা, আচারী, দণ্ডী, ভক্ত, সাধু, দেবাধিকারী, দেব-গোস্বামী প্রভৃতি। এইরূপ উপাধিগত পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন বংশের গৌরব-দ্যোতক।

আমাদের এই আলোচ্য গৌড়াদ্য বৈষ্ণবজাতি-সমাজে এক্ষণে এত ভেজাল প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে যে, 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইয়া গিয়াছে। তাই সদাচারী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণকে লইয়া এমন একটী সমাজ বন্ধন করিতে হইবে যে, ইহা একবার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া গেলে, তখন এই গৌড়াদ্য বৈষ্ণবজাতি বাঙ্গলার একটী বড় জাতি বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার সামাজিক মর্য্যাদার স্থান নির্ণয়ের জন্য কাহারও অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে হইবে না। সদাশয় গভর্ণমেণ্টের নিকটও দেখাইতে পারিবে, গৌড়াদ্য বৈদিক বৈষ্ণব, বাঙ্গলার খাঁটি বৈষ্ণব জাতি—তাঁহারা সংখ্যায় এত—বাকী সমাজের অন্য স্তরের বৈষ্ণব। 'ব্রাহ্মণ' বলিলে যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র, শ্রোত্রীয়, কুলীন ব্রাহ্মণও বুঝায়, বর্ণের ব্রাহ্মণও বুঝায় আর মুচির ব্রাহ্মণও বুঝায়। নামে এক হইলেও সামাজিক মর্যাদায় সকলে এক নহেন। সেইরূপ বৈষ্ণবের মধ্যেও উচ্চ অধম ভেদ বিদ্যমান আছে। অধিকার ভেদে শাস্ত্রেও যখন বৈষ্ণবের উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ ভেদ আছে, তখন সমাজ ও আচার-নিষ্ঠ উচ্চাধম ভেদ সূচনা করিয়া সমাজের শৃঙ্খলা বন্ধন করা দোষাবহ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এজন্য সর্ব্বত্র **কুলতালিকা সংগ্রহ*** করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের বংশাবলী সিদ্ধ-বৈষ্ণব মহাজনের জীবনী, উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী সংগ্রহ করিতে হইবে। ইহাতেই গৌড়াদ্য বৈষ্ণব জাতির বিরাট ইতিহাস সঙ্কলিত হইবে। ইহাই এখন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। এই বিরাট অনুষ্ঠানটী সুসম্পন্ন করিতে হইলে, বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলায় প্রত্যেক সাব্‌ডিভিজনে সভা সমিতি করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে। এজন্য উপযুক্ত শিক্ষিত প্রচারকের আবশ্যক। অর্থের আবশ্যক। সকল জাতিরই ধন-

* বৈষ্ণবগণ স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, পরিশিষ্ট খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। গ্রন্থকারের নিকট প্রেরিতব্য।

বল, জনবল, বিদ্যাবল আছে, এই দুর্ভাগ্য বৈষ্ণব-জাতি সকল বিষয়েই দুর্ব্বল—নিঃসম্বল ; জানিনা এটা শ্রীভগবানের অপার করুণা কি অভিশাপ! অর্থবল না থাকিলে বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হওয়া দুরূহ। জাতীয় কার্য্যের জন্য জাতীয় ধনভাণ্ডারের যে কত আবশ্যকতা, তাহা অধিক বুঝাইতে হইবে না। তার-পর জাতীয় আন্দোলনের কার্য্য বিবরণ স্বজাতিবর্গের নিকট প্রচারের জন্য, জাতীয় পত্রিকা পরিচালন, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি। এ সব কার্য্যই শ্রম ও ব্যয়-সাধ্য এবং বহু অর্থ-সাপেক্ষ। ভরসা করি, শিক্ষিত ও ধনী বৈষ্ণবগণ এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিবেন।

---:০:---

ষোড়শ উল্লাস।

—:০:—

মৃৎ-সমাধি বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা।

হিন্দু-সাধারণের মধ্যে মৃতদেহ অধিকাংশস্থলে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণব জাতির মধ্যেও এই দাহ-প্রথা যে একেবারে প্রচলিত নাই, তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে দাহ ও মৃৎ-সমাধি উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ দগ্ধ করিবার পর অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ অস্থি লইয়া শ্রীতুলসী ক্ষেত্রাদি পবিত্রস্থানে সমাহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশস্থলে বৈষ্ণবের সর্ব্বাবয়ব মৃতদেহ ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। বৈষ্ণবের এইরূপ মৃত-সৎকার-পদ্ধতিকে সাধারণ অজ্ঞব্যক্তি যাহাই বলুক না কেন, অনেক বিদ্যাশূন্য বিদ্যাভূষণ এমন কি গোস্বামী উপাধি-ভূষিত অনেক বৈষ্ণববিদ্বেষ্টাও বৈষ্ণব-সমাজে চিরপ্রচলিত এই বিশুদ্ধ বৈদিক-প্রথাকে অনাচার ম্লেচ্ছাচার বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না। তাঁহাদের ধারণা "শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি বা সমাজ দিয়াছিলেন, তাহারই দৃষ্টান্তে বৈষ্ণবগণ মৃতপিত্রাদির দেহ সমাজ দিয়া থাকেন।" এইরূপ অসঙ্গত অশ্রাব্য মন্তব্য প্রকাশ বাল-সুলভ চপলতা বা বৈষ্ণব-নিন্দার চূড়ান্ত নিদর্শন ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

সে যাহাহউক বৈষ্ণবের মৃতদেহের মৃৎ-সৎকার বা সমাজ দেওয়ার পদ্ধতি যে দাহ-প্রথার ন্যায় শ্রুতিসম্মত এবং সম্পূর্ণ বৈধ, তাহা নিম্নলিখিত শ্রুতিবাক্য-গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহজেই বোধগম্য হইবে। মৃতদেহ সমাহিত কালে এই মন্ত্র গুলি পঠিত হইয়া থাকে। যথা—

"ওঁ উপসর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচসং পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতু নির্ঋতে রুপস্থাৎ॥ ১০॥

ওঁ উচ্ছ্বাংচস্ব-পৃথিবি মা নিবাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সূপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি॥ ১১॥
ওঁ উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্রং মিত উপ হি শ্রয়ং তাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবংতু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র॥” ১২॥

ঋগ্বেদ।—৭ম, অষ্টক, ১০ম, মণ্ডল ৬ষ্ঠ অঃ
১৮ সূক্ত ১০—১২ ঋক্।

হে মৃত! জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর। ইহা সর্ব্ব-ব্যাপিনী; ইহাঁর আকৃতি সুন্দর, ইনি যুবতীর ন্যায় তোমার পক্ষে যেন রাশিকৃত মেষলোমেরমত কোমলস্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণাদান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ, ইনি যেন নিঋতি (অকল্যাণ) হইতে তোমাকে রক্ষা করেন। ১০॥

হে পৃথিবি! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাকে পীড়া দিওনা। ইহাকে উত্তম উত্তম সামগ্রী ও উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর। ১১॥

পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপে অবস্থিতি করুন। সহস্রধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্বরূপ হউক। ১২॥

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বৈষ্ণব-মৃতের মৃৎ-সমাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে শ্রীমৎহরিদাসঠাকুরের সমাধির অনুকরণ নহে, পরন্তু বিশুদ্ধ বৈদিকপ্রথা, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইল। আবার ঐ সময়ে দাহ প্রথাও প্রবর্ত্তিত ছিল। যথা—

“মৈনমগ্নে বি দহো মাভিশোচো মাস্য ত্বচং চিক্ষিপো মা শরীরং।
যদা শৃতং কৃণবো জাতবেদোঽথেমেনং প্রহিণুতাৎ পিতৃভ্যঃ॥”

ঋগ্বেদ। ৭অ, ১০ম, ৬অ, ১৬ সূক্ত ১ম, ঋক্।

হে অগ্নি! এই মৃতব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন

ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাকে পিতৃলোকদিগের নিকট পাঠাইয়া দিও।

ফলতঃ সেই স্মরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে খনন ও দাহ এই উভয় প্রথা প্রচলিত রহিয়াছে। এই উভয় প্রথার মধ্যে বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ খনন প্রথার (ভূগর্ভে প্রোথিত করার) অধিক পক্ষপাতী হইলেন কেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত ঋক্‌-গুলি আলোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। মৃতের জন্য পৃথিবীর নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, "হে পৃথিবী! জননী যেমন স্নেহপূর্ব্বক অঞ্চল আবৃত করিয়া সন্তানকে ক্রোড়ে লয়, তুমিও সেইরূপ এই মৃতকে গ্রহণ কর এবং দেখো, যেন ইহার অকল্যাণ না হয়।" আর অগ্নির নিকট প্রার্থনা করা যাইতেছে—"হে অগ্নি! ইহাকে একেবারে ভস্ম করিয়া ক্লেশ দিও না। তোমার তাপে ইহার শরীর দগ্ধ হইতে থাকিলে তখনই ইহাকে পিতৃলোকে পাঠাইয়া দিও।" জীবনান্তে শ্রীভগবদ্ধামে ভগবদ্দাস্যলাভই বৈষ্ণবের লক্ষ্য; সুতরাং ইহাই বাঞ্ছনীয়,—প্রার্থনীয়। অতএব বৈষ্ণব-মৃতদেহকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া তাঁহাকে স্বধাম হইতে পিতৃলোকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে যাইবেন কেন? গীতা স্পষ্টই ঘোষণা করিয়াছেন—

"যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄণ্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্ যাজিনোপি মাম্॥"

অর্থাৎ যাঁহারা দেবব্রত তাঁহারা দেবলোকে এবং পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে গমন করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবদ্ধামে গমন করিয়া থাকেন।

এইজন্য বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ দাহপ্রথা গ্রহণ না করিয়া ভক্তিধর্ম্মের অনুকূল-বোধে খনন-প্রথাই গ্রহণ করিয়াছেন! দাহ না করিলে মৃতের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া লোপ হয় বলিয়া প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রে দাহপ্রথার প্রতি যে অধিক দার্ঢ্যপ্রকাশ দেখা যায়, স্মৃতির ঐ ব্যবস্থা অবৈষ্ণবপর বলিয়াই জানিবেন। কারণ, বৈষ্ণবের প্রেতত্ব

নাই। সুতরাং প্রেতকার্য্য করিতে গেলে বৈষ্ণবকে নামাপরাধী হইতে হয়। বৈষ্ণব মৃত পিত্রাদিকে শ্রীভগবদ্ধাম হইতে টানিয়া আনিয়া ভূত-প্রেত সাজাইয়া পুনরায় তাঁহার উর্দ্ধগতির চেষ্টা করিতে যাইবেন কেন? গৃহস্থ-বৈষ্ণব ও সন্ন্যাসী-বৈষ্ণব ভেদে গতির তারতম্য না থাকায়, বিশুদ্ধাচারী বৈষ্ণবমাত্রেই মৃত-সংকার খনন-প্রথা অনুসারে করিতে পারেন। এই বৈষ্ণব-সমাজে এবং গৌড়ীয়-গোস্বামী ও মহান্তগণের মধ্যে এই সদাচার বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব বৈষ্ণবের সমাজ দেওয়া যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আবার যাঁহারা বৈষ্ণবের এই সমাজ-প্রথাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এমন কি ম্লেচ্ছাচার বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না, তাঁহাদের মধ্যেও আবার অবস্থা বিশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যখন একটী দেড়-বৎসরের শিশুকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে হয়, তখন ইহা ঘৃণিত দূষণীয় গণ্য হয় না তো? ইহাও তো বৈদিক প্রথা অনুসারেই করা হইয়া থাকে। আবার সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়—

"সন্ন্যাসীনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈ নিখনেদ্বাপ্সু মজ্জয়েৎ।"

অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের মৃতদেহ কখন দাহ করিবে না। পরন্তু পুষ্প চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে কিম্বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

"দণ্ড গ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ" অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ মাত্র মনুষ্য নারায়ণ তুল্যতা লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার স্বভাব, জন্ম ও দেহ সকলই পবিত্র। সেই পবিত্র দেহকে যথাবৎ পূজা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করাই বিধি। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-শরণ গ্রহণ মাত্র বৈষ্ণব মায়াতীত ও চিদানন্দ-স্বরূপ হন। যথা শ্রীচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

"প্রভু কহে বৈষ্ণবদেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে তৎকালে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করে তাঁর চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

অতএব বৈষ্ণবের স্বভাব, জন্ম ও দেহের দোষ দর্শনে তাঁহাকে প্রাকৃত মনে করা মহাঅপরাধজনক। যথা উদেশামৃতে—

"দৃষ্টৈ স্বভাব জনি তৈ র্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" শ্রীপাদ রূপ।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ ১১।২৯।২৩।

অর্থাৎ যে সময়ে মনুষ্য ভক্তিপ্রতিকূল সমস্ত কর্ম্ম বা কর্ম্মের কর্তৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্ম সমর্পণ করে, আমি তখনই তাহাকে আপনার স্বরূপ মনে করি।

এই জন্য বৈষ্ণবের দেহকেও অতি পবিত্রভাবে ভূগর্ভে প্রোথিত করা হইয়া থাকে। আবার বৈষ্ণব যখন শ্রীভগবানে আত্ম সমর্পণ করেন তখন সে দেহ শ্রীভগবানের হয়। প্রভুর দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করা দাসের কার্য্য। তাই, শ্রীভগবানের নিত্যদাস বৈষ্ণবগণ, বৈষ্ণবের দেহ পবিত্র ভগবদ্দ্রব্যজ্ঞানে জননী স্বরূপা ধরণীর সুকোমল অঙ্কে রক্ষা করেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণ-বিরহে দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীগৌরভগবান্ বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে, তোমার দেহ মোর নিজধন।
তুমি মোরে করিয়াছ আত্ম সমর্পণ॥

পরের দ্রব্য তুমি কেনে চাহ বিনাশিতে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার কিবা না পার করিতে !”

শ্রীচরিতামৃত অন্ত ৪র্থ পঃ।

আবার প্রেতাত্মার সহিতই দেহের সম্বন্ধ ; বৈষ্ণবের শুদ্ধাত্মার সহিত এই অনিত্য পাঞ্চভৌতিক দেহের সম্বন্ধ ঘটাইতে গেলে অর্থাৎ দেহ না পোড়াইলে সেই আত্মার পারলৌকিক কল্যাণ হইবে না, এরূপ কথা বলিলে ঘোর দেহাত্মবাদ আসিয়া পড়ে, দেহাত্মবাদ ভ্রান্তিমাত্র। এই জন্যই বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণ এই অবৈষ্ণবপর ভ্রান্তিজালে পতিত হইতে ইচ্ছা করেন না।

অতএব শরণাতীত প্রাচীন কাল হইতে যে, শবের দাহ প্রথা, ভূগর্ভে প্রোথিত করা প্রথা ও নিক্ষেপ-প্রথা যুগপৎ প্রবর্ত্তিত আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটীতেও এ বিষয়ের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

“ যে অগ্নিদগ্ধা যে অনগ্নিদগ্ধা মধ্যে দিবঃ স্বধয়া
মাদয়তে।
তেভিঃ স্বরাল সুনীতি মেতাং যথাবশং তন্বং
কল্পয়স্ব ॥”

ঋগ্বেদ ১০ম। ১৫। ১৪ ঋক্।

হে স্বপ্রকাশ অগ্নি ! যে সকল পিতৃলোক অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়েন নাই, যাঁহারা স্বর্গমধ্যে স্বধার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সহিত একত্র হইয়া তুমি আমাদিগের এই সজীব দেহকে তোমার ও তাঁহাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত কর।

“ যে অগ্নিদগ্ধাঃ যে অনগ্নিদগ্ধাঃ ” এই ঋক্ দ্বারা, প্রমাণিত হইল যে, উভয় প্রকার প্রথাই তখন প্রচলিত ছিল। পরন্তু “ অনগ্নিদগ্ধা ” বাক্যে ভূগর্ভে প্রোথিত করা ব্যতীত নিক্ষেপ প্রথাও সূচিত হইতে পারে। সুতরাং ঋগ্বেদের সময়েও যে নিক্ষেপ প্রথা ছিল, এরূপ অনুমান অমূলক নহে। অথর্ব্ববেদে

ত্রিবিধ শব-সৎকার প্রথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের আহ্বান মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"যে নিখাতা যে পরিষা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতা।
সর্ব্বাস্তাং নগ্ন আবহ পিতৃন্ হবিষে অতবে॥"

১৮।২।৩৪।

হে অগ্নি! যাঁহারা ভূমিতে প্রোথিত হইয়াছেন, যাঁহাদিগকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, যাঁহাদিগকে দগ্ধ করা হইয়াছে, সেই সকল পিতৃগণকে তুমি ভোজনার্থ আনয়ন কর।

বিভিন্ন বর্ণের জন্য ঐরূপ বিভিন্ন প্রথা বিহিত হইতে পারে না। কারণ, বৈদিক কালে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং, এই তিনটী প্রথার মধ্যে কোনটাই দূষণীয় বা ঘৃণিত হইতে পারে না। এই তিনটী প্রথাই যখন শ্রুতিমূলক, তখন এই তিনটী প্রথাই নিত্য। অতএব বৈষ্ণবের সমাধি বা সমাজ পদ্ধতি যে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

এস্থলে আর একটী বিষয়ের অবতারণা করা যাইতেছে যে, কোন কোন স্থানে বৈষ্ণবগণ আসন্নমৃত্যু আতুরের দ্বারা লবণ সংযুক্ত দান করাইয়া থাকেন এবং মৃতদেহ সমাহিত করিবার কালেও লবণ দান করিয়া থাকেন ; ইহা দেখিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই মনে করেন, শব শীঘ্র গলিত ও জীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যেই এইরূপ লবণ প্রদান করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা নহে। ইহা একটী শাস্ত্র-সম্মত বিশুদ্ধ আচার। গরুড় পুরাণ, উত্তর খণ্ডে লিখিত আছে—

"পিতৃণাঞ্চ প্রিয়ং ভব্যং তস্মাৎ স্বর্গপ্রদং ভবেৎ।
বিষ্ণুদেহসমুদ্ভূতো যতোঽয়ং লবণো রসঃ॥
বিশেষাল্লবণং দানং তেন সংসন্তি যোগিনঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং স্ত্রীণাং শূদ্রজনস্য চ।
আতুরাণাং যদা প্রাণাঃ প্রয়ান্তি বসুধাতলে।
লবণন্তু তদা দেয়ং দ্বারস্যোদ্ঘাটনং দিবঃ॥"

অর্থাৎ লবণ পিতৃদেবগণেরও প্রিয়, অতএব তাহা সর্ব্বকামপ্রদ হয়। ইহা বিষ্ণুদেহোৎপন্ন, সুতরাং সর্ব্বরসোত্তম। অতএব গুণবাহুল্য বশতঃ লবণযুক্ত দানই যোগিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রী যখন ইহাদের প্রাণ পৃথিবীতলে নীয়মান হয়, তখন লবণদান কর্ত্তব্য। তাহাতে স্বর্গের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়।

অতএব বৈষ্ণবগণ মৃতদেহ সমাহিত কালে বিষ্ণুদেহোৎপন্ন লবণ কেন যে দান করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয়, আর কাহাকে অধিক বুঝাইতে হইবে না। ইহা নিশ্চয় জানা উচিত, বৈষ্ণবের আচার ব্যবহারের মধ্যে কোনটিই কপোল-কল্পিত বা অশাস্ত্রীয় নহে। সুতরাং না জানিয়া শুনিয়া বৈষ্ণবের কোন আচার ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ করিয়া সহসা একটা মন্তব্য প্রকাশ করা, ঘোর অপরাধের বিষয় নহে কি ?

———:০:———

সপ্তদশ উল্লাস।

—————:o:—————

শ্রাদ্ধ-তত্ত্ব।

বৈদিককালের পিতৃযজ্ঞ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতৃ-তর্পণ। যে কর্ম্ম দ্বারা পিতৃগণের তৃপ্তি বা সুখ সম্পাদিত হয়, তাহার নাম পিতৃ-তর্পণ এবং যে কর্ম্মাদি দ্বারা শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা যায়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ শব্দের নিরুক্তি এই যে,—

"শ্রৎ সত্যম্ দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্।"

অর্থাৎ শ্রৎ শব্দে সত্যকে বা সৎ-পদার্থ (ব্রহ্ম পদার্থকে) বুঝায়, যদ্দ্বারা সেই সত্য বা ব্রহ্মপদার্থ লাভ করা যায়, তাহাকে শ্রদ্ধা কহে এবং সেই শ্রদ্ধাসহকারে কৃতকার্য্যের নামই শ্রাদ্ধ।

ঐ শ্রাদ্ধও অবার প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত। যথা—পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট। পিতৃসাধারণের জন্য যাহা কৃত হয়, তাহার নাম পার্ব্বণ এবং একের উদ্দেশে যাহা কৃত হয়, তাহার নাম একোদ্দিষ্ট। শাস্ত্রে এই শ্রাদ্ধ অহরহঃ অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—

"কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥" মনু।

অর্থাৎ অন্নাদি দ্বারা, জল দ্বারা, অথবা দুগ্ধ বা ফলমূলাদি দ্বারা পিতৃগণের প্রীতি-উদ্দেশে অহরহঃ অর্থাৎ প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে।

আবার আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ, তানেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত।"

অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশে বা পিতৃগণকে যে দান, তাহার নাম পিতৃযজ্ঞ। এই যজ্ঞ প্রতিদিন করিবে।

এই যে শাস্ত্রে নিত্য পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃশ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবার বিধি উল্লিখিত হইয়াছে, ইহা মৃত পিতৃগণের উদ্দেশে কি জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশে বিধেয়, এক্ষণে তাহাই বিচার্য্য।

" অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।

হোমো দৈবোবলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥ মনু।

অর্থাৎ অধ্যয়ন-অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দৈবযজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি দানরূপ বলির নাম, ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ। অতএব ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, ভূতগণ ও অতিথি সকল, ইঁহারা সকলেই গৃহস্থের উপর প্রত্যাশা রাখেন। সুতরাং স্বাধ্যায় পাঠে ঋষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিবেন, হোম দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের, অন্নাদি দ্বারা—তদভাবে মিষ্টবচন দ্বারাও অতিথিগণের প্রীতি সম্পাদন করিবে এবং বলিদত্ত অন্নাদি দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি জীবগণের যথাবিধি তৃপ্তি-সাধন করিবে। এই পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে অপর চারিটী যজ্ঞ যখন জীবিতগণের উদ্দেশে বিহিত, তখন পিতৃযজ্ঞও যে জীবিত পিতৃগণের উদ্দেশেই বিহিত হইয়াছে, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। উক্ত দৈনিক কৃত্য জীবৎ-পিতৃযজ্ঞই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পরবর্ত্তীকালে মৃতক শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে পরিণত হইয়াছে। এখন শ্রাদ্ধ বলিলে কেবল মৃতব্যক্তিরই শ্রাদ্ধ বুঝাইয়া থাকে। 'শ্রাদ্ধ' শব্দ কোন জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে প্রযুক্ত হইলে, উহা লোকে উপহাস বা গালি বলিয়া গণ্য করেন। কালের প্রভাব এমনই বিচিত্র!! বহু প্রাচীনকালের কথা নহে, মহাভারতের সময়ও শ্রাদ্ধবিধি জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইত। মহারাজ পৌষ্যের রাজসভায় সমাগত ঋষি উত্তঙ্কের শ্রাদ্ধই তাহার প্রমাণ। মহারাজ পৌষ্য, ঋষি উত্তঙ্ককে বলিয়াছিলেন—

" ভগবংশ্চিরেণ পাত্রমাসাদ্যতে ভবাংশ্চ গুণবানতিথি

স্তদিচ্ছে শ্রাদ্ধং কর্ত্তুং ক্রিয়তাং।" আদিপর্ব্ব।

হে ভগবন্! সৎপাত্র সর্ব্বদা পাওয়া যায় না, আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত, অতএব আমি আপনার শ্রাদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

তদুত্তরে ঋষি উতঙ্ক বলিয়াছিলেন—

"কৃতক্ষণ এবাস্মি শীঘ্রমিচ্ছা যথোপপন্নমুপস্কৃতং ভবতীতি।

স তথেত্যুক্ত্বা যথোপপন্নেনান্নেনৈনং ভোজয়ামাস।"

"রাজন্! আমি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতেছি, যে অন্ন উপস্থিত আছে, আপনি তাহাই লইয়া আসুন।" অনন্তর মহারাজ পৌষ্য, যথোপস্থিত অন্ন আনিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইলেন।

বর্ত্তমানকালে এই প্রকার জীবৎশ্রাদ্ধ একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। তৎ-পরিবর্ত্তে মৃতকশ্রাদ্ধই বহু বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। মৃতশ্রাদ্ধকালে যে সকল ঋক্ ও যর্জ্জুর্ব্বেদীয় মন্ত্র সকল পঠিত হইয়া থাকে, তাহার কোথাও 'শ্রাদ্ধ' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রাদ্ধ-প্রণালী যে, বৈদিককালের জীবৎ-শ্রাদ্ধের অর্থাৎ পিতৃযজ্ঞেরই আভাসমাত্র তাহা সহজেই অনুমেয়। এক দিকে যেমন বৈদিক আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সেই সঙ্গে প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকেও সময়োপযোগীরূপে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করা হইয়াছে। পরন্তু বৌদ্ধ ও মুসলমান বিপ্লবের সময়েও যে সামাজিক আচার-ব্যবহার ও নীতি-ধর্ম্মের বহুল বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু-সমাজে শ্রুতির পরেই স্মৃতির আদর পরিদৃষ্ট হয়। মনু-সংহিতা অন্যান্য সংহিতা অপেক্ষা অধিক বেদার্থ-প্রতিপাদক বলিয়া বিশেষ সমাদৃত ও প্রামাণিক। কিন্তু সে প্রাচীন মনুস্মৃতিই বা এখন কোথায়? এবং ঋষি মেধাতিথি-প্রণীত তাহার ভাষ্যই বা এখন কোথায়? তাহা বহুকাল পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান সময়ে মনু-স্মৃতি যে আকারে দেখিতে পাই, উহা সহারণ-সুত মহারাজ মদন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। ইহা ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্যেই পরিব্যক্ত হইয়াছে—

"মান্যা কাপি মনুস্মৃতি স্তদুচিতা ব্যাখ্যা হি মেধাতিথেঃ

সা লুপ্তৈব বিধের্বশাৎ কচিদপি প্রাপ্যং ন যৎ পুস্তকম্।

ক্ষৌণীন্দ্রো মদনঃ সহারণ-সুতো দেশান্তরাদাহৃতৈঃ
জীর্ণোদ্ধার মচীকরৎ তত ইতস্তৎ পুস্তকৈ র্লিখিতৈঃ ॥"

অন্যান্য সংহিতাগুলি ইহারই অনুসরণে পরবর্ত্তী কালে রচিত এবং প্রাচীন রীতি অনুসারে কোন বিশেষ বেদশাখার সহিত সম্বন্ধও নহে। সুতরাং প্রচলিত স্মৃতিসমূহ, প্রাচীন ধর্ম্মসূত্রগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সমাজ-শাসক সুধীব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যে বর্ত্তমান আকারে রূপান্তরিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব কোন ধর্ম্মাচারের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিতে হইলে কেবল এই সকল রূপান্তরিত গ্রন্থরাজির উপর নির্ভর করা যায় না।

অতএব যে যে স্থলে মতের বিরোধ উপস্থিত হইবে, সেই সেই স্থলেই বেদ-বিহিত মতই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু—

'ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ ॥'

এখন দেখা যাউক, 'পিতৃ' শব্দ কাহাকে নির্দ্দেশ করে।

শ্রুতি 'পিতৃ' শব্দে কেবল জন্মদাতা পিতাকে নির্দ্দেশ না করিয়া প্রধানতঃ ব্রহ্মবিদ্ বিদ্বান ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ পিতৃপদবাচ্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

"ত্বং হি নঃ পিতা যোঽস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং তারয়সীতি।"

প্রশ্নোপনিষদ্ ॥

আপনিই আমাদের পিতা, যেহেতু আপনি আমাদিগকে এই অবিদ্যা বা মায়া-সাগর হইতে পরমপারে উত্তীর্ণ করিতেছেন। সুতরাং—

"উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্মদঃ পিতা।
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্য প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্ ॥" মনু।

জন্মদাতা ও ব্রহ্মজ্ঞানদাতা এতদুভয়ের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞানদাতা পিতাই গরীয়ান্। কারণ, জন্মদাতা পিতা কেবল নশ্বর জড়দেহের উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানদাতা ব্রহ্মপ্রাপ্তিমূলক যে জ্ঞানময় দেহের উৎপাদন করেন, তাহা জড়াতীত ও শাশ্বত। অতএব পিতৃশব্দ রূঢ়ার্থে যে কেবল জন্মদাতা পিতাকেই বুঝায়, তাহা নহে। শাস্ত্রে

সপ্তপিতা উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

কন্যাদাতা, অন্নদাতা, জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই সাতজনই পিতৃপদবাচ্য। তদ্ভিন্ন যজুর্ব্বেদে অষ্ট পিতৃগণেরনাম উক্ত হইয়াছে। যথা, ১ সোমপা, ২ সোমসদ, ৩ অগ্নিষ্বাত্তা, ৪ বর্হিষদ, ৫ হবির্ভুজ ৬ আজ্যপা, ৭ সুকালীন, ৮ যমরাজ।

আবার যজুর্ব্বেদে যে বসু—পিতা, রুদ্র—পিতামহ ও আদিত্য— প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষের নামোল্লেখ আছে, উঁহারা মৃত-পিত্রাদি নহেন অথবা বস্বাদি নামধেয় কোন পৃথক সত্ত্বাবিশিষ্ট জীবও নহেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ পাঠে জানা যায়, উঁহারা জীবিত বিদ্বান ব্রহ্মচারী বিশেষ— ব্রহ্মচর্য্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উঁহারা ঐরূপ ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গুরুকুলে অবস্থান করিয়া যখন বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তখন তাঁহাতে সকল সদ্‌গুণ বাস করে বলিয়া 'বসু—পিতা' নামে পিতামহ অভিহিত হন। যথা—

"তদস্য বসবোঽন্বায়ত্তাঃ প্রাণাবাব বসব এতে হীদং সর্ব্বং বাসয়ন্তি॥"

৪৪ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা ব্রহ্মচারী যখন বেদাধ্যয়নাদিকরেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া পাষণ্ডগণ ভয়ে রোরুদ্যমান হয় বলিয়া তিনি "রুদ্র" পিতামহ নামে আখ্যাত হন। যথা—

"প্রাণা বাব রুদ্রা এতে হীদং সর্ব্বং রোদয়তি॥"

পরন্তু তৃতীয় ব্রহ্মচর্য্যকালে ৪৮ বর্ষ পর্য্যন্ত যে ব্রহ্মচারী বেদাদি অধ্যয়ন করেন, তিনিই "আদিত্য—প্রপিতামহ" নামে খ্যাত। যথা—

"প্রাণা ব্বাব আদিত্যা এতে হীদং সর্ব্বমাদদতে।"

তাঁহাতে সদ্‌গুণাবলী আদিত্যের অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশরূপে অবস্থান করে বলিয়া তিনি আদিত্য নামে অভিহিত।

অতএব বর্ত্তমান শ্রাদ্ধপদ্ধতিতে যে পিতৃপক্ষে মৃত তিন পুরুষের নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ বিধান ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধের অনুকরণ মাত্র। এই জন্যই শ্রাদ্ধে মৃত ৪ কি ৫ পুরুষের নামোল্লেখ বিহিত হয় নাই। সুতরাং বর্ত্তমান শ্রাদ্ধপদ্ধতি যে বৈদিককালের জীবৎ-পিতৃশ্রাদ্ধের অনুকরণে অভিনব প্রণালীতে গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফলতঃ যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ বেদপারগ তাঁহারাই শ্রাদ্ধার্হ—তাঁহারাই প্রকৃত পিতৃপদবাচ্য। শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের ভোজন করাইলেই প্রকৃত শ্রাদ্ধ করা হয় এবং উহার নামই পিতৃযজ্ঞ। এই জন্যই মনু বলিয়াছেন—

"যত্নেন ভোজয়েৎ শ্রাদ্ধে বহ্বৃচং বেদপারগং।"

যদিও গৃহী-বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগে আধুনিক রূপান্তরিত শ্রাদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রায়শঃ বৈদিক প্রথারই অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-স্মৃতিকর্ত্তা শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী "সৎক্রিয়া-সার-দীপিকা"-পদ্ধতিতে শুদ্ধজাতি-বৈষ্ণবদিগের জন্য শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে যে সংক্ষেপ সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ বেদাচার-সম্মত। তিনি বৈষ্ণবজাতির প্রতি কেমন সুন্দর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দিয়াছেন, দেখুন।

"তথা জীবতি মহাগুরৌ পিতরি সতি ভক্ত্যা তৎ সেবনাদিকং বিনা তস্মিন্ যথাকালে যথাতথা পঞ্চত্বমাপন্নে সতি তন্মৃতাহঃ প্রাপ্য বর্ণাশ্রমাদিষু সর্ব্ব-জীবেষু ভূরিভোজনমাচরণ ব্যতিরেকেন যদি মহদ্ভক্তাস্ত তদা ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রেষু বিশেষতঃ বৈষ্ণবেষু চ সহজান্ন জলাদি নিবেদনং বিনা তেভ্যঃ পিতৃভ্যঃ শ্রীমন্মহা-প্রসাদচরণোদকাদি নিবেদন বাক্যং বিনা চ চেম্বহির্ম্মুখভাবতঃ তর্পণশ্রাদ্ধাদিক্রিয়া-পরত্বেন রচনা সংঘাতব্রতং যেষাং তর্পণশ্রাদ্ধাদি বাক্যরচনা-সংঘাতক্রিয়াপরাণাং কর্ম্মিণাং তথা তে পিতৃলোকান্ যান্তি তৎ কর্ম্মবশাৎ॥"

অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষ্ণবগণ মহাগুরু পিতামাতার জীবিতকালে ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাদের সেবাদি করিবে। পরে মৃত্যু হইলে শ্রাদ্ধদিবসে বর্ণাশ্রমাদি সর্ব্বজীবকেই যথেষ্টরূপে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণাদি জীবমাত্রকেই বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণকে স্বাভাবিক অন্নজলাদি নিবেদন করিবে এবং পিতৃগণকে শ্রীমন্মহাপ্রসাদ-চরণোদকাদি নিবেদন করিবে। এইরূপ অনুষ্ঠান না করিয়া যদি বহির্ম্মুখভাবে তর্পন শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়াপর কর্ম্মিদের ন্যায় আচরণ কর, তাহা হইলে সেই কর্ম্মবশে পিতৃলোকে গতিলাভ হইবে। সুতরাং বৈষ্ণবের বাঞ্ছনীয় ভগবল্লোক-প্রাপ্তি ঘটিয়া উঠে না। শ্রীভগবানের উক্তিই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ, যথা—

"যান্তি দেবব্রতাঃ দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।

ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং ॥"

যাঁহারা দেবপূজক তাঁহারা দেবলোকে, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোকে এবং ভূতপূজকগণ ভূতলোকে গমন করিয়া থাকে, কেবল আমার পূজাপর অর্থাৎ মদ্ভক্তগণই মদীয় লোকে গতিলাভ করিয়া থাকে।

সুতরাং বৈষ্ণবগণ সাধারণতঃ শ্রাদ্ধ-তর্পণক্রিয়াপর কর্ম্মিদিগের ন্যায় শ্রাদ্ধ করেন না বলিয়াই যে তাঁহারা শ্রাদ্ধ করেন না, তাহা নহে। বৈদিক রীতি অনুসারে শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে সর্ব্বতোভাবেই রক্ষিত হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ সংস্কারবিশেষ নহে, বরং ইহাকে একটী কর্ম্মাঙ্গবিশেষ বলা যাইতে পারে। পদ্ধতি গ্রন্থে বৈদিক দশবিধ সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্মধ্যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধকাণ্ড আদৌ বিবৃত হয় নাই। যেহেতু সংস্কার ঔপাধিক—কেবল দেহেরই হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ জীবিত ও মৃত উভয়েরই উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়। সত্য বটে, প্রাচীনকালে কেবল জীবৎ-শ্রাদ্ধই সমাজে প্রচলিত ছিল, পরবর্ত্তিকালে মনীষিগণ কর্ত্তৃক মৃতকশ্রাদ্ধ বর্ত্তমান আকারে আড়ম্বরযুক্ত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মৃতকশ্রাদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত পিত্র্যাদিতে বস্বাদি দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিয়া তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে মনুভাষ্যকার মেধাতিথি এবং গোবিন্দরাজ বলেন—"বিদ্বেষ বা নাস্তিক্য বুদ্ধি বশতঃ যাহারা মৃতের

শ্রাদ্ধক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত না হইবে, তাহাদের প্রবৃত্তি উন্মেষের জন্যই এইরূপ দেবত্ব অধ্যারোপ দ্বারা পিতৃগণের স্তুতিবাদ করা হইয়াছে।” অবস্তুতে বস্তুর আরোপের নামই অধ্যারোপ, সুতরাং ইহা কাল্পনিক। তবেই দেখা যাইতেছে, সমাজে মৃতক শ্রাদ্ধ প্রবর্ত্তিত করিতে পূর্ব্ব সমাজপতিগণকে কিরূপ কৌশলজাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। কোন্ সময় হইতে এইরূপ মৃতকশ্রাদ্ধ সমাজে প্রচালত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। দেখা যাইতেছে, পৃথিবীর সকল মনুষ্যজাতিই মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সুতরাং মৃতব্যক্তির উদ্দেশে কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ও অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। বরাহপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে—আত্রেয় মুনির পুত্র নিমি, পুত্রের মৃত্যুতে অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া তদুদ্দেশে কি করা কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরে মৃতপুত্রের উদ্দেশে এইরূপ শ্রাদ্ধকল্পের অনুষ্ঠান করিলেন। পুত্র জীবদ্দশায় যে যে ফলমূলাদি ভোজন করিতেন, নিমি সেই সকল নব নব রসাল ফলমূলাদি উপকরণ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিলেন এবং ৭ জন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া মাংস, শাক, ফলমূলাদি দ্বারা যথাযোগ্য পরিতৃপ্তি সহকারে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইলেন। অনন্তর পবিত্রভাবে ভূতলে দর্ভ আস্তীর্ণ করিয়া, তাহার উপর শ্রীমানের নাম-গোত্র উল্লেখ পূর্ব্বক পিণ্ডপ্রদান করিলেন। এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইতেন। তখন দেবর্ষিকে দেখিয়া নিমি অতীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। দেবর্ষি ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, নিমি অতীব লজ্জিতভাবে কহিলেন—

“কৃতঃ স্নেহশ্চ পুত্রার্থে ময়া সঙ্কল্প্য যৎকৃতম্।
তর্পয়িত্বা দ্বিজান্ সপ্ত অন্নাদ্যেন ফলেন চ॥
পশ্চাদ্বিসর্জ্জিতং পিণ্ডং দর্ভানাস্তীর্য্য ভূতলে।
উদকানয়নঞ্চৈব স্বপসব্যেন পায়িতম্॥
শোকস্নেহ-প্রভাবেন এতৎ কর্ম্ম ময়া কৃতম্।
ন চ শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং ন দেবৈ ঋষিভিঃ কৃতম্॥”

আমি পুত্রবাৎসল্যের বশীভূত হইয়া নিজেই সঙ্কল্প করিয়া এই কার্য্য করিয়াছি। অন্নাদি ও ফলমূলাদি দ্বারা আমি ৭টী ব্রাহ্মণকে পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া, পরে ভূতলে দর্ভ আস্তীর্ণ করিয়া তাহার উপর পুত্রের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়াছি। আমি শোক ও স্নেহের প্রভাবেই এই কার্য্য করিয়াছি। কোন দেবতা বা ঋষি যে এরূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে কখন শ্রবণ করি নাই। এই জন্যই আমি বিশেষ ভীত হইয়াছি।

এই কথা শুনিয়া শ্রীনারদ কহিলেন—

"ন ভেতব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পিতরং শরণং ব্রজ।
অধর্ম্ম ন চ পশ্যামি ধর্ম্মে নৈবাত্র সংশয়ঃ॥"

ওহে দ্বিজবর! ভয় নাই, ইহাতে তো কোন অধর্ম্মের কারণ দেখিতেছি না। তুমি, তোমার পিতাকে একবার ডাক। নারদের এই কথা শুনিয়া নিমি পিতার ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যান মাত্র আত্রেয় মুনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং পুত্রশোকাতুর পুত্র নিমিকে আশ্বাসিত করিয়া কহিলেন—"নিমির সঙ্কল্পিত এই যে ক্রিয়া ইহার নাম পিতৃযজ্ঞ—এই ধর্ম্মকাণ্ড স্বয়ং ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট।"

অতএব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া পরে মৃতব্যক্তির নাম-গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক তৎপ্রিয়দ্রব্য তদুদ্দেশে নিবেদন করাই প্রকৃত শ্রাদ্ধ। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান মৃতকশ্রাদ্ধে যে সকল বহ্বাড়ম্বর পরিদৃষ্ট হয়, তাহা লোকরঞ্জনার্থ বহিরঙ্গ ব্যাপার মাত্র।

বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্ত বৈদিকমূল শ্রাদ্ধকাণ্ডেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রাদ্ধ বিষয়ে কেবল মালসা-ভোগ দিয়াই সারেন না। তাঁহারা ভগবৎ-প্রসাদ পিতৃগণকে সমাদরের সহিত নিবেদন করিয়া থাকেন এবং ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণকে যথাসাধ্য পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইয়া শ্রাদ্ধ-মহোৎসব সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

পবিত্র ও প্রশস্ত পাত্রে চিড়া, লাজ, গুড়, দধি ফলমূলাদি একত্র করিয়া ভগবানে অর্পণ করিলে প্রকৃতই সুসংস্কৃত মহাপ্রসাদান্ন পরিগণিত হয়। চরু বা পায়স পাক করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদন করার বিধি ও সদাচার আছে। অতএব সেই শ্রীমহাপ্রসাদ বৈষ্ণব-পিতৃগণের উদ্দেশে নিবেদন করিলে তাঁহাদের অতীব প্রীতিপ্রদ হইয়া থাকে। ইহাই তো শাস্ত্রোক্ত মূল শ্রাদ্ধ। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ৯ম, বিলাসে উক্ত হইয়াছে—

"প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"

বৈষ্ণবজন শ্রাদ্ধদিনে প্রথমতঃ ভগবান্‌কে সুসংস্কৃত অন্নাদি নিবেদন পূর্ব্বক, সেই প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। যথা পদ্মপুরাণে—

"বিষ্ণো র্নিবেদিতান্নেন যষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তদনন্তায় কল্পতে॥"

বিষ্ণু-নিবেদিত অন্ন পিতৃগণকে অর্পণ করিলে অনন্ত ফলপ্রদ হয়।

পুনশ্চ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

"যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্ত-শেষং,
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাং স্তুলসীবিমিশ্রা-
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥"

শ্রাদ্ধ সময়ে ভক্তিসহকারে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তুলসীদল সমন্বিত সেই মহাপ্রসাদেরই পিণ্ড দেবগণ ও পিতৃগণকে অর্পণ করিলে, কোটীকল্প যাবৎ পিতৃদেবগণ পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি পিতৃগণকে এইরূপ মহাপ্রসাদ দান নিত্য-শ্রাদ্ধ-বিষয়ক—পার্ব্বণাদিপর নহে,—বলিয়া থাকেন। এই প্রমাণে তাহাদের সেই মত নিরস্ত হইয়া যাইতেছে।

আবার পিতৃগণের উদ্দেশে কেবল শ্রীভগবানে অন্নাদি অর্পণ করিলেও

পিতৃগণের পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে, অবশ্য এস্থলে আপত্তি হইতে পারে—"অন্যের উদ্দেশে ভগবানে অন্নাদি সমর্পণ গৌণ,—মুখ্য নহে। সুতরাং উহাতে ভগবানের বিশেষ প্রীতিসাধন না হওয়ায় বিশেষ ফলজনক হয় না।" এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না; যেহেতু নিজ-পিত্রাদির হিতার্থ ভগবানের পূজা করিলে ভগবানের পরম প্রীতিসম্পাদন হয় এবং পরমফলও প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যথা, স্কান্দে—ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদে—

"পিতৄনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতা নরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥
ধন্যা স্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্রর্থং পূজনং মুনে।
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়া শ্রাদ্ধাদিভি র্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে॥
যমুদ্দিশ্য হরেঃ পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাত্তং নয়েৎ পরমং পদং॥"

হে মুনিবর! পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিলে মানব নরক যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মুক্তি-লাভ করেন। অতএব সংসারে বিশেষতঃ কলিকালে সেই লোকই ধন্য, যাঁহারা পিতৃগণের জন্য শ্রীহরির পূজা করেন।

হে মুনে! যে ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তি পূর্ব্বক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহার বহু পিণ্ডদান বা গয়া-শ্রাদ্ধাদিতেই প্রয়োজন কি? হে মুনি শ্রেষ্ঠ! যাঁহার উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তিনি নরকাবাস হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া পরমপদে নীত হন। অতএব পিতৃগণের উদ্দেশে ভাগবৎ-পূজা করিয়া পরে ভগবৎ-নিবেদিত অন্নাদি দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিলে মহাগুণসিদ্ধি হেতু স্বতঃই মুক্ত্যাদি মহাফল উপস্থিত হইয়া থাকে।

অথবা শ্রাদ্ধাগ্রহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃগণের উদ্দেশে বিশেষ ভক্তিসহকারে

কেবল শ্রীভগবানের পূজা করিলেও স্বতঃই ফলবিশেষ সিদ্ধ হয়। যথা—

"তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা" ইত্যাদি ন্যায়ানুসারে তাহাতে পিতৃগণের পরম তৃপ্তি সিদ্ধ হয়। কেবল নিজ কৃত শ্রাদ্ধদানে তাঁহাদের পরিতৃপ্তি হয় না—ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের অপেক্ষা করে।

এ বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ; যথা, নারায়ণোপনিষদে—

"এক এব নারায়ণ আসীৎ, ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা-পৃথিব্যৌ। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিত মশ্নান্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েয়ুঃ।"

পুরাকালে কেবল এক নারায়ণই ছিলেন, ব্রহ্মা ছিলেন না, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীও ছিল না। সুরগণ, পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ সেই বিষ্ণুর ভুক্তান্ন ভোজন করেন, বিষ্ণুর আঘ্রাত দ্রব্য আঘ্রাণ করেন এবং বিষ্ণুর পীত দ্রব্য পান করেন। অতএব সুবিজ্ঞ সাধুগণ শ্রীভগবানে নিবেদিতান্নই ভোজন করিবেন।

বশিষ্ঠ-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং দানং সঙ্কল্প মেব চ।
দৈবং কর্ম্ম তথা পৈত্রং ন কুর্য্যাদ্বৈষ্ণবো গৃহী॥"

এস্থলে পৈত্র শব্দে বহির্ম্মুখ-ভাববশতঃ পিতৃতর্পণ-শ্রাদ্ধাদি-ক্রিয়া-পরত্বই বুঝিতে হইবে। এই শ্রুতিমূলক বৈষ্ণব শ্রাদ্ধের সদাচার বহু প্রাচীন কাল হইতে গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর শাখা শ্রীল হরিদাসাচার্য্যের তিরোভাব-মহোৎসব শ্রীভগবৎ-প্রসাদ দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতির অনুসরণ করা হয় নাই। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

" তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরলে।
অন্য ক্রিয়া নাই বৈষ্ণব মণ্ডলে॥
দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পণ॥

কৃষ্ণের প্রসাদি দ্রব্য দিব্য পাত্রে ভরি।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিব যত্ন করি॥
ঐছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিয়া মু শুনিলু॥
তুমি না জানহ তেঞি কিছু জানাইলু॥
এ কথা শুনিয়া কহে এই হয় হয়।
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিবে আশয়॥"

অনন্তর মহোৎসব দিনে কিরূপ ভাবে বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল, তাহা শুনুন—

"জানিয়া শ্রীপ্রভুর ভোজন অবসর।
ভোগ সরাইতে প্রেমে পূর্ণ কলেবর॥
তাম্বূল অর্পণ কৈল, আচমন দিয়া।
দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া॥
অন্য পাত্রে প্রসাদান্ন অনেক যতনে।
হরিদাসাচার্য্যে সমর্পিলেন নির্জ্জনে॥

* * *

ভক্ষ্যাবসর জানি আচমন দিলা।
প্রসাদি তাম্বূল আদি যত্নে সমর্পিলা॥"

কই, এ স্থলে কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতির বিধান মতে শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুসরণ করা হইল না তো। অনন্ত-শরণ গৃহীবৈষ্ণব এই সদাচারেরই অনুসরণ করেন।

সে যাহা হউক, শ্রাদ্ধ কাহাকে বলে?

"সংস্কৃত-ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধিঘৃতান্বিতং।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥"

ইতি পুলস্ত্যবচনাৎ "শ্রদ্ধয়া অন্নাদের্দ্দানং শ্রাদ্ধম্" ইতি বৈদিক প্রয়োগাধীন যৌগিকম্। শ্রাদ্ধতত্ত্বে।

মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য দানের নামই শ্রাদ্ধ। বৈষ্ণবগণ এই মূলবিধি অনুসরণ করিয়াই মৃতব্যক্তির বা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ নিবেদন করিয়া থাকেন। অতএব বৈষ্ণবের প্রেতত্ব না থাকায়, বৈষ্ণবগণ সাধারণ-জনগণের ন্যায় প্রেতত্ব-খণ্ডন উদ্দেশে কোন আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম করেন নাই বলিয়াই যে, বলিতে হইবে বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধ করেন না কেবল মালসাভোগ দিয়াই সারে? ইহা কি অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে? বৈষ্ণব-গণ শ্রাদ্ধের মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া বৈষ্ণবদিগের আচার-ব্যবহারের অযথা কুৎসা করা, যে নিতান্ত অসঙ্গত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব ভোজন।

শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবকে ভোজন করান অবশ্য কর্ত্তব্য। নতুবা সে শ্রাদ্ধ রাক্ষসের প্রাপ্য হয়। তাই, শ্রীমদদ্বৈত প্রভু, তাঁহার পিতৃ-শ্রাদ্ধে শ্রীব্রহ্মহরিদাসকে শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন—"তোমার ভোজনে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।" এ বিষয়ে শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়। তথা স্কান্দে—শ্রীমার্কণ্ডেয় ভগীরথ-সংবাদে—

"যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্ভ্যোহদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥"

বিদ্যাহীন বৈষ্ণবকে মূঢ় মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ-পাত্র প্রদান করিলে, বিপ্র-কৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

স্মৃতি প্রমাণেও পরিব্যক্ত হইয়াছে—

"সুরাভাণ্ডস্থ পীযূষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্ক-রহিতং শ্রাদ্ধং তথা শাতাতপোঽব্রবীৎ॥

শতাতপ বলিয়াছেন—

অমৃত সুরাভাণ্ডস্থ হইলে যেরূপ আশু অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, সেইরূপ বৈষ্ণবহীন শ্রাদ্ধও পণ্ড হইয়া থাকে।

অষ্টাদশ উল্লাস।

—:o:—

সামাজিক প্রকরণ।

শাস্ত্রে জাতি-পরিচয়ে বৈষ্ণব নামে কোন জাতি-বিশেষ উল্লিখিত না হইলেও বাঙ্গলা দেশে বৈদ্য জাতির ন্যায় (অধুনা বৈদ্য-ব্রাহ্মণ) এক শ্রেণীর দ্বিজাতি আছেন, যাঁহারা বহুকাল হইতে " বৈষ্ণব " জাতি নামে প্রসিদ্ধ এবং এই নামেই তাঁহারা জনসমাজে আত্মজাতি পরিচয় দিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। ধর্ম্মে, কর্ম্মে, সামাজিক মর্য্যাদায় ইহাঁরা ব্রাহ্মণ জাতির—সর্ব্বাংশে না হউক প্রায় তুল্য-সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের বীজী বা পূর্ব্বপুরুষ যে বৈষ্ণবী সিদ্ধি লাভে বিশেষ গৌরবান্বিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সেই পূর্ব্ব-গৌরবের ধারা কালের কুটিলাবর্ত্তে ক্রমশঃ ক্ষীণতর হইয়াও অদ্যাবধি অব্যাহত আছে। " ব্রাহ্মণ " নামটী যেরূপ পূর্ব্বে সর্ব্ববেদজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানীকে বুঝাইত কোন জাতিকে বুঝাইত না, তাহা হইতে পরে ঐ " ব্রাহ্মণ " শব্দ বিকৃত হইয়া ব্রহ্ম-জ্ঞান-নিরপেক্ষ জাতিমাত্রপর হইয়াছে, সেইরূপ " বৈষ্ণব " নামটী যদিও ধর্ম্মভাবদ্যোতক এবং প্রধানতঃ শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তকে নির্দ্দেশ করে, কিন্তু তাহা হইতে ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উহা এই বাঙ্গলা দেশে কালে বিশিষ্ট-সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ-বৈষ্ণব-বংশীয়গণের জাতিপর নাম হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী টেবেল বা তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।
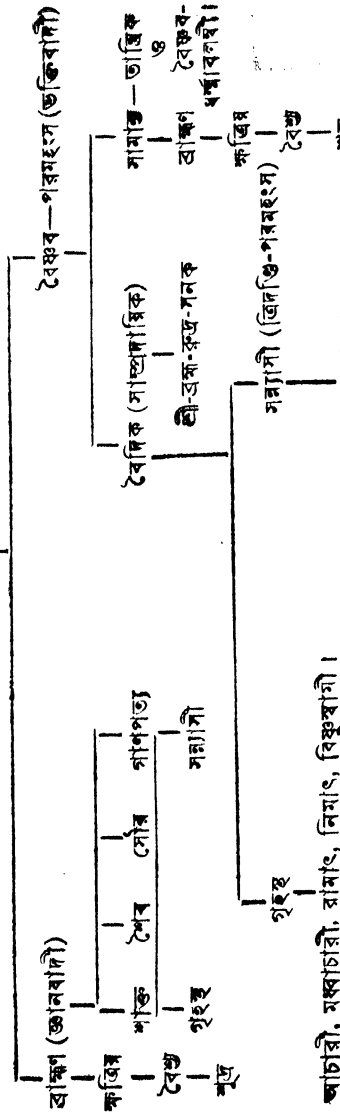
শ্রীশ্রীনারায়ণ।

- ব্রহ্মা
  - হংস (মূল একবর্ণ)
    - ব্রাহ্মণ (জ্ঞানবাদী)
      - ক্ষত্রিয় — বৈশ্য — শূদ্র
      - শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য
        - গৃহস্থ
        - সন্ন্যাসী
    - বৈষ্ণব—পরমহংস (ভক্তিবাদী)
      - বৈদিক (সাম্প্রদায়িক)
        - শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক
        - গৃহস্থ
          - আচারী, মধ্বাচারী, রামাৎ, নিমাৎ, বিষ্ণুস্বামী।
          - গৌড়াদ্য-বৈদিক
            - [জাতি বৈষ্ণব, নাগাবৈষ্ণব, জাত-বৈষ্ণব, * বৈরাগী বৈষ্ণব-(আট-সমাজী) + প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থাকে বিভক্ত]
        - সন্ন্যাসী (ত্রিদণ্ডি-পরমহংস)
          - বিরক্ত (বৈরাগী উদাসীন)
            - অভ্যাগত
              - আচারী, মধ্বাচারী, রামাৎ, নিমাত-সম্প্রদায়ী।
          - ভেকধারী (গৃহীব্রুব বা সহজিয়া)।
            - নেড়ানেড়ী, দরবেশ, সাঁই, কর্ত্তাভজা, আউল, বাউল, কবীন্দ্র, স্পষ্টদায়ক প্রভৃতি।
      - সামান্ত—তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী।
        - ব্রাহ্মণ — ক্ষত্রিয় — বৈশ্য — শূদ্র

---

* বৈরাগী বৈষ্ণব আধুনিক নহেন। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ রামানন্দের

বর্ত্তমানে সকল জাতিই পূর্ব্বের ন্যায় গুণকর্ম্মগত না হইয়া জন্মমাত্রপর হইয়া পড়িয়াছে। এখন ব্রাহ্মণের ছেলে ব্রাহ্মণ, তাঁহার ব্রাহ্মণ লক্ষণ, ব্রাহ্মণোচিত সদাচার না থাকিলেও ব্রাহ্মণ। কেন না তাঁহাদের শিরায় শিরায় সেই সিদ্ধ ঋষিবংশের রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। এখন রক্তেরই মান্য—ধর্ম্মের বা গুণের আদর নাই। আমরা বলি, বৈষ্ণবদেরও ত সেই দশা ঘটিয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন সদাচারী বৈষ্ণব, তাঁহাদের মূলে হয় হরিভক্ত ঋষিরক্ত—নয় সিদ্ধ-বীর্য্যোৎপন্ন বৈষ্ণবের পবিত্র রক্ত-ধারা আজও তাঁহাদের বংশধরগণের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল বৈষ্ণব মহাত্মাদের বীজীপুরুষ যে সিদ্ধ ভগবদ্ভক্ত ও সর্ব্বজন-বরেণ্য ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব যদি ব্রাহ্মণ-রক্তের মান্য সমাজে অব্যাহত থাকে তবে বৈষ্ণব-রক্তের সম্মান থাকিবে না কেন? বৈষ্ণবের ঔরসে তাঁহার সবর্ণজা বা অনুলোমজা বৈষ্ণবী পত্নীর গর্ভজাত সন্তানই 'বৈষ্ণব-জাতি' পদবাচ্য হন। জাতির সৃষ্টি এইরূপেই হইয়াছে। এইরূপে একই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জন্ম-বিশিষ্ট কতক-গুলি লোক সংঘবদ্ধ হইলেই একটী জাতি বা সমাজ গঠিত হইয়া থাকে। গুণ ও কর্ম্ম লইয়াই সেই জাতির নাম-করণ ও বর্ণ-নির্দ্দেশ হয়। যেমন ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কুম্ভকার, তাম্বূলী-স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, মালাকার, গোপ ইত্যাদি।

বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য ও গৌরব, শাস্ত্রে কিরূপ জ্বলন্ত অক্ষরে চিত্রিত আছে, তাহা অভিজ্ঞ সুধী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। অতএব বৈষ্ণব যে হীন-শূদ্র

(রামাৎ-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক) সময় হইতে গৌড়বঙ্গে বাস করিয়া "বৈরাগী-বৈষ্ণব" নামে অভিহিত।

† প্রধানতঃ নদীয়া, হুগলী, ২৪ পরগণা জেলার মধ্যে আটখানি গ্রামের গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি-সমাজ লইয়া এই থাক হয়। নদীয়া জেলার মধ্যে ১ বেজপাড়া, ২ সিন্দুরিনী (চাকদহ) হুগলী জেলার ৩ চাঁপদানী (বৈদ্যবাটী) ৪ বলরাম-বাটী (সিঙ্গুর) ৫ বলাগড় (সিঙ্গেরকোণ) ৬ প্রতাপপুর, (বেলে) ৭ বাদুড়িয়া, (বসিরহাট) ৮ পুকুরকোণা, (দোগাছিয়া) এই ৮টী সমাজ লইয়া আট-সমাজী।

নহেন—ব্রাহ্মণেরও বরণীয় বংশধর, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখুন। তথাপি বৈষ্ণবদিগের এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহাদিগকে সসন্তান শূদ্রত্বে পাতিত করিবার জন্য কতকগুলি ব্রহ্মবন্ধু—এমন কি গুরু-পুরোহিতরূপে বিরাজিত কতিপয় গোস্বামী প্রভুও বিশেষ উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। এই ভাবে দেব-দ্বিজ-বৈষ্ণব-হিংসা ও নিন্দা কলি-দেবের খেলা বা কাল-মাহাত্ম্য !!

বৈষ্ণবী দীক্ষা-প্রভাবে বৈষ্ণব ত্রিজন্ম লাভ করেন। কারণ, দীক্ষাতেই দ্বিজাতির জ্ঞান কাণ্ডের পরিসমাপ্তি। মনু বলিয়াছেন—

মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি-বন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞ-দীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চোদনাৎ॥"

দ্বিজাতির প্রথম জন্ম মাতৃগর্ভে, পরে শ্রুতি বিধানানুসারে মৌঞ্জীবন্ধন চিহ্নাত্মক উপনয়ন সংস্কারে দ্বিতীয় জন্ম। অতঃপর যজ্ঞদীক্ষায় অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোমাদি-যজ্ঞ, বা যজ্ঞ শব্দ বিষ্ণুকে বুঝায়, অতএব বিষ্ণু-দীক্ষায় তৃতীয় জন্ম লাভ হয় এবং শ্রুতিজ্ঞানের পরিসমাপ্তি হয়। অতএব 'বৈষ্ণব' এই নামে বৈষ্ণবের শূদ্রত্বাদি খণ্ডিত হইয়া তুরীয় বর্ণত্ব অভিব্যঞ্জিত হইয়া পড়ে। সুতরাং শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবের বিপ্রবর্ণত্ব অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে বৈষ্ণব জাতির মধ্যে নানা বর্ণের মিশ্রণ দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলেন—"বৈষ্ণব বর্ণসঙ্কর এবং উঁহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানেন না।" সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণের তারতম্য অনুসারে মানবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চরিটী বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। এই বর্ণ-বিভাগের পর হইতেই ভারতের সনাতন ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। তারপর এই চারিটীবর্ণ অনুলোম-প্রতিলোম ভাবে মিলিত হওয়ায় বর্ণান্তর্গত নানা জাতির সৃষ্টি হয়। এই সকল জাতির অধিকাংশই দ্বিবর্ণ-সম্ভূত অর্থাৎ আধুনিক কালের ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণই মিশ্রবর্ণ। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাঁদের গোত্র প্রবরাদি আলোচনা করিলেই এই বাক্যের সত্যতা সহজে উপলব্ধ হইবে। তন্মধ্যে কতকগুলি অনুলোমজ আর কতকগুলি প্রতিলোমজ এইমাত্র

প্রভেদ। অনুলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পুরুষ নিম্নবর্ণের স্ত্রী-সংযোগে পিতৃ-সবর্ণ হয় এবং প্রতিলোমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণা স্ত্রী ও নিম্নবর্ণের পুরুষ-সংযোগে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে। নারদ-সংহিতা বলেন—

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥"

শাস্ত্র আরও বলেন—

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ।

অর্থাৎ মাতা যে জাতীয়া হউক না কেন, মাতা ভস্ত্রার (মসকের) স্বরূপ, কেবল গর্ভে ধারণ করেন মাত্র। সুতরাং পুত্র মাতার পুত্র হইবে না পিতারই পুত্র—এবং পিতারই বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্ রামচন্দ্রের কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব মিত্রাবরুণের ঔরসে স্বর্গ-বেশ্যা উর্ব্বশীর গর্ভজাত হইয়াও ব্রাহ্মণ। মহর্ষি বেদব্যাস অনূঢ়া কন্যার গর্ভে বৈধজাত না হইয়াও ব্রাহ্মণ, মহর্ষি শক্তির ঔরসে শ্বপাক-কন্যার গর্ভে জন্মিয়াও পরাশর উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

আবার এ কালেও বঙ্গদেশের বহু ব্রাহ্মণ সে দিন পর্য্যন্ত 'ভরার মেয়ে' (নৌকা করিয়া আনীতা ইতর জাতীয়া কন্যা) বিবাহ করিতেন। ভরার মেয়েরা কাহার কন্যা কোন্ জাতীয়া তাহা কেহ জানিতেন না। একজন খুড়া বা মামা সাজিয়া সেই কন্যাদিগকে ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ দিতেন। সেই বিবাহজাত সন্তানেরা পিতারই জাতি ও উপাধি লাভে অধিকারী হইতেন। এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।"

অতএব আমাদের আলোচ্য সদাচার-সম্পন্ন বৈদিক-গৃহী-বৈষ্ণগণের অধিকাংশ বীজ পুরুষ দ্বিজাতি কুলোদ্ভূত বলিয়া তাঁহাদের বংশধরগণ বর্ণসঙ্কর না হইয়া বিপ্রবর্ণের অন্তর্গত হওয়াই বিচার-সঙ্গত ও শাস্ত্র-সম্মত। আবার বৈষ্ণবী দীক্ষা প্রভাবে "বৈষ্ণব" আখ্যা হইলেই তাঁহার যখন বিপ্রসাম্য সিদ্ধ হয়, তখন তাঁহার বংশধরগণ কদাচ বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না। "ব্যভিচারেণ জায়ন্তে বর্ণ-

সঙ্করাঃ। আচার-ভ্রষ্টতা বা স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ-সম্মিলনের বা প্রতিলোম-সংসর্গ ফলে যাহার জন্ম তাহাকেই বর্ণসঙ্কর কহে। বর্ণসঙ্করগণ শূদ্রধর্ম্মী। যথা—

"শৌচাশৌচং প্রকুর্ব্বীরন্ শূদ্রবৎ বর্ণ-সঙ্করাঃ।"

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈদিক-গৃহী-বৈষ্ণবগণের মধ্যে স্বধর্ম্মত্যাগ, অগম্যাগমন, প্রতিলোম-সংসর্গ না থাকায় ইহাঁরা বর্ণসঙ্কর বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। অবশ্য মিশ্রণ-দোষ যে নাই বা থাকিতে পারে না, এ কথা বলিতেছি না, এ দোষ অল্প-বিস্তর সকল সমাজেই দৃষ্ট হয়? জাতি-গঠনের সময়ে মিশ্রণ-দোষের স্বীকার অবশ্য করিতে হয়। তবে এখন সে দোষ না থাকিতে পারে। সমাজ-বন্ধনের পর হইতেই সে অবাধ-মিশ্রণের গতিরোধ হইয়া গিয়াছে—তারপর বহু শতাব্দি গত হইয়া গিয়াছে বলিয়া সে সকল দোষ এখন বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে।

তবে এই আলোচ্য সমাজ একবারে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ—সমাজগত বা জাতিগত কোন দোষই নাই, এ কথা বলিলে বাস্তবিকই সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু এরূপ দোষের হাত হইতে বরেণ্য ব্রাহ্মণ সমাজও মুক্ত হইতে পারেন নাই। যাঁহারা কুলীন-সমাজের কুলগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন—কত 'কু' সমাজে 'লীন' হইয়া কুলীন নামের সার্থকতা করিয়াছে। কুলীন সমাজে যে মেল বন্ধন—উহা "দোষান্ মেলয়তি ইতি মেলঃ।" এইরূপ নানা দোষের মিলনে কুলাচার্য্য দেবীবর ৩৬টী মেল বা শ্রেণী বিভক্ত করেন। এই সকল মেলের কুলগত পঞ্চবিংশতি দোষ। যথা—

"কন্যা পুংসো রভাবেন রণ্ডিকাগমনাদপি।
জীবতঃ পিণ্ডদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এব চ॥
ত্যাজ্যপুত্র ভবেদ্দোষ যথা কন্যা-বহির্গমাৎ।
অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকার স্তথৈব চ॥

পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধ কুষ্ঠরোগকঃ।
খঞ্জেনাপি বিপর্য্যায় নীচোদ্বাহে চ নাস্তিকে॥
অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা।
দুষ্ট-কন্যাঙ্গহীনা চ কানা কুব্জা চ বাগ্‌জড়া॥
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ কুলহীনকরা স্মৃতাঃ॥ (মেলবিধি)

অর্থাৎ পুত্র কন্যার অভাব, রণ্ডিকাগমন, জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদান, পিতৃপক্ষ ৫ পুরুষের মধ্যে বিবাহ (স্বজনাক্ষেপ), ত্যাজ্যপুত্র, কন্যাবহির্গমন, অগ্নিদগ্ধা (পিতা-মাতা-ভ্রাতৃশূন্যা কন্যা) বিবাহ, বলাৎকার, পোষ্যপুত্র, (স্বগোত্র পরগোত্র বা পোষ্যপুত্রঃ কুলং দহেৎ), ব্রহ্মহত্যা, জন্মান্ধ, কুষ্ঠী, খঞ্জ, বিপর্য্যায়, নীচ কুলে বিবাহ, নাস্তিক, অন্যপূর্ব্বা—বাগ্‌ দানাদির পর যদি বরের মৃত্যু হয়, কি যে কন্যাকে লইতে অস্বীকার করে তাহাকে অন্যপূর্ব্বা কহে; অন্যপূর্ব্বা ৭ প্রকার। যথা—(১) বাক্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃত-কৌতুক-মঙ্গলা, (৪) উদক-স্পর্শিতা (৫) পাণি-গৃহীতিকা, (৬) অগ্নিপরিগতা (যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পুনর্ভূ-প্রসবা। বয়োজ্যেষ্ঠা, মাতৃনামা, সগোত্রা, দুষ্ট কন্যা, অঙ্গহীনা, কাণা, কুব্জা, বাগ্‌জড়া, কন্যার পাণিগ্রহণ কুলগত দোষ।

তারপর জাতিগত দোষ, যথা—

"কোচ, পোদ আর হেড়া, হালান্ত, রজক।
কলু, হাড়ী, বেড়ুয়া, শুঁড়ী, যবন, অন্ত্যজ॥"

অতএব বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা জাতির সম্মিলন দৃষ্টে যাঁহারা নাসিকা-কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা এখন ভালরূপেই বুঝিবেন, এই মিশ্রণ-দোষে কেবল বৈষ্ণব-সমাজ দূষিত নহে, বৈষ্ণব সমাজের ন্যায় সর্ব্বোচ্চবর্ণ-সমাজেও কত দোষ—কত আবর্জ্জনা পর্য্যুষিত দেব-নির্ম্মাল্যের ন্যায় পবিত্র হইয়াই রহিয়া গিয়াছে। তবে কোন সমাজে বেশী দোষ, কোন সমাজে কম, ইহাই প্রভেদ মাত্র। নিতান্ত অপ্রীতিকর হইলেও অনিচ্ছাসত্ত্বে প্রসঙ্গতঃ নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ

" বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণ কাণ্ড" ও " ব্রাহ্মণ ইতিহাস " নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল। সমদর্শী ব্রাহ্মণ-সমাজ ক্ষমা করিবেন।

(১)

যোগেশের উপজায়া, প্রসবিল যোগ, মায়া,
দৈবকীনন্দন উধোর পত্নী।
দেবীবর মতে কাজ, ত্বক্রিয়ায় নাহি লাজ,
কুণ্ড গোলকে পণ্ডিতরত্নী॥" মেল-চন্দ্রিকা।

কুণ্ড ও গোলক দোষ কাহাকে বলে? তদ্ যথা—

" পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ॥" মনু ৩অঃ।

কুণ্ড ও গোলক এই দুই পুত্রই পরনারীতে উৎপন্ন। পতি জীবিত সত্ত্বে জারোৎপন্ন পুত্র কুণ্ড এবং বিধবাতে জারোৎপন্ন পুত্র গোলক।

(২)

" বুঢ়ণ বসতি নরসিংহ মজুমদার।
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার॥
তাহার রমণী ছিল পরমা সুন্দরী।
তাহাতে * * * * হাড়ী॥
তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়া।
অনন্ত সুত ষষ্ঠীদাস তারে করে বিয়া॥"

(৩)

বাণসুত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হরে।
সেই কন্যা সাঙ্গা দিয়া কুড়িয়া পুড়িয়া মরে॥

(৪)

বশিষ্ঠ নন্দিনী সর্ব্বানন্দের বনিতা।
সতী-মা হইয়া ভোজন করান যে দুহিতা।

অজ্ঞাত ধরণী প্রাণ ধরাইতে নারে।
উদর-অসুস্থা কন্যা পরে বিভা করে॥ (সর্ব্বানন্দী মেল)

(৫)

সুখনালী জাফরখানী, দিণ্ডিদোষ তাতে গণি,
যায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহ চট্টের নারী, কোথা গেল কারে ধরি,
শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ॥

(৬)

* * * * *

কেশবের কি কহিব কথা, জগো ঘোষালীর নিয়া সুতা,
দোলমঞ্চে করিল নিছনি।
* * * শেষে দেবী চট্টের গৃহিণী॥

(৭)

" নাথাই চট্টের কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিভা করে বন্দ্য গঙ্গাধরে॥" (ফুলিয়া মেল)

(৮)

শিবের কুচনী সতী, কৃষ্ণের গোপ-যুবতী,
সেই মত হইল হিরণ্যে।
বেণেনীর গর্ভজাত, সন্তান হইল সাত,
পুত্র এক তাহে ছয় কন্যে॥"

(৯)

বাঙ্গাল হিরণ্য ঘৃণ্য নারায়ণ সুত।
কাঁটাদিয়া হিরণ্য নিন্দ্য দাসুবংশভুত॥
দুয়ে বন্ধু ধোপা-হাড়ী-বেণে পরিবাদে।
সঙ্গে বীর ভুঞে বসন্ত-পত্নী খাঁ জুনিদে॥"

(১০)

" কলুব্যদ পরমাদ সদাশিব সঙ্গ।
বলভদ্র চট্টকুল বিজয়ের রঙ্গ॥" বিজয় পণ্ডিতী মেল।

(১১)

" আচার্য্য শেখরে দো প্রধান যবন।
এ কুলে দেখি কুলীন নাহি একজন॥" আচার্য্য শেখরী মেল।

(১২)

" অকথ্য বলাৎকারাদি দোষে মরি মরি।
বিদ্যাধরীকে (বিদ্যাধর চট্টের পত্নী) সবাই করে ধরাধরি॥"
বিদ্যাধরী মেল।

(১৩)

" হরি মজুমদারের কথা বড়ই অদ্ভুত।
দোপোড়া বর্ণসঙ্কর হরির জগতে বিদিত॥
পিতার ছিল হাড়ী নিজে বিবাহ পোড়ারী।
এই দোষে হৈল মেল হরিমজুমদারী॥" হরিমজুমদারী।

(১৪)

" সৌদামিনী ছয়ী কন্যা জানহ নিশ্চয়।
কংস হাড়ী বাদে অর্ক দোপাড়া মেয়ে লয়॥"

ইত্যাদি বহু অকথ্য দোষ কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজে থাকিলেও উহাঁরা যেমন বরেণ্য ও সমাদৃত, সেইরূপ অন্য কোন সমাজই নহেন। অতএব আলোচ্য বৈষ্ণব-সমাজ একবারে নির্দ্দোষ না হইলেও যে উচ্চ সমাদর লাভের অযোগ্য নহে, তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছে।

সে যাহা হউক গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজই যে গৌড়বঙ্গের আদি বৈষ্ণব সমাজ তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন

দেশ হইতে এই বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। শুধু বৈষ্ণব কেন? বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নবশাখাদি যে সকল বিশিষ্ট জাতি আছেন, উহাঁদের অধিকাংশ পূর্ব্বপুরুষ ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছেন। বহু পূর্ব্বে বঙ্গদেশ একরূপ অনার্য্যভূমি ছিল। তখন আর্য্যদেশ হইতে গৌড়বঙ্গে কেহ আসিলে তাঁহার জাতীয়-পবিত্রতা নষ্ট হইয়া যাইত। সুতরাং বিশেষ দায়ে বা লোভে পড়িয়াই অনেক জাতি এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমিতে আসিয়া অধিবাসী হইয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও অনেক মহাত্মার আদি পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁরা চারিটী মূল সম্প্রদায় এবং তাহার শাখা-প্রশাখারই অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা অধিকাংশ সাধনসিদ্ধ-সদাচার-নিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং শৌচ-সদাচারে তাঁহারা সর্ব্ববর্ণেরই বরণীয় ছিলেন। তাঁহাদের ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহাদের চরণে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মস্তক লুটাইয়া ছিলেন, ইহা অতিরঞ্জিত নয়, ধ্রুব সত্য।

দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রহ্মসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণই প্রধানতঃ গৌড়বঙ্গে—বিশেষতঃ পশ্চিমাঞ্চলে মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, নদীয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, প্রভৃতি জেলায় ও পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় আসিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহাঁদের উপদেশে ও সদাচারে আকৃষ্ট হইয়া বহু ব্যক্তি তাঁহাদের মতাবলম্বী হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশেষত: শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর সময় এদেশ একরূপ বৈষ্ণব-প্রধান হইয়া উঠিয়াছিল। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্তগণের মধ্যেও চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীমুরারি গুপ্ত—শ্রী-সম্প্রদায়ী ছিলেন। শ্রীগদাধর—ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী এবং শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী—নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ী ছিলেন।

অতএব বঙ্গীয় বৈষ্ণবজাতি-সমাজের উৎপত্তি ৪০০ বৎসর অর্থাৎ শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক বা তাঁহার পরবর্ত্তী কাল হইতে নহে। এই গৌড়বঙ্গে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আলোচ্য বৈষ্ণব জাতির অধিকাংশ আদিপুরুষের

আগমন এদেশে ঘটিয়াছে। তবে এই গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবদিগের সহিত শ্রীমহাপ্রভুর সম-সাময়িক ও তৎপরবর্ত্তী কালোৎপন্ন বৈষ্ণব জাতির সহিত যে মিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ইহাঁরা ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীতী ও ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কার ও সদাচার-সম্পন্ন গৃহস্থ। গৌড়বঙ্গে বাস হেতু এখন সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব নামে আখ্যাত। এই গোড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণবগণের বংশধারা ও শাখা-প্রশাখা বঙ্গের বহুস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয় বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এই প্রাচীন বৈষ্ণব সমাজের কুলজী গ্রন্থও সংগৃহীত হইতে পারে। প্রাচীনগণের প্রমুখাৎ যে দুইটী কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নিম্নে বিন্যস্ত করিলাম। ইহাতে বুঝা যায়, অন্যান্য জাতি-সমাজের কুলপঞ্জীর ন্যায় বৈষ্ণব-জাতিরও বহু কুলঞ্জী রচিত হইয়াছিল এবং অধিকাংশ স্থলে শাক্ত-সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই তাহা রচিত হইয়া থাকিবে। নিম্নোদ্ধৃত দুইটী বচনের আভাসেই তাহা পরিস্ফুট। যথা—

(১)

" ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রাহ্মণ চারিবর্ণেতে গণি।
বৈষ্ণবের জাতি লৈয়া শুধু টানাটানি ॥
জাতি সমাজের সৃষ্টি-মূলে সব কার্য্যই চলে।
কুলের মাথা খেয়ে কুলীন হ'ল ছত্রিশ মেলে ॥
মদ্য মাংস অনাচার অগম্যা গমন।
তন্ত্রের নামে ব্যভিচার তবু বলায় ব্রাহ্মণ ॥
ধর্ম্মের পথে চল্‌তে গিয়ে পিছ্‌লে পড়ে মরে।
সমাজ তারে আহা ব'লে মাথায় তুলে ধরে ॥
কুণ্ড গোলক কংস হাড়ী সবই গেল চলে।
বৈষ্ণবের বেলায় জাত নাই মুলো পঞ্চা বলে ॥
নেড়া নেড়ী সবাই বুঝি ? এমনি মতিভ্রম।
বৈষ্ণবেরো উচু নীচু আছে ভেদ-ক্রম ॥

বিষ্ণু ভক্ত সন্ন্যাসী গিরি, পুরী, ভারতী।
নিমাত রামাত আন্ত মাধ্ব আর বৌদ্ধমতী॥
বিদেশ থেকে এসে যারা গৌড়ে কৈল বাস।
দ্বিজাতির অগ্রগণ্য নয়ত শূদ্র-দাস।
"গৌড়াস্ত-বৈষ্ণব" তারা বৈদিক আচারে।
চারি বর্ণের গুরু ব'লে সবাই পূজা করে॥
জুগী-সংযোগী বান্তাশী নয় তারা ভক্তশূর।
জাতি-ভ্রষ্ট নয় সে, সব বর্ণের ঠাকুর।
"ঠুটোর" ঠেলায় মুলো ভাগে।
বৈষ্ণব নিন্দে সেই রাগে॥
অপরাধের নাই ত ভয়।
মুখে যা আসে তাই কয়॥*

(২)

" সমাজপতি সমঝ্‌দার, এক বল্‌তে কয় আর,
বৈষ্ণবের কি সবাই নেড়া নেড়ী ?
গাঁই গোত্র সকল ত্যজে, ভেক নিয়ে ভণ্ড সেজে,
বৈষ্ণবীর জন্য করে তাড়াতাড়ি ?
শুনে কথা হাসি পায়, চোখের মাথা মুলো খায় ;
ভণ্ডামীতে ভরা যোলআনা।
নিজের দিকটা দেখে উঁচু, বৈষ্ণবেরে দেখে নীচু,
শাস্ত্রে দেখেনা কার গুণপনা॥
তেজস্বী দুর্ব্বাসা ঋষি, হইয়া বৈষ্ণব-দ্বেষী,
ত্রিভুবনে নাহি পাইল ত্রাণ।

[*এই কবিতাটী মেদিনীপুর জেলায় পলসপাই ৺ঠাকুরবাড়ীর অধ্যাপক পণ্ডিত সনাতন দাস মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত।]

বৈষ্ণবের ক্ষমা গুণে, শান্ত কৈল সুদর্শনে,
ধর্ম্মব্যাধের দেখ কত মান ॥
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণে কয় চণ্ডালেরো তুল্য নয়,
চণ্ডাল সে হরিভক্ত বড় ।
সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব যাঁরা, দেখ তাদের কুলের ধারা,
আচার ব্যাভারে কত দড় ॥
গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা, শ্রীরঙ্গপত্তন,
শ্রী-ব্রহ্ম বৈষ্ণব সব আসি ।
কেহ দারা সুত লয়ে, কেহ ব্রহ্মচারী হয়ে,
বিভা করি হৈল গৌড়বাসী ॥
দোবে পাণ্ডা মিশ্রাচার্য্য, বৈষ্ণব কুলে করি কার্য্য,
বৈষ্ণব জেতে হ'ল স্বতন্তর ।
শ্রীচৈতন্যের শুদ্ধ মতে, অনুগত হৈল তা'তে
চৈতন্যের ভক্ত-পরিকর ॥
বল্লালী-শাসন না মানে, রঘুর বাঁধন ফেলে টেনে,
শুদ্ধ-শাস্ত্র বৈষ্ণবের প্রমাণ ।
হেসে বলে জগো গোঁসাই, লৌকিকেতে জেতের বড়াই,
ধর্ম্মের কাছে সবাই দেখ সমান ॥*

উল্লিখিত কবিতা দ্বয়ের ভণিতা পৃথক্ দৃষ্ট হইলেও, কবিতাদ্বয়ের রচয়িতা একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। যেহেতু, "জগো গোঁসাই"র পরিশুদ্ধ নাম "জগন্নাথ গোস্বামীই" প্রশস্ত। আবার শ্রীজগন্নাথ দেব অসম্পূর্ণ-হস্ত বলিয়া লোকে স্নেহে "ঠুটো জগন্নাথ" বলে। সুতরাং উক্ত "ঠুটো" ভনিতায় জগন্নাথ গোস্বামীকেই

*[এই কবিতাটী বাঁকুড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামানন্দ ভাগবতভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।]

বুঝাইতেছে। এই জগন্নাথ গোস্বামী যে প্রসিদ্ধ সমাজপতি মুলো পঞ্চাননের প্রতিদ্বন্দ্বী ও তৎসমসাময়িক ছিলেন তাহা উক্ত কবিতাদ্বয়ের বর্ণনায় স্পষ্ট অনুমিত হয়।

এই জগন্নাথ গোস্বামীর পরিচয় আজ পর্য্যন্ত জানিবার সুযোগ ঘটে নাই। পাঠকবর্গের মধ্যে কাহারও জানা থাকিলে এ দীন গ্রন্থকারকে জানাইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হইবে। অথবা এইরূপ ধরণের বৈষ্ণবের কুল-পরিচয় কুলঞ্জী গ্রন্থ বা কবিতা কাহারও নিকট থাকিলে অবশ্য পাঠাইয়া সমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন।

বৈষ্ণব জাতির মধ্যে শিক্ষিতের অভাব বশতঃই, এত অধঃপতন। তাই যেন, তাঁহারা প্রাণহীনের ন্যায় নীরব নিস্পন্দ ভাবে অবস্থান করিতেছেন। সমগ্র বাঙ্গলা দেশে গৌড়ীয় বৈদিক-বৈষ্ণব, কি নেড়ানেড়ী, আউল, বাউলাদি সর্ব্ব শ্রেণীর বৈষ্ণবের সংখ্যা ৩৭৭৬৯২ জন। ইহার মধ্যে আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্ণব, ২ লক্ষের বেশী হইবে বোধ হয় না। উক্ত তিন লক্ষ বৈষ্ণবের মধ্যে শিক্ষিত অর্থাৎ যাঁহারা লেখাপড়া জানেন তাঁহাদের সংখ্যা কেবল ৪৯ হাজার মাত্র। তন্মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত মাত্র ৪০৪৯ জন। সম্প্রতি এই সুপ্ত বৈষ্ণব জাতির প্রাণের মধ্যে একটা বেশ স্পন্দন বা সাড়া পড়িয়াছে। ইহা সমাজের শুভ লক্ষণ, সন্দেহ নাই। এই উদ্যম-আন্দোলন জাগাইয়া রাখিতে পারিলে বৈষ্ণবজাতি, শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট তাহার গৌরব-শিখরে অবশ্য পঁহুছিবে।

বাঙ্গলার নাগা-মহান্ত বৈষ্ণবগণ পশ্চিমোত্তর প্রদেশে নাগা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ী ছিলেন। হরিদ্বারাদি কুম্ভমেলার সময় সহস্র সহস্র নাগা সাধু এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ সন্ন্যাসী হইতেই "নাগা" নামকরণ হইয়াছে। শৈব-সন্ন্যাসী ও মুণ্ডীদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া উহাঁরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দির মধ্যভাগে স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া কেহ বা সন্ন্যাসীবেশে যাযাবর রূপে (ভ্রমণকারিদের রূপে) বঙ্গদেশে স্থায়ী বাস করিয়া বাঙ্গালী হইয়া পড়িয়াছেন।

ইহাঁরা বাঙ্গলার শ্রী-ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের সহিত আদান-প্রদান করিয়া ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়া গৌড়াদ্য বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

আবার আমাদের আলোচ্য বৈদিক গৃহী বৈষ্ণবদিগের অনেকেই 'রামাৎ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। কেহ কেহ কিয়দংশে রামাতের ভজন-প্রণালীর ভাণও করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা "রামাৎ গৃহী" নহেন। বাঙ্গলায় খাঁটী রামাৎ গৃহী আদৌ নাই। কারণ, তাঁহারা আদান-প্রদান প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপে, গুরুত্ব-স্বীকারে এবং কুটুম্বিতায় মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৯০১ সালের জনসংখ্যা-বিবরণীতে (Vide Census Report of India Vol. VIA, Bengal Part II, Page 196 column 75) এইরূপ বাঙ্গলার বহু সংখ্যক বৈদিক-গৃহী বৈষ্ণব, জাতি-পরিচয় স্থলে "রামাৎ বৈষ্ণব" লেখাইয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের মতানুবর্ত্তী বিশুদ্ধাচারী গৌড়ীয় গৃহী বৈষ্ণব। সুতরাং এক্ষণে তাঁহাদের "রামাৎ" বলিয়া পরিচয় প্রদানে বিশেষ কোন গৌরব বা লাভ আছে বলিয়া বোধ হয় না। শাস্ত্রে সম্প্রদায়-ভেদে বৈষ্ণব-মহিমার তারতম্য ঘোষিত হয় নাই। যে-সে কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যিনিই প্রকৃত 'বৈষ্ণব' আখ্যা লাভ করেন—শাস্ত্রোক্ত বৈষ্ণব-সদাচারে পবিত্র জীবন লাভ করেন, শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্"—তিনি আমার ন্যায় পূজনীয়। তাহাতে তিনি শ্রীরামভক্তই হউন অথবা শ্রীকৃষ্ণভক্তই হউন। অতএব বঙ্গের সদাচারী গৃহী বৈষ্ণব-জাতি মাত্রেই জাতি পরিচয়ে "বৈদিক-বৈষ্ণব" বলাই অধিক সঙ্গত ও শাস্ত্রসিদ্ধ। কারণ, ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িক ভাব প্রকাশ পায় না, অথচ স্বীয় জাতীয়-গৌরবও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং আউল, বাউল, নেড়া দরবেশাদি উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদের হইতেও একটা সমুজ্জ্বল পার্থক্য সূচিত হয়।

আবার বঙ্গদেশে পৃথক নিমাৎ সম্প্রদায়ও নাই। নিমাতের সংখ্যা দাক্ষিণাত্যে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা আচারে ব্যবহারে এক্ষণে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরই অন্তর্ভুক্ত।

অতএব আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব সমাজ এরূপ বিভিন্ন শ্রেণীতে বা থাকে বিভক্ত হইয়া পড়িবার কারণ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই—স্বদেশ, স্বজাতি-বর্গকে পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন দেশে বাস, কৌলিক মত ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নমত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার ও বৈবাহিক আদান-প্রদানই এরূপ পৃথক্ শ্রেণী হইবার কারণ।

বাঙ্গলার অধিকাংশ গৃহী বৈষ্ণব যে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অনেকেই দ্বিজাতিবর্ণ, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কতিপয় দিগ্‌দর্শন করা যাইতেছে। অন্বেষণ করিলে বাঙ্গলার প্রত্যেক জেলায় এইরূপ শত সহস্র গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবের পরিচয় সংগৃহীত হইতে পারে। মেদিনীপুর জেলায় এই সকল বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মহাত্মা (Risley) রিজলি সাহেবও অন্যান্য উপশ্রেণীর বৈষ্ণব হইতে এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের পার্থক্য সূচিত করিয়া লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—In the District of Midnapore, the organization of the Baishtam caste seems to differ in some points from that described above. Two endogamous classes are very recognized (1) Jati-Baishnab consisting of those whose conversion to Baishnavism dates back beyond living memory and (২) Ordinary Baishnabs called also "Bhekdhari" who are supposed to have adopted Vaishnavism at a recent date." অতএব আশা করি, এইরূপ সিদ্ধবংশীয় প্রসিদ্ধ শ্রীপাটের প্রাচীন সদাচারী গৃহস্থ বৈষ্ণব মাত্রেই স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন। সে সকল বিবরণ পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইবে। অথবা এই গ্রন্থের পরিশিষ্ট আকারেও মুদ্রিত হইতে পারিবে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে সংক্ষেপে কয়েকটী বৈষ্ণব বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

শ্রীযুক্ত গোষ্ঠ বিহারী অধিকারী।

সাং ভীমপুর—তারকেশ্বর—হুগলী।

খৃষ্টীয় ১৬৩৬ (কেহ কেহ সন ১০৪১ সাল বলেন) রাজা বিষ্ণুদাস রামনগরে রাজত্ব করেন। ক্রফোর্ড সাহেব হুগলী জেলার ইতিহাসে লিখিয়াছেন, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথমার্দ্ধে অযোধ্যা প্রদেশে কালিঙ্গড় স্থানে বিষ্ণুদাস নামে এক বিষ্ণুভক্ত ক্ষত্রিয় রাজা বাস করিতেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া জেলা হুগলী হরিপালের নিকটবর্ত্তী রামনগর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার সঙ্গে তদনুগত তদ্দেশবাসী বহু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য আসিয়াছিলেন। ইঁহারা দুই ভাই। কনিষ্ঠ ভারামল্ল, জ্যেষ্ঠ বিষ্ণুদাস। রাজা বিষ্ণুদাস শ্রীশালগ্রাম গলায় বাঁধিয়া নবাবের কাছে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৫০০ শত বিঘা জমি জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিষয় সম্পত্তির ভার ভারামল্লের হস্তেই ন্যস্ত থাকে, রাজা বিষ্ণুদাস সর্ব্বদা শ্রীভগবানের নাম চর্চ্চায় নিমগ্ন থাকিতেন। লছমীনারায়ণ নামে উক্ত বিষ্ণুদাসের একজন গুরুভ্রাতা ছিলেন। উহাঁরা রুদ্র-সম্প্রদায়ী ত্রিকুটাচার্য্য স্বামীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। উক্ত লছমীনারায়ণ সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন, তিনি খড়ম পায়ে দিয়া প্রবল দামোদর নদ পার হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লছমীনারায়ণ ভরদ্বাজ গোত্রীয় সরোরিয়া ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। লছমীনারায়ণের পুত্র রঘুনাথ ধনেখালি থানার অধীন আলা গ্রামে বাস করেন। পরে ঐ স্থানে কয়েক পুরুষ গত হইলে রাইচরণ প্রভৃতি সপ্তভ্রাতা ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে রাইচরণের পুত্র মাধব তদানীন্তন তারকেশ্বরের মোহন্ত রঘুনাথ গিরির অনুগ্রহে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী ভীমপুর গ্রামে বাস করেন এবং শ্রীশ্রীতারকনাথদেবের নাটমন্দিরে কীর্ত্তন গানে নিয়োজিত হন। পরে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র গিরির আমলে নানা বিশৃঙ্খলতা বশতঃ উক্ত কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বংশ-তালিকা—
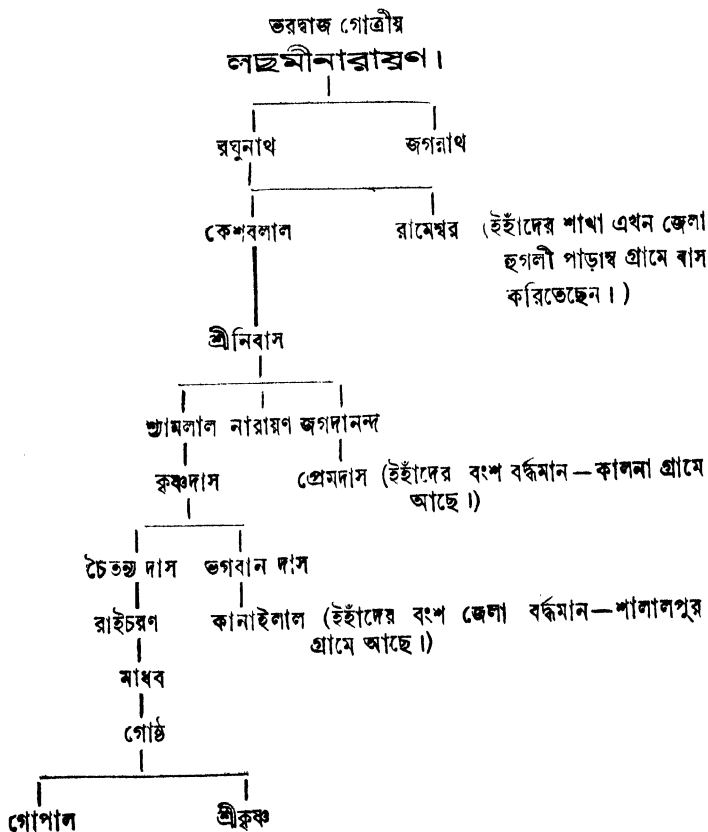
শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ দাস।

সাং—কুমরুল—হুগলী।

বহু প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। ইহাঁরা মূলে রামাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সহিত আদান-প্রদানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজ ভুক্ত হন।

ভক্তি-রাজ্যে শ্রীশ্যামানন্দ-সম্প্রদায়ের প্রবল প্রভাব দর্শনে উহাঁর পূর্ব্বপুরুষ শ্রীজগদানন্দ ঠাকুর জনৈক শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্যানুশিষ্য বৈষ্ণব সাধুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত জগদানন্দ ঠাকুর হইতে বংশ-তালিকা—
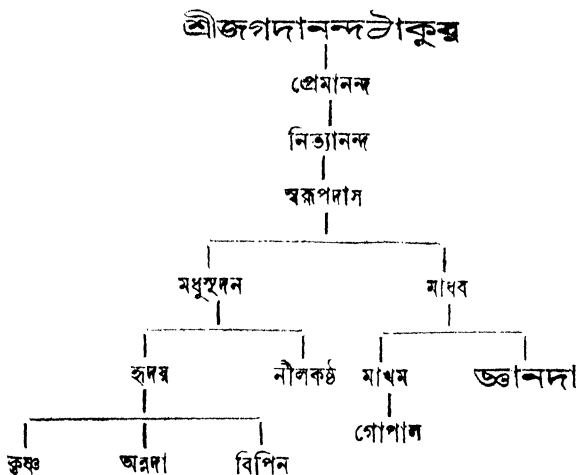
শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী।

সাং শিয়ালী—জেলা বর্দ্ধমান।

১৬২৭ খৃঃঅব্দে তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী রামনগরে রাজা বিষ্ণুদাস রাজত্ব করেন। ইনি শ্রী–সম্প্রদায়ী পরম বৈষ্ণব ছিলেন, সর্ব্বদা শ্রীশালগ্রামশিলা গলায় বাঁধিয়া রাখিতেন। তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মথুরাধামে গমন করিলে "গোপীলাল মিশ্র" নামক এক অসহায় মাথুর ব্রাহ্মণ বালক তাঁহার আশ্রিত হইয়া রামনগরে আগমন করেন। বৈষ্ণব রাজার সঙ্গ-গুণে গোপীলালের হৃদয়ে বৈষ্ণবত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। রাজার মৃত্যুর পর গোপীলাল নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন। বঙ্গীয়

ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্যের কঠিন বন্ধন বশতঃ গোপীলালের প্রবেশ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। তখন পদব্রজে দেশে প্রত্যাগমনও দুঃসাধ্য। সুতরাং বাধ্য হইয়া বৈষ্ণবতার প্রবল আকর্ষণে তিনি জেলা হুগলী—খনিয়াখালি থানার অধীন দেবীপুর গ্রামে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব গদাধর মহান্তের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। এই গোপীলাল মিশ্র ঠাকুর হইতে উক্ত বিজয় কৃষ্ণ অধিকারী অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। বিজয়ের পিতা অক্ষয় চন্দ্র শশুরের বর্দ্ধমানের রাজ-প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া উক্ত শিয়ালী গ্রামে শশুরালয়ে বাস করেন। বংশ-তালিকা ৩৩৯ এর পাতায় দেওয়া গেল।

বার্হস্পত্য গোত্রীয়
গোপীলাল মিশ্র-ঠাকুর।
কেশবলাল
জনার্দ্দন
জগন্নাথ (ইঁহার বংশধরগণ গঙ্গারাম-পুরে বাস করিতেছেন।)
ঘনশ্যাম
বৃন্দাবন
নারায়ণ
রাধাবল্লভ
রামকৃষ্ণ
বৈষ্ণবদাস
খেলারাম
পরমানন্দ (পেলারাম)
নিধিরাম
যদুনাথ, চিন্তামণি, রাসবিহারী, সীতারাম, অদ্বৈত, পূর্ণ, উদয়।
দীননাথ, হরিদাস, অধর, অক্ষয়, নিবারণ।
গোবর্দ্ধন
বিজয়
ধনকৃষ্ণ
অমলমোহন।
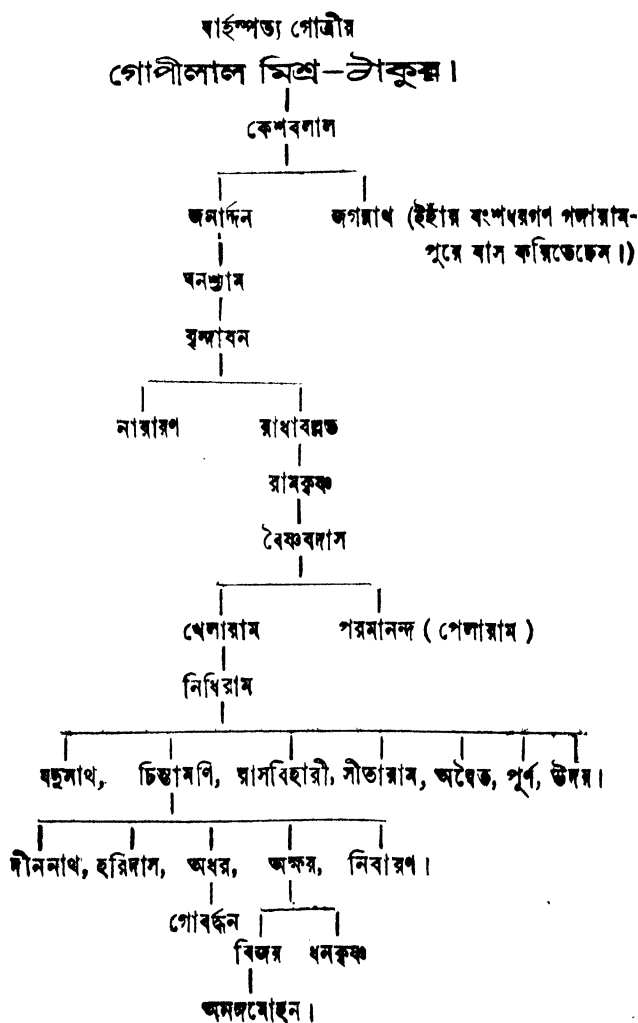
শ্রীযুক্ত নন্দলাল অধিকারী—কীর্ত্তন-বিশারদ।

সাং শ্যামপুর, থানা আরামবাগ, জেলা হুগলী।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয় শ্রী-সম্প্রদায়ী সিদ্ধ রসিকদাসের অধস্তন অষ্টম পুরুষ। (১) রসিকদাস, (২) রসময়, (৩) নরহরি, (৪) রাজকৃষ্ণ, (৫) বড় কৃষ্ণদাস, (৬) প্রেমদাস, (৭) নীলমণি, (৮) নন্দলাল।

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী অধিকারী।

শ্রীমান্ সাধন চন্দ্র ও সত্যচরণ অধিকারী।

সাং সিংটী-জঙ্গলপাড়া, থানা উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকালে ১৭৩৫—৪০ খৃঃঅব্দে বর্গীদের (মারাঠা সৈন্যগণের) অত্যাচারে বাঙ্গলার বহুজনপদ ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সময়ে দোগাছিয়ার রাজার বাড়ীও বর্গীদের কর্তৃক লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। অদ্যাপি রাজবাড়ীর গড় ও ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। এই রাজার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন বিগ্রহ, শ্রীদামোদরশিলা, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীগিরিধারী, শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ প্রভৃতি দেবসেবার ভার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের উপর ন্যস্ত ছিল। নাম " চতুর্ভুজ ঠাকুর "—সম্ভবতঃ মৈথিলি ব্রাহ্মণ হইবেন। তাঁহার একটী কন্যা ছিলেন। শাণ্ডিল্যগোত্র-বন্দ্য-বংশীয় সুরেশ্বর শর্ম্মার সহিত চতুর্ভুজের কন্যার বিবাহ হয়। চতুর্ভুজ জামাতাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। কাজেই সুরেশ্বর কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজ হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থিতি করেন। চতুর্ভুজের লোকান্তরের পর সুরেশ্বর উক্ত পূজারীর পদে অভিষিক্ত হন। সুরেশ্বরের পুত্র গৌরমোহনের অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়েই বর্গীর অত্যাচারে রাজবাড়ী ধ্বংস হওয়ায় গৌরমোহন শ্রীবিগ্রহাদি লইয়া সিংটী-জঙ্গলপাড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে আর প্রবেশ করিতে অভিলাষী না হইয়া বালিদাওয়ানগঞ্জ গ্রামে গৌড়াদ্য বৈদিক-বৈষ্ণব বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত ব্রজবাসীর কন্যাকে বিবাহ করেন। গৌরমোহনের বংশলতা। যথা—

চতুর্ভুজ ঠাকুর।
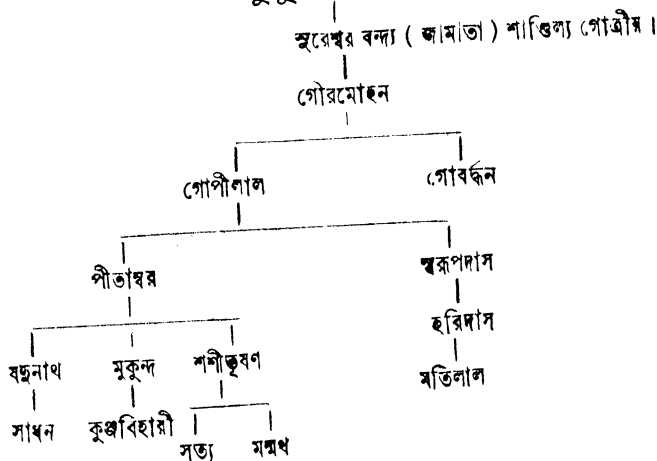
শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র ঠাকুর।

সাং গজা—থানা উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী "শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুর" নামক এক অল্প বয়স্ক সাধু এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করেন। তিনি শ্রীবালগোপালের উপাসক ছিলেন। অদ্যাপি এই শ্রীবাল গোপালই ইঁহাদের কুলদেবতা। সাধু বহু লোকের অনুরোধে 'রামভজনদাস' নামক এক রামাৎ বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন। সুন্দরানন্দ ঠাকুরের অধস্তন ৬ পুরুষের পর ৭ম "রূপচরণ ঠাকুর" সিদ্ধিলাভ করিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হন। তৎপরে ৮ সীতানাথ ৯ জগন্নাথ ১০ মদনদাস ১১ রামচরণ
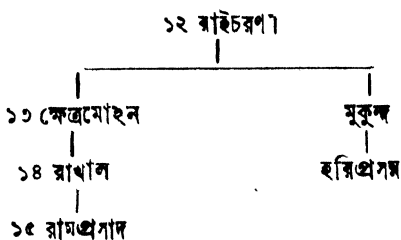
শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটীচরণ অধিকারী।

গ্রাম—শঙ্করপুর—বর্দ্ধমান।

হাঃ সাং কদমতলা—হাওড়া।

খৃঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শঙ্করপুরে "রামশরণ মিশ্র" নামক পশ্চিম দেশীয় এক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কোন ধনীর গৃহে চাকুরী বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক সস্ত্রীক বাস করেন। তিনি একমাত্র পুত্র শিউ প্রসাদকে রাখিয়া পরলোক গমন করিলে শিবপ্রসাদ অনন্যোপায় হইয়া এক ব্রহ্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করেন। ধূর্জ্জটী বাবু এই শিবপ্রসাদের অধস্তন ৯ম পুরুষ। যথা—১ রামপ্রসাদ ২ হরিহর ৩ মুকুন্দ ৪ বলাই ৫ কানাই ৬ তোতারাম ৭ জয়কৃষ্ণ ৮ ভোলানাথ কবিরাজ (ইনি শ্রীরামপুরে শশুরালয়ে আসিয়া বাস করেন) ৯ ধূর্জ্জটী।

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন দেব গোস্বামী।

সাং মহাম্মদপুর,—ভগবানপুর, মেদিনীপুর—জেলা।

অতি প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। ইহাঁদের বীজপুরুষ দাক্ষিণাত্য প্রদেশীয় মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মহাত্মা। ইহাঁর পরবর্ত্তী ৮ পুরুষের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদদেব গোস্বামী হইতেই বংশধারা বিবৃত হইতেছে। কালিমোহনপুর ৺গোবিন্দজীউর ঠাকুর বাড়ীই উক্ত মুরারিমোহনের শশুর বাড়ী।

মাতুলালয়—ভগবানপুর—শ্রীশ্রী৺হরিঠাকুরের পাট এবং পিসাবাড়ী—শ্রীপাট মোহাড়—শ্রীশ্রীমদন মোহন জীউ ঠাকুর বাড়ী। বংশধারা —

১।—ব্রহ্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

* * * * *

- ৯।—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ
  - আনন্দ
    - লোকনাথ
  - বেচারাম
    - হৃদয়ানন্দ
      - বৃন্দাবন
        - রাধাচরণ
          - ক্ষেত্রমোহন
            - মুরারি
              - মন্মথ
            - অধর
            - শৈল
              - পূর্ণচন্দ্র
            - গিরিশ
            - গোঁসাই
        - কার্ত্তিক
          - শিবু
            - বনমালী
              - রামেশ্বর
            - মধু
              - জ্যোতি
              - দেবেন্দ্র
              - সুরেন
            - দামোদর
          - দীনবন্ধু
            - ভুবন
          - সীতারাম
            - রাখাল
            - বঙ্কিম
      - কানাই
      - বলরাম
      - ভীম
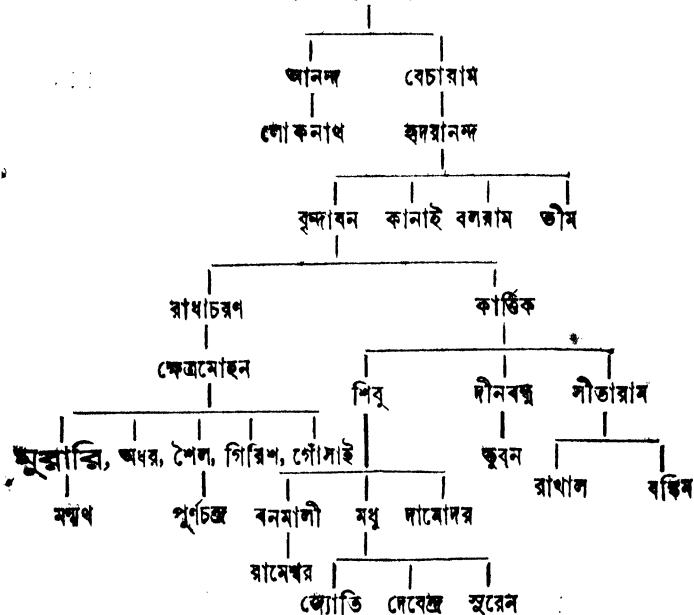
শ্রীযুক্ত নীলমণি দেব গোস্বামী।

শ্রীযুক্ত তারিণী চরণ দেব গোস্বামী।

শ্রীপাট কিশোরপুর—জেলা মেদিনীপুর।

দ্বিজ কালিন্দী ঠাকুরই এই বংশের বীজ পুরুষ। ইনি শ্রীমৎ রসিকানন্দ

দেবের শিষ্য। যথা "রসিক মঙ্গলে"—

"রসিকের শিষ্য কালিন্দী দ্বিজবর।
রসিকের চরণ যাঁহার নিজঘর॥"

১৬৪০—৪৫ খৃঃঅব্দের মধ্যে কালিন্দী ঠাকুর শ্রীমদ্ রসিকের চরণে আত্ম-বিক্রয় করেন। ইনি পরম সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর শিষ্যশাখা বহু বিস্তৃত। হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ইহাঁর বহু বংশশাখা বিদ্যমান আছে। ইহাঁর অলৌকিক ঘটনার কথা লিখিতে গেলে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হয়। ইনি শ্রীপাট কিশোরপুরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর বিগ্রহের সেবা প্রকাশ করেন। উক্ত শ্রীনীলমণি ও শ্রীতারিণীচরণ দেব শ্রীমৎ কালিন্দী ঠাকুরের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ। ১০ প্রেমচাঁদ ১১ দীনবন্ধু ১২ নীলমণি।

শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ দাস অধিকারী।

সাং ছোট উদয়পুর—কাঁথি মহকুমা,
মেদিনীপুর।

ইহাঁরা ব্রহ্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। বহু প্রাচীন বংশ, কায়স্থ, মাহিষ্য প্রভৃতি জাতি ইহাদের শিষ্য। বীজপুরুষ রঘুনাথ দাস—রামাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, ছিলেন। ইহাঁর বংশধর পরে শ্রীবংশীবদনানন্দের শাখায় অন্তর্ভুক্ত হন। উক্ত হরনারায়ণ বাবু রঘুনাথ হইতে অধস্তন ১০ম, পুরুষ।

শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মোহান্ত।

সাং হারদী, চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া।

অযোধ্যা প্রদেশ হইতে "সাধু জঙ্গলানন্দ" প্রথমে নবদ্বীপে আগমন করেন। ইনি নিমাৎ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। পরে হরদা গ্রামে জনৈক ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হন। নীলকণ্ঠ বাবুর পিতার নাম অটল বিহারী মোহন্ত। ইহাঁদের বাড়ীতে শ্রীরাধাবল্লভ জীউর সেবা প্রকাশ আছে।

কর্ম্মকার, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক সাহা, যোগী জাতীয় বহু শিষ্য আছেন। সাধু জঙ্গলানন্দ হইতে নীলকণ্ঠ অধস্তন ৮ম, পুরুষ।

শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন দাস, B.A., B.L.

রামমোহন—ত্রিপুরা।

ইহাঁর বংশের বীজপুরুষ আত্মারাম দাস শৈব-সাধু ছিলেন। পরে ব্রহ্ম-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রবেশ পূর্ব্বক বৈষ্ণব-কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন এবং শ্রীরাধামাধব জীউর সেবা প্রকাশ করেন। যথা—১ আত্মারাম ২ বৃন্দাবন ৩ গৌরাঙ্গদাস (১২৬ বৎসর জীবিত ছিলেন) ৪ রূপরাম ৫ ধর্ম্মনারায়ণ ৬ প্যারিমোহন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত অধিকারী।

সূত্রাগড়—শান্তিপুর—নদীয়া।

শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় কমলাকর গঙ্গোপাধ্যায় সস্ত্রীক বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবের গৃহেই পুত্র কন্যার বিবাহের আদান প্রদান করেন। এজন্য তিনি রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের সংশ্রব হইতে বঞ্চিত হন। তদবধি পুরুষানুক্রমে বৈদিক বৈষ্ণবের সহিতই আদান প্রদান হইতেছে। লক্ষ্মীবাবুর মাতামহ বংশও ৬ভজহরি গোস্বামীর বংশ। ইহাঁরা শ্রীনিত্যানন্দ বংশীয় শাখা, আদিবাস যশোহর গোপাল নগর। বর্ত্তমান রাণাঘাট। ভজহরি গোস্বামী শ্রীভাগবতে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া ৬প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের নিকট "ভাগবতভূষণ" উপাধি লাভ করেন। লক্ষ্মী বাবুর বংশ তালিকা।—

শাণ্ডিল্য গোত্রীয়

কমলাকর (পঙ্গো)
|
অদ্বৈত চন্দ্র অধিকারী
|
কৃষ্ণচন্দ্র
|
স্বরূপদাস
|
গদাধর
|
লক্ষ্মীকান্ত।

শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী।

শ্রীপাট রাউতথানা—থানাকুল, হুগলী।

ইহাঁদের বীজ পুরুষ রামস্বরূপ তেওয়ারী—শ্রী-সম্প্রদায়ী আচারী বৈষ্ণব ছিলেন। ইনি প্রথমতঃ সস্ত্রীক চন্দ্রকোণায় আসিয়া বাস করেন। পরে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু যখন খানাকুল কৃষ্ণনগরে শ্রীমদ্ অভিরাম গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, সেই সময়ে রামস্বরূপ শ্রীমন্নিত্যানন্দের কৃপা লাভ করেন এবং উদয়পুর গ্রামে বাস করেন। বাটীতে পূর্ব্বাপর শ্রীশালগ্রামশিলা সেবা প্রকাশ আছেন! ইহাঁদের বহুতর কায়স্থ, মাহিস্য, তিলি, তন্তুবায় প্রভৃতি শিষ্য আছেন। রাধাকান্ত গোস্বামী উক্ত রামস্বরূপ হইতে দশম পুরুষ। যথা—১ রামস্বরূপ ২ গতিকৃষ্ণ, ৩ গদাধর, ৪ শ্যামচাঁদ, ৫ শ্রীধর, ৬ পাঁচকড়ি, ৭ যাদব, ৮ অধর, ৯ গোষ্ঠবিহারী, ১০ রাধাকান্ত।

শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন অধিকারী।

সাং বিরহী, রাণাঘাট—নদীয়া।

ইহাঁদের বংশের আদি পুরুষ মধ্বাচার্য্য সম্প্রদায়ী। শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যানুশিষ্য গোবিন্দাচার্য্য তিনি হিন্দুস্থানী ছিলেন। বৈদিক বৈষ্ণবের গৃহে

বিবাহ করিয়া বাঙ্গলার অধিবাসী হন। তাঁহার পর হইতে বর্ত্তমান ভুবনবাবু পর্য্যন্ত দ্বাদশ পুরুষ। প্রথম ৭ পুরুষের নাম অজ্ঞাত। ৮ শ্রীদাম, ৯ মুরারি ১০ বৃন্দাবন, ১১ সনাতন, ১২ ভুবনমোহন।

উক্ত জেলায়—রাজীবপুর পোষ্টের অধীন ঈশ্বরীগাছা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র অধিকারী, শিমুরালি পোঃ অধীন সুতারগাছী গ্রামে শ্রীযুক্ত যুগল চন্দ্র অধিকারী, মোল্লাবেলিয়া পোঃ অধীন ব্রাহ্মণবেড়িয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র চন্দ্র অধিকারী এবং সুবর্ণপুর পোঃ অধীন নাটশাল গ্রামে শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী অধিকারী এবং চুয়াডাঙ্গার "শ্রীমাধবধাম" স্থাপয়িতা রাধামাধব মোহন্ত মোক্তার মহাশয়ের বংশও এস্থলে উল্লেখ যোগ্য।

শ্রীযুক্ত অতুল কৃষ্ণ অধিকারী।

গ্রাম আলাটী—হুগলী।

ইহাঁদের আদি নিবাস চাঁতুর গ্রামে। অতুল বাবুর পিতা আলাটী গ্রামে স্বীয় মাতুলালয়ে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁরা ভরদ্বাজ-গোত্রীয় মধ্বাচারী বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য-শাখা। খৃষ্টীয় ১৫শ, শতাব্দের প্রারম্ভে "কানু গোঁসাই" নামে এক সিদ্ধ পুরুষই এই বংশের বীজ পুরুষ। ঠাকুর কানু গোঁসাই হইতে অধস্তন অতুল বাবু পর্য্যন্ত ১৮ পুরুষ। এই ঠাকুর "কানু গোঁসাই" বাঙ্গালী কি পশ্চিমদেশবাসী ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ অধিকারী।

সাং ডিহিবাতপুর—হুগলী।

প্রাচীন বৈষ্ণব বংশ। মূলে রামাৎ-সম্প্রদায়ী জাত-বৈষ্ণব। এক্ষণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইহাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিমদেশ হইতে আসিয়া এখানে বাস করেন। তদবধি ইহাঁরা ১০।১২ পুরুষ এখানে বাস করিতেছেন।

ভরদ্বাজ-গোত্রীয়

শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মোহন্ত।

গ্রাম রসুলপুর—জেলা হুগলী।

ইহাঁরা মূলে নাগা-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। ইহাঁরা রামাৎ গৃহস্থের ভান করিলেও শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক; ইহা শ্রীমন্ মাধবেন্দ্রপুরীর ভক্তি-ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ণ নিদর্শন। বাড়ীতে "শ্রীরাধামদনমোহন" বিগ্রহের সেবা প্রকাশ আছেন। নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বের কিছু পূর্ব্বে এই রসুলপুর গ্রামে (পূর্ব্বে এই গ্রামের নাম গোবিন্দপুর ছিল) এক ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করিতেন, এই রাজ-সংসারে কর্ম্মোপলক্ষে উহার পূর্ব্বপুরুষেরা পশ্চিম দেশ হইতে আসিয়া এইখানে বাস করেন। "বড়পীর সাহেব" নামক এক মুসলমান ফকিরের অত্যাচারে রাজবংশ ধ্বংস হইলে গোবিন্দপুর গ্রামের নাম 'রসুলপুর' হয়। রসুলপুর গ্রামে ইহাঁরা অনুমান ১৬।১৮ পুরুষ বাস করিতেছেন।

শ্রীমান্ যুগল কিশোর অধিকারী।

সাং ডিহিভুরসুট—জেলা হুগলী।

ইহাঁর বংশের আদি পুরুষ শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ছিলেন। যাযাবর অর্থাৎ ভ্রমণকারীর বেশে আসিয়া সপরিজন এই গ্রামে বাস করেন। ১২।১৩ পুরুষ এইখানে বাস করিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ী।

শ্রীযুক্ত গোপাল চন্দ্র মোহন্ত।

সাং নিমডাঙ্গী—আরামবাগ—হুগলী।

পশ্চিমোত্তর প্রদেশ হইতে খৃঃ ১৭শ, শতাব্দের শেষভাগে জটাধারী মোহন্ত নামক এক রামাৎ সাধু স-পরিবারে দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে নিমডাঙ্গী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তিনি এই স্থানে এক পাঠ স্থাপন করিয়া শ্রীশ্রীসীতারাম,

শ্রীহনুমানজী, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীধরশিলার সেবা প্রকাশ করেন। মোহন্ত ঠাকুরের দুইজন অতি নিকট আত্মীয়া (দুই ভগিনী) সঙ্গে ছিলেন। একজনের নাম শ্রীমতী থুলী, কনিষ্ঠার নাম শ্রীমতী সোনা। এই সোনার ১টী বালিকা কন্যাও সঙ্গে ছিল। মোহন্ত ঠাকুরের কৃষ্ণমোহন তেওয়ারী নামে একটী বালক শিষ্য ছিলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ মহান্ত ঠাকুর তাহাঁর হস্তেই শ্রীবিগ্রহ-সেবাভার ন্যস্ত করেন। জটাধারী সাধুর ঐকান্তিকী ভক্তি-নিষ্ঠার কারণ লোকে তাঁহাকে মোহান্তজী বলিয়া ডাকিতেন। মোহান্তের অপ্রকটের পর তাঁহার দুই ভগিনী, মোহন্ত স্বরূপে শ্রীবিগ্রহ-সেবার তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন কি তাঁহারা নিজেও শ্রীধর শিলাদি অর্চ্চনা করিতেন। পরে শ্রীমতী সোনার কন্যার সহিত পূজারী কৃষ্ণমোহন তেওয়ারীর বিবাহ হয়। অনন্তর কৃষ্ণমোহনের একটী পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে কৃষ্ণমোহনের মৃত্যু হয়। উক্ত সোনাদেবী এই শিশুকে লালন পালন করেন। শিশুর নাম মঙ্গল মোহন্ত। ইনি বালিদেওয়ানগঞ্জে এক গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবের বাড়ীতে বিবাহ করেন। বংশ-ধারা; যথা—
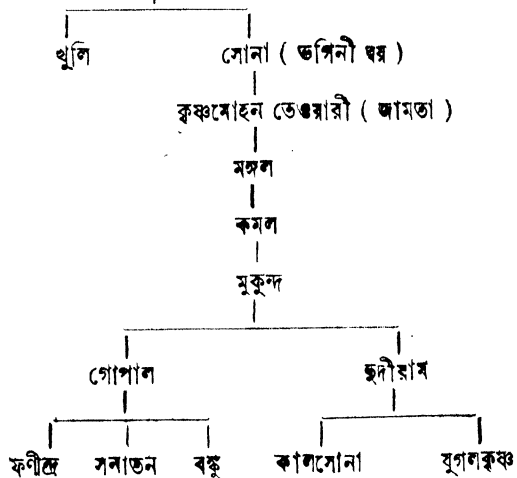
শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দেব অধিকারী।

গ্রাম কুমরুল—জেলা হুগলি ।

এই বংশের মূল পুরুষ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় আচারী সম্প্রদায়ী জনৈক অতিবৃদ্ধ সাধু। তাঁহার এক পুত্র শিষ্যরূপে সঙ্গে ছিলেন। তিনি তীর্থ ভ্রমণোপলক্ষে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই এখানে দেহ রক্ষা করেন। ইনি সাধারণের নিকট "বুড়ো-ঠাকুর" নামে পরিচিত এবং অদ্যাবধি দেবতার ন্যায় পূজিত হইয়া আসিতেছেন। ইহাঁর পুত্র কুমরুল গ্রামবাসী জনৈক গৌড়াদ্য গৃহী বৈষ্ণবের কন্যা বিবাহ করিয়া এই গ্রামেই অবস্থান করেন। পূর্ব্বোক্ত সচ্চিদানন্দ বাবু, "বুড়ো ঠাকুর" হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ।

শ্রীমধুসূদন অধিকারী তত্ত্ববাচস্পতি।

(গ্রন্থকার)

গ্রাম পশ্চিমপাড়া, থানা আরামবাগ—জেলা হুগলী।

(শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট)

এই অধম গ্রন্থকার উক্ত গ্রামে শ্রীমদ্ রাখালানন্দ ঠাকুর নামক সিদ্ধ পুরুষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রীরাঘব দুবে (দ্বিবেদী) নামক পশ্চিমোত্তর দেশবাসী জনৈক শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব সপরিবারে নীলাচলে যাইবার পথে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর অসামান্য ভক্তি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার কৃপাসঙ্গ করেন। ঠাকুর রাঘবাচার্য্য, শ্রী-সম্প্রদায়ের মূলশাখা আচারী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ তিনি "রাঘবাচারিয়া" বা দুবে ঠাকুর নামেই অভিহিত ছিলেন। আচার্য্য হইতেই আচারী উপাধির সৃষ্টি। ঠাকুর রাঘবাচার্য্য শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার চরণে আত্ম-বিক্রয় করেন। অতঃপর তাঁহার আর শ্রীনীলাচল গমন করা হইল না। শ্রীগুরু-কৃপাবলে ঐখানেই তাঁহার সে অভিলাস পূর্ণ হওয়ায় চরিতার্থতা লাভ করেন। 'রসিক মঙ্গল' গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

"রসিকের শিষ্য 'দুবে' দ্বিজ ভাগ্যবান।
রসিকেন্দ্রচন্দ্র বিনা না জানয়ে আন॥" পঃ বিঃ ১৪ লহরী।

ঠাকুর রাঘবাচার্য্য অতঃপর শ্রীগুরুদত্ত "শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুর" নাম প্রাপ্ত হইয়া কিছুকাল শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে স-পরিবারে অবস্থান করেন। তাঁহার পরিজনের মধ্যে একটী শিশু পুত্র ও পত্নী। শ্রীগুরুদেবের আদেশে এবং নিজের ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর শ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম নবদ্বীপে বাস করিবার মনস্থ করিয়া শুভ যাত্রা করেন। চন্দ্রকোণাগ্রামে আচারী সম্প্রদায়ের যে মঠ আছে, তথায় ঠাকুরের পরিচিত জনৈক আচারী সাধু অবস্থান করিতেন—ঠাকুর তাঁহার সঙ্গ পাইয়া পরমা-

নন্দে কিছুদিন তাঁহার আশ্রমে বাস করেন। প্রায়ই তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত লইয়া ঠাকুরের সহিত সাধুর বাদ-বিতর্ক হইত। এজন্য ঠাকুর আর তথায় অবস্থান না করিয়া পুনরায় শ্রীধামের দিকে শুভযাত্রা করেন। ঘটনাচক্রে তিনি উপরোক্ত আলাটী পশ্চিমপাড়া গ্রামে আসিয়া পত্নীর অসুস্থতা নিবন্ধন উক্ত গ্রামবাসী পরম ভক্ত মথুর মিদ্দা নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু মাহিষ্য গৃহস্থের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই খানেই তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে, অনতিদূরবর্ত্তী গোবর্দ্ধন চক্ নামক পল্লিস্থিত কৃষ্ণদাস মোহন্ত নামক এক বৈষ্ণবের আশ্রয়ে শিশুটীকে রাখিয়া "কানানদীর" তীরবর্ত্তী পশ্চিমপাড়া ও চক্ গোবর্দ্ধন গ্রামের মিলন স্থানে একটী কুটীর বাঁধিয়া ঠাকুর রাখালানন্দ শেষ জীবন ভজন-সাধনে অতিবাহিত করেন। তাঁহার এই আশ্রমটী বিবিধ তরুলতা সমাকীর্ণ ঋষি-আশ্রমের মত ছিল; যদিও বন্যার প্রকোপে এক্ষণে পাকা-সমাধিমঞ্চ ব্যতীত কোন চিহ্ন মাত্র নাই, তথাপি অদ্যাবধি উহা "বৈষ্ণব-গোঁসাইর বাগান" নামে প্রসিদ্ধ। এই শ্রীরাখালানন্দ ঠাকুরের পাটে প্রতি পৌষসংক্রান্তিতে মহাসমারোহে তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অপ্রকটের পর শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর সহিত ঠাকুরের মিলন সংঘটিত হইয়াছিল। শ্রীঠাকুর রাখালানন্দ গুরুদেবের প্রচুর কৃপাশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ পুরুষের অলৌকিক প্রভাবের অনেক জনশ্রুতি আছে। স্নান করিতে গিয়া ঠাকুরের জপ-আহ্নিকে অনেক সময় ব্যয়িত হইত, সে সময়ে স্নানের ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নান করিতে না পারায় বড় বিরক্ত হইত। ঠাকুর তাহা বুঝিতে পারিয়া শ্রীপাটের অনতিদূরে খোন্তা (মৃত্তিকা খননের ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ) দিয়া তিন দিনের মধ্যে একটী নাতিক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করেন। এক শাক্ত ব্রাহ্মণ দুষ্ট-বুদ্ধি প্রযুক্ত ঠাকুরকে সেবার জন্য ছাগমাংস দিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের অমানুষী ভক্তি সিদ্ধিতে তাহা চাঁপা ফুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি কদম-গাছে আম ফলাইয়াছিলেন। আজ পর্য্যন্ত কোন বৃক্ষ ফলবান হইতে বিলম্ব হইলে লোকে ঠাকুরের সমাধির কাছে মানত করিয়া থাকে। মানত অনুসারে ফলও

ফলে। প্রবাদ আছে ঠাকুর নিজের সমাধির জন্য নিজেই গর্ত্ত খনন করিয়াছিলেন। যথাকালে তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছে; কিন্তু সমাধির ৩ দিন পরে তাঁহার সহিত দূর দেশে কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইয়াছে, ঠাকুর তাহাদিগকে বলিয়াছেন—" আমি শ্রীবৃন্দাবন যাইতেছি।" তাঁহারা দেশে আসিয়া জানিলেন, তিনি ৩ দিন পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অথচ সমাধি স্থানের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই। শ্রীঠাকুর প্রতিদিন যে " শ্রীশ্রীধর শিলা " অর্চ্চনা করিতেন, তদীয় বংশধরগণ তাহা অদ্যাপি পূজা করিয়া আসিতেছেন। ১৬৪০—৪৫ খৃঃ অব্দে শ্রীঠাকুর রাধানন্দ শ্রীরসিকানন্দ দেবের কৃপালাভ করেন। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণদাস মহান্তের একটী কন্যা ছিল। যথাকালে ঠাকুরের পুত্র শ্রীরাধামোহন দেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। উক্ত কৃষ্ণদাসের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শুনা যায়, সোঙালুক গ্রামে শ্রীঅভিরামগোপালের যে শাখা-গোস্বামী বংশ আছে—কৃষ্ণদাস সেই বংশের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই জন্য এক সময়ে উক্ত গোস্বামী বংশের এক ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত " বৈষ্ণব গোসাঞের বাগানের " অংশ দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। উক্ত " বৈষ্ণব বাগান " মায় পুষ্করিণী বাগাৎ ইত্যাদিতে ৮/ আট বিঘা ছিল। বড়ই দুঃখের বিষয়, সম্প্রতি জমিদার মহাশয়গণ সমাধি স্থানের কিয়দংশ বাদে সমস্ত জমি-বাগানাদি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়া ঠাকুরের বংশধরগণকে বঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীঠাকুরের বংশ-তালিকা পর পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।—

আঙ্গিরস-গোত্রীয় শ্রী-আচারী সম্প্রদায়ী

শ্রীরাঘবাচার্য্য দোবে (দ্বিবেদী)

(শ্রীগুরুদত্ত নাম—ঠাকুর শ্রীরাখালানন্দ)

রাধামোহন (খৃঃ ১৬০০ অব্দে জীবিত ছিলেন)

গোকুলানন্দ　শ্রীনিবাস

বনমালী　জয়হরি　কৃষ্ণহরি (ইনি মেদিনীপুর জেলায় বাস করেন)।

গৌরহরি　মাধব　গোপীবল্লভ

হরিবল্লভ (হরিমোহন)

ব্রজমোহন　শ্যামসুন্দর

গোলোক

গোবিন্দ　পূর্ণচন্দ্র (ইনি গঙ্গাতীরবর্ত্তী বালী-উত্তর পাড়ায় বাস করেন।)

হরিদাস

রাখাল　গোপাল

বিষ্ণুপদ

(শিশু)

মধুসূদন　সুরেন্দ্রমোহন　তুলসীপদ

(তত্ত্ববাচস্পতি) (বিদ্যাবিনোদ)

(জীবাধম গ্রন্থকার)

পঞ্চানন।
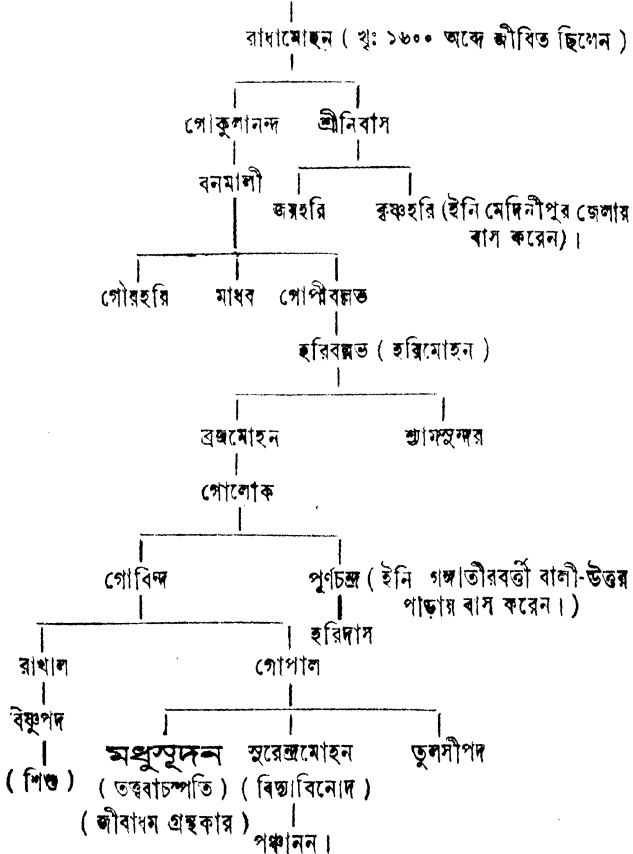
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে কয়েকটী দিগ্‌দর্শন মাত্র করা হইল। প্রত্যেক জেলায় অন্বেষণ করিলে এইরূপ শত শত প্রাচীন বংশীয় বৈদিক বৈষ্ণবের বীজপুরুষ যে দ্বিজাতিবর্ণ, তাহা অভ্রান্ত রূপে প্রতীয়মান হইবে। আবার এইরূপ অনেক বৈষ্ণব-বংশ ব্রাহ্মণ সমাজের সহিতও যে ধীরে ধীরে মিশিয়া গিয়াছেন ও যাইতে-ছেন, অন্বেষণ করিলে সেরূপ দৃষ্টান্তেরও অভাব হইবে না। আমরা আরও কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বংশের বিস্তৃত বিবরণ না দিয়া সংক্ষেপে তাঁহাদের নামমাত্র উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি। হুগলি—হিয়াতপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি অধিকারী, চিলেডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস পাণ্ডা (উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণ), সিংটী-জঙ্গলপাড়া (হাবড়া) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ অধিকারী (বাটীতে শ্রীশালগ্রামশিলা সেবা প্রকাশ আছে), ধাপধাড়া (হুগলী) নিবাসী শ্রীযুক্ত নফর চন্দ্র দেব অধিকারী (ইহাঁদের বহু মাহিষ্য, তিলি, গোপ, করণ প্রভৃতি জাতীয় শিষ্য আছেন), আমতার (হাবড়া) শ্রীযুক্ত হৃদয় চন্দ্র দাস, হুগলী জেলা—বলরাম বাটীর (সিঙ্গুর থানা) শ্রীযুক্ত নন্দলাল অধিকারী, শ্রীযুক্ত হরিদাস অধিকারী, ঐ চক্‌গোবিন্দ নিবাসী শ্রীযুক্ত গোঁড়াধারী দাস, দক্ষিণ-বারাসত নিবাসী (২৪ পরগণা) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ অধিকারী, ২৪ পরগণা—ভেবিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ অধিকারী ও শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত কাব্য-ব্যাকরণ তীর্থ, (ধান্য কুড়িয়া হাই স্কুলের পণ্ডিত) ২৪ পরগণা—তেতুলিয়া—কুলিয়া নিবাসী ডাঃ শ্রীযুক্ত কালীচরণ অধিকারী। বর্দ্ধমান—আমাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত শশীভূষণ অধিকারী, বর্দ্ধমান—ভাতশালা নিবাসী পেন্‌সেন্‌ প্রাপ্ত পুলিস ইনস্‌পেক্টর ৺অধর চন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত ভোলানাথ দাস, জেলা ঐ—ছোট-বৈনান নিবাসী শ্রীযুক্ত ডাঃ হরিপদ মোহন্ত, বর্দ্ধমান—কালনার শ্রীগোপাল দাস মোহন্ত, বীরভূম—লাহা নিবাসী শ্রীযুক্ত বীরসিংহ দাস, ঐ কয়থা—নিবাসী শ্রীযুক্ত বালক নাথ দাস, কলিকাতা নেবুতলা শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ ঠাকুর, নদীয়া—রাণাঘাট নিবাসী স্বজাতি-বৎসল ও বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত গোস্বামী, কাঁকনাড়ার শ্রীযুক্ত

লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, মুর্শিদাবাদ কাঁদির শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ দাস (মোক্তার), নদীয়া-পোড়াদহ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কবিরাজ, বাওয়ালি—নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল অধিকারী, যশোহর ভাণ্ডার ঘর—নিবাসী বিশিষ্ট সমাজ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত পুণ্ডরী-কাক্ষ ব্রতরত্ন, ইনি "সাত্বত-পদ্ধতি" (বৈষ্ণব দশকর্ম্ম পদ্ধতি, "শ্রীএকাদশী তত্ত্ব" প্রভৃতি পুস্তকের প্রণেতা), ঐ গোপালনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত কৈলাশ চন্দ্র মোহন্ত, কলিকাতা গড়পার—শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র অধিকারী, বেহালা-নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ অধিকারী, জেলা হাবড়া আমতা-গৌরীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস ও শ্রীমান্ পার্ব্বতিচরণ অধিকারী, ডিহিভুরসাট্ নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিদাস অধিকারী, হাবড়া—বাগনান—বাসুদেবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন গোস্বামী (ইঁহাদের সহস্রাধিক নবশাখাদি সজ্জাতি শিষ্য আছেন), বাঁকুড়া, আকুই মান্দাড়া—নিবাসী শ্রীযুক্ত নন্দলাল অধিকারী, ঐ বিষ্ণুপুর—রঘুনাথসায়র নিবাসী ডাঃ নীলমাধব দাস—বাঁকুড়ার শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ দাস প্রভৃতি শত শত গৌড়াদ্য বৈদিক বৈষ্ণবের বংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আশা করি, গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব মাত্রেই স্ব স্ব বংশের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়া এই জীবাধম গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন, ইহাই সানুনয় অনুরোধ।

—:০:—

ঊনবিংশ উল্লাস।

—:o:—

সেন্‌সাস্ রিপোর্টের সমালোচনা।

১৮৭২ খৃঃ অব্দের ভারতীয় জনসংখ্যার বিবরণীতে (Census report) হিন্দুজাতির গুণ, কর্ম্ম ও সম্মানানুসারে যে বিভাগ হয়, তাহাতে বৈষ্ণব মাত্রকেই, অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব এবং সংযোগী, আউল, বাউল, দরবেশ, নেড়ানেড়ী প্রভৃতি যে কোন শ্রেণীর—আপনাকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এমন কি "বৈষ্ণবী" বলিয়া পরিচয়কারিণী গণিকাগণকেও বৈষ্ণব বর্ণের অন্তর্ভুক্ত করিয়া মাধ্যমিক বর্ণ রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মাধ্যমিকবর্ণ—যাঁহারা অপেক্ষাকৃত কম-সম্মানিত—কিন্তু সমাজে হেয় নহেন। মহামতি হাণ্টার সাহেব (Statistic's Director) বৈষ্ণবকে ৬ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—*(ক) সংযোগী, (খ) বৈরাগী, (গ) সাহেবী, (ঘ) দরবেশ, (ঙ) সাঁই, (চ) বাউল।

আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবগণ ইহার কোন্ বিভাগের অন্তর্গত তাহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল না। বরং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী তান্ত্রিক-বীরাচারী বৈষ্ণবের পরিচয়ই উহাতে পরিস্ফুট। ইহাতে অনুমিত হয়, আমাদের আলোচ্য ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতির অধিকাংশই ব্রাহ্মণের সহিত একত্র গণিত হইয়াছেন। অতঃপর মহাত্মা রিজলী (Mr, H. H. Risley I.C.S.) মহোদয় বহু অনুশীলন ও গবেষণা করিয়া বঙ্গীয় হিন্দু জাতি সম্বন্ধে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (Tribes and castes of Bengal) তাহাতে হিন্দু জাতিকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৈষ্ণব জাতিকে পঞ্চম ভাগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। কোন কোন জেলায় বৈষ্ণবকে জলাচরণীয় জাতি

* A statistical Account of Bengal.

রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার কোন কোন জেলায় জল-অনাচরণীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণবের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই ঐরূপ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ সাধারণতঃ তাঁহাদের আচার-ব্যবহার ও সামাজিক মর্য্যাদা দর্শন করিয়াই বৈষ্ণব সম্বন্ধে ঐরূপ অযথা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ হাণ্টারের বর্ণিত " সংযোগী " সম্প্রদায় বৈষ্ণব নহেন। উহা যুগী বা যোগী জাতির একটী সম্প্রদায়-বিশেষ। অথচ ইহার বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়াই সংযোগীকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা কতদূর ন্যায়-সঙ্গত তাহা সুধীজনেরই বিবেচ্য। বঙ্গদেশে সংযোগী বলিয়া ত, কোন বৈষ্ণব-সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীযুক্ত পদ্মচন্দ্র নাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বল্লাল-চরিতের" বাঙ্গলা অনুবাদে ও মন্তব্যে যোগী-সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে—" যোগীগণ সকলেই রুদ্র হইতে জন্মিয়াছেন। তাঁহাদের শ্রেণী বিভাগ লিখিত হইতেছে। কণ্‌ফট্‌, অওঘড়, মচ্ছেন্দ্র, শারঙ্গী, হার, কানিপা, ভুরীহার, অঘোরপন্থী, সংযোগী ও ভর্ত্তৃহরি যোগীজাতির এই সকল সম্প্রদায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন। সংযোগী— ইহাঁদিগকে আশ্রমী যোগী কহে। নেপাল, ডেরাহুন, বহর, উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশ ব্যতীত উক্ত কয়েক স্থানের যোগীরা * * * গুরুর ন্যায় সর্ব্বস্থানে পূজনীয় হইয়া আসিতেছেন। কেবল বঙ্গদেশীয় যোগীরা বল্লালের অন্যায় শাসনে অগত্যা যজ্ঞসূত্রাদি ত্যাগ করিয়া আচার-ব্যবহারে নীচজাতির ন্যায় হইয়া গিয়াছিলেন। ইত্যাদি (সম্বন্ধ-নির্ণয়-ধৃত)।

অতএব " সংযোগী " যে বৈষ্ণবের কোন শাখা-সম্প্রদায়ও নহে, তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দ্বারা বর্ত্তমান সময়েই যে ভারতীয় হিন্দুজাতির এইরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান সময়ের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে গ্রীক পণ্ডিত মেগাস্থিনিশ্ ভারতের লোক সমূহকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ভারত-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা—

(1) The Philosophers, (2) the councillors, (3) the soldiers, (4) the overseers, (5) the husbandmen, (6) the artisans, (7) the neatherds, shepherds, and hunters. The philosophers refer no doubt, to the Brahman priests and sages and the Buddhist Sramanas. (Short History of Indian People, by A. C. Mookerjee).

অর্থাৎ (১) দার্শনিক, (২) মন্ত্রী, (৩) যোদ্ধা, (৪) পর্য্যবেক্ষক, (৫) কৃষিজীবী, (৬) শিল্পী ও (৭) গোমেষাদিপালক। এই দার্শনিক বা তত্ত্বজ্ঞানিগণই যে, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মযাজক, সাধু-সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধ-শ্রমণ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ধর্ম্মযাজক ও সাধু-সন্ন্যাসিদের মধ্যে যে অনেকেই বৈষ্ণব ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু অতি প্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ধারা অব্যাহত আছে, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। প্রধানতঃ আধুনিক তান্ত্রিক-বামাচারী বৈষ্ণবদিগের আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াই এবং বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর ব্যক্তিগণের নির্দ্দেশক্রমেই যে মিঃ রিজ্‌লী সাহেব বৈষ্ণব সাধারণকে এমন কি আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবগণকেও মাধ্যমিক বর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। যেহেতু যে সকল জাতি-সমাজের পরে বৈষ্ণবের স্থান নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণবজাতির অনেকেই ঐ সকল জাতির প্রপূজ্য গুরু—এবং ঐ সকল জাতি শিষ্য স্থানীয়। আবার এই বৈষ্ণবজাতির অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মূল পুরুষ হইতে বংশ বিস্তার হওয়ায় এবং বৈষ্ণবমাত্রেই শূদ্রপদবাচ্য না হওয়ায় এই দ্বিজধর্ম্মী বৈষ্ণব-জাতির শূদ্র-সম শ্রেণীতে স্থান নির্দ্দেশ সমীচীন হয় নাই। শিষ্য অপেক্ষা গুরুর স্থান ঊর্দ্ধে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। এ বিষয়ে বঙ্গের খ্যাতনামা শাস্ত্রদর্শী-পণ্ডিত-

গণের ব্যবস্থা পত্রদ্বয় নিম্নে লিখিত হইল।*

(১)

শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্।

ব্যবস্থা পত্রম্।

সাধারণ-বৈষ্ণবাপেক্ষয়াহতি-সদাচার-সম্পনানাং বিষ্ণুভক্ততয়া বৈষ্ণবপদ-বাচ্যানাং গোস্বামি-বৈষ্ণবানাং তথাধিকারি-বৈষ্ণবানাং কেষাঞ্চিন্মোহান্তোপাধিকানামপ্যেতেষাং ময়ূরভঞ্জাধিপতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয়াদি রাজন্যবর্গ-পূজ্যপাদ-গুরূণাং শিষ্যাপেক্ষয়া গুরূণাং যতুচ্চসম্মানাদিকং শাস্ত্রসিদ্ধং যুক্তিসিদ্ধঞ্চ তদ্রক্ষণং সমুচিতং দাতব্যঞ্চেতি বিত্তষাম্পরামর্শঃ।

নবদ্বীপ স্মার্ত্তপ্রধান
বিদ্যাবাচস্পত্যুপাধিক
শ্রীশিবনাথশর্ম্মণাম্।
শ্রীরামোজয়তি
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রীরজনীকান্ত শর্ম্মণাম্।

শ্রীশ্রীহরিঃশরণং
সার্ব্বভৌমোপাধিক
শ্রীযদুনাথশর্ম্মণাম্।
তর্করত্নোপাধিক
শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মনাম্।

শ্রীশ্রীরামোজয়তি
কবিভূষণোপাধিক
শ্রী অজিত নাথ ন্যায়রত্ন
শর্ম্মণাম্।
বাচস্পত্যুপাধিক
শ্রীশিতিকণ্ঠ শর্ম্মণাম্
শ্রীশ্রীহরিঃশরণম্
বিদ্যারত্নোপাধিক
শ্রী প্রসন্ন কুমার শর্ম্মণাম্।

---

* ১৯০১ সালে গভর্ণমেন্টের সেন্‌সাস্ রিপোর্টে বৈষ্ণবকে যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তাহাতে শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গৌরব-রবি অধুনা নিত্যধামগত শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব মহাত্মাগণ এই ব্যবস্থাপত্র ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ-প্রয়োগ সহ তাহার প্রতিবাদ করিয়া বিশুদ্ধাচারী বৈষ্ণবগণ ক্ষত্রিয়ের উর্দ্ধে ব্রাহ্মণের পর-পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য, এই মর্ম্মে মাননীয় শ্রীযুক্ত ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন, এই ব্যবস্থা পত্রদ্বয় তাহারই অনুলিপি।

(২)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণোজয়তি—

ন বয়ং প্রসিদ্ধিমাত্রমুপলভমানা অমীষাং গৌরবমাতিষ্ঠামহে, যেনৈতেষাং মহিমা ব্যাবর্ত্ত্যমানো গৌরবমপি ব্যাবর্ত্তয়েৎ। কিন্তু শ্রূয়তে তাবৎ—"পরিপক্ক-মলা যে তাম্বুৎসাদন হেতু শক্তিপাতেন। যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্য-মূর্ত্তিস্থ"—ইত্যেবমাদি; তেনৈবং নির্দ্ধারয়ন্তো রাজন্য-শিষ্যাদুচ্চাদুচ্চতরং গুরুস্থানং বিদধীমহীত্যেতন্মতমস্মাকম্।

নবদ্বীপাধিপতেঃ সভাপণ্ডিতানাং
বেদান্তবিদ্যাসাগরোপাধিকানাং
শ্রীগঙ্গাচরণ দেব শর্ম্মণাম্।

অতএব আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণবগণ যে শাস্ত্র-সদাচার-দেশাচার ও সামাজিক-মর্য্যাদা-গৌরবে ব্রাহ্মণের সমতুল্য, তাহা নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। এই গৌড়াদ্য-বৈষ্ণবজাতির গৌরব ঘোষণা করিতে হইলে শ্রীপাদ শ্যামানন্দ প্রভুর প্রিয়তম শিষ্য শ্রীপাদ রসিকানন্দ প্রভুবংশীয় শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী প্রভুগণের কথাই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

"মেদনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার অধীন শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের গোস্বামী মোহান্তগণ প্রায় ৪০০ শত বৎসর যাবৎ পশ্চিম-বঙ্গের বিশেষতঃ মেদিনীপুর, বালেশ্বর, হুগলী, হাবড়া ও বাঁকুড়া জেলার ভক্তিরাজ্যের বৈষ্ণব রাজচক্রবর্ত্তীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান মোহন্ত শ্রীপাদ নন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু ও শ্রীপাদ গোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী প্রভু শ্রীপাটের গৌরব উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। ইহাঁদের কর্ত্তৃত্বাধীনে শ্রীধাম বৃন্দাবনের সেবাকুঞ্জে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীরাধাশ্যামসুন্দর, নন্দগ্রামে শ্রীনরসিংহ দেব, বর্ষাণে শ্রীশ্যামরায়, পুরীধামে কুঞ্জমঠে শ্রীশ্রীরসিকরায়, রেমুণায়, শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সিদ্ধাশ্রম মঠ, কুস্তিয়ালীর সমাধিমঠ, ময়ুরভঞ্জ—রামা-

গোবিন্দপুরে শ্রীশ্রীবিনোদ রায়, ও কানপুরে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সমাধি মঠ, জয়পুরে শ্রীশ্যামসুন্দর, কচ্ছদেশে শ্রীরাধাশ্যাম, তাম্রলিপ্তে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নাড়াজোলে শ্রীশ্রীমদনমোহন, পলসপাইয়ের শ্রীরাধাদামোদর, প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ শতাধিক মঠ ও দেব-সেবাদি বিদ্যমান আছেন। ময়ূরভঞ্জ, নীলগিরি, লালগড়, রামগড়, ধলভূম, নরসিংগড়, কেঁওনঝোড়, কোপ্‌তিপদাগড়, গড়মঙ্গলপুর, মনোহরপুর, তুর্কাগড়, খণ্ডরইগড়, কুলটিকরি, খড়ুই, ময়নাগড়, সুজামুঠা ও প্রাচীন তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি অষ্টাদশ রাজবংশ ও শতাধিক জমিদার বংশ ও শত সহস্র ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বংশ শিষ্যরূপে এই শ্রীপাটের—তথা সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের গৌরব-শ্রী উদ্দীপ্ত করিতেছেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব-জগতে শ্যামানন্দী-সম্প্রদায়ই সমধিক প্রবল। বর্ত্তমান মোহান্ত গোস্বামী প্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু-প্রতিষ্ঠিত লুপ্ত মঠের পুনরুদ্ধার ও তথায় শ্রীশ্রীনিতাই-গৌর শ্রীবিগ্রহ-সেবা প্রকাশ করিয়া বিশেষ গৌরব-ভাজন হইয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন গৌড়বঙ্গে এমন শত সহস্র সিদ্ধ বৈষ্ণব বংশ্য আছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর বর্ণোপেত বৈষ্ণব বংশ্য হইয়াও বঙ্গের প্রতিষ্ঠাপন্ন বহুতর সজ্জাতির গুরু-পদে অধ্যাসীন আছেন—যাঁহারা ব্রাহ্মণোপেত বৈষ্ণব তাঁহাদের ত কথাই নাই। এই সকল গৌড়াদ্য গৃহী বৈষ্ণবের আচার ব্যবহার সর্ব্বাংশে বঙ্গের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের ন্যায়। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল বৈষ্ণবের বিভেদ বিচার (Distinction) মহামতি রিজলি সাহেবের জাতিতত্ত্ব গ্রন্থে আদৌ স্থান পায় নাই। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় বৈষ্ণবের চারি-সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীমধ্বাচার্য্যের বিষয়ও উল্লিখিত হয় নাই। ইহাতে এই অনুমিত হয় যে, বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান না লইয়া কেবল বৈষ্ণব-উপসম্প্রদায়ের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াই বৈষ্ণব-জাতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। নতুবা যে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া বাঙ্গলার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য-প্রবর শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে কোন কথাই

আলোচিত হয় নাই। মিঃ রিজ্‌লি সাহেবের উক্তি এই যে—

" Baishnaba, Baishtab, Bairagi—a religious sect based upon the worship of Vishnu under the incarnations of Rama and Krishna. Founded as a popular religion by Ramanuja in Madras, and developed in Northern India by Ramananda and Kabir ; Vaishnavism owes its wide acceptance in Bengal to the teaching of Chaitanya."

শ্রীমদ্‌ রামানুজাচার্য্যই যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাহা নহে; বৈষ্ণবধর্ম্ম অনাদিসিদ্ধ; বৈদিককাল হইতে ইহার সাম্প্রদায়িক ধারা অব্যাহত আছে। আচার্য্য রামানুজের বহু পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সময়েও বৈষ্ণব যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বঙ্গদেশে বহু বৈষ্ণবের বাস ছিল। শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী-প্রমুখ বৈষ্ণব-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্মের বহুল প্রচার হইয়াছিল। তবে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকটকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক সমগ্র বঙ্গদেশকে এক পবিত্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অতঃপর বঙ্গদেশের বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লী যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে—

" Baishnava, Colloquially Baishtam of Bengal, a class not very easy to define precisely, as the name Vaishnava includes (a) ordinery Hindus who without deserting their original castes, worship Vishnu in preference to other gods (b) ascetic members of the Vaishnav Sect, commonly called Bairagi, (c) Jat Baishtam, Samyogi or Bantasi, an endogamous group formed by the conversion to Vaishnavism of

members of many different castes."

অর্থাৎ বঙ্গদেশে বৈষ্ণব মাত্রেই চলিত কথায় 'বোষ্টম' নামে অভিহিত। ইহাদের সঠিক শ্রেণী নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। যে হেতু (ক) সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও অন্যান্য দেবতা অপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুর প্রাধান্য স্বীকার করেন, তাঁহারাও বৈষ্ণব নামে অভিহিত, (খ) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা সাধারণতঃ 'বৈরাগী' নামে কথিত (গ) এবং জাত-বোষ্টম, সংযোগী বা বাস্তাশী,—বহুবিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তির বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণের ফলেই এই সমগোত্রীয়-সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী সাধারণ হিন্দু জাতি—সামান্য বৈষ্ণব, উহাঁরা বৈষ্ণব জাতি রূপে অভিহিত হইতে পারেন না। উহাঁরা ব্রাহ্মণ-শাসিত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কেবল বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন মাত্র—যেমন ব্রাহ্মণ-শাসিত বর্ণাশ্রমী স্মার্ত্তধর্ম্মের অনুশাসনে অবস্থান করেন। যাঁহারা সংসার-ত্যাগী বৈষ্ণব-উদাসীন তাঁহারা সাধারণতঃ 'বৈরাগী' নামে অভিহিত। এই বৈরাগী-বৈষ্ণব যে শ্রীচৈতন্যদেবের সম-সাময়িক তাহা নহে, বহু প্রাচীন কাল হইতে ইহাঁদের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। বৈরাগীগণ যুদ্ধে নাগা-শৈবদের নিকট পরাজিত হইয়া বহুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং এই জন্যই বাঙ্গলার গৃহী বৈষ্ণবগণকে সাধারণতঃ লোকে, 'বৈরাগী' বলিয়া থাকে। বৌদ্ধ-শ্রমণরাও যে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বন করিয়া প্রথম 'জাত বৈষ্ণব' নামে অভিহিত হন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। বৈষ্ণবদিগের উদ্দেশে "সংযোগী বা বাস্তাশী"—এই দুইটী শব্দ প্রয়োগ বৈষ্ণব-বিদ্বেষপর স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। এই দুইটী শব্দ কোন্ শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ নাই। যাহারা ভজনের অঙ্গ বলিয়া পরনারী-সঙ্গ করে, সেই সকল বৈদিক-বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারী তান্ত্রিক বীরাচারী বৈষ্ণবদিগকে লক্ষ্য করিয়া যদি ঐ দুইটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই। যদি

গৌড়াদ্য-গৃহী-বৈষ্ণব জাতিকেও উহার মধ্যে উদ্দিষ্ট করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ দুইটী অপশব্দ হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয় নাই। আশ্রমান্তর-গ্রহণের পর পুনরায় পূর্ব্বাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে "বান্তাশী" কহে অর্থাৎ বমন করিয়া যে তাহা পুনরায় ভক্ষণ করে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের এইরূপ আরূঢ়-পাতিত্য ঘটিলেই তাহাদিগকে বান্তাশী কহে। কিন্তু ভক্তিধর্ম্মে সেরূপ আশ্রম-বিচার না থাকায় বৈষ্ণবগণকে কদাচ বান্তাশী বলা যায় না। বৈষ্ণব পঞ্চ-সংস্কার পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মচারীরূপে গুরুর নিকট শাস্ত্রাভ্যাস বা ভজন-সাধন-শিক্ষার পর গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বন করিলে কি তাঁহাকে বান্তাশী বলা যায় ? ইহাই ত প্রকৃত বৈদিক আশ্রমাচার পালন। যাঁহারা গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া বেষাশ্রয় (বিষ্ণু-সন্ন্যাস) গ্রহণের পরও বিশেষ নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গৃহস্থাশ্রমে পুনঃ প্রবেশ করেন, তাহাতেও তাঁহাদের ভক্তিধর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। যথা—

"গৃহেম্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং কুশলকর্ম্মণাং।
মদ্বার্ত্তা যাত যামানাং ন বন্ধায় গৃহা মতাঃ॥

গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেই ভক্তি-প্রতিকূল নিরয়তুল্য বিষয়-ভোগে পতিত হইয়া বন্ধের সম্ভাবনা হইবে, তাহা নহে। গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া যদি কুশল-কর্ম্মা হয় অর্থাৎ আমাতে (ভগবানে) কর্ম্মার্পণ করিয়া আমার পরিচর্য্যা কার্য্যে সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত থাকে এবং আমার কথা-প্রসঙ্গে যাম যাপন করে, তাহা হইলে তাহার ভক্তির সঙ্কোচ না হওয়ায় গৃহস্থাশ্রম বন্ধের কারণ হয় না। ফলতঃ মনই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ—

"মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-মোক্ষয়োঃ।" বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।২৮।

বিশেষতঃ চারি আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।

"চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু গার্হস্থ্যং শ্রেষ্ঠমুত্তমম্। রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ড ১০৬।২১।
চত্বারো হ্যাশ্রমাদেব সর্ব্বে গার্হস্থ্যমূলকাঃ।" মহাভারত-শান্তিপর্ব্ব ৩৩৪।২৪।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং হি গৃহস্থঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৭।৩৪৪

বৈষ্ণব তাঁহার ভক্তি-সাধনার অনুকূল বোধেই আশ্রমান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন; সে আশ্রম সাধারণ বর্ণাশ্রম হইতে অনেক উচ্চে—এবং সম্পূর্ণ না হউক অনেক লক্ষণে বিভিন্ন। তাঁহারা পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে বা অপভ্রংশ ঘটিলেও তাঁহাদের পাতিত্য দোষ ঘটিতে পারে না। যথা—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোথ পতেৎ ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং, কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥" শ্রীভাঃ

যাঁহারা বর্ণাশ্রম ও নিত্যনৈমিত্তিকাদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মই ভজনা করেন, ভক্তির পরিপাকে তাঁহারা যদি কৃতার্থ হন, তাহা হইলে ত কথাই নাই, তাঁহারা যদি অপরিপক্ক সাধনাবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন কিম্বা কোনরূপ তাঁহাদের ভ্রংশ ঘটে, তাহা হইলে স্বধর্ম্মত্যাগ হেতু তাঁহাদের কোন অনর্থ উপস্থিত হয় না। ভক্তি-বাসনা সূক্ষ্মরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকায় তাঁহাদের পাতিত্য দোষ ঘটে না। আরও লিখিত হইয়াছে—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনয়কানীকপ-মূর্দ্ধসু প্রভো॥ শ্রীভা ১০।২।২৭

হে মাধব! যাঁহারা আপনার ভক্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অভাবে, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে কিম্বা কোন প্রকার পাতক সম্ভাবনাতেও তাঁহাদের কোনরূপ দুর্গতি হয় না অর্থাৎ তোমার ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হন না। যদি কোনরূপে ভ্রষ্ট হয়েন, ভক্তি-বিঘ্নে অনুতাপ হেতু তাঁহারা আপনারই মহতী কৃপা লাভ করিয়া আপনাতেই সৌহৃদ্যবন্ধন করেন। সুতরাং তাঁহারা আপনা কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া নির্ভয়ে বিঘ্নকারিগণের অধিপতিবর্গের মস্তকোপরি ভ্রমণ করিয়া বেড়ান অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার বিঘ্ন জয় করেন অথবা তাহাদের মস্তককে সোপান করিয়া শ্রীবৈকুণ্ঠ পদে অধিরোহণ করেন।

অতএব হরিভক্তগণের কোনরূপে ভ্রংশ ঘটিলেও যখন পাতিত্য দোষ হয় না, তখন তাঁহাদিগকে কদাচ "বান্তাশী" বলা যাইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি-বিমুখ আশ্রমাচার-পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিই "বান্তাশী"।—বৈষ্ণব নহেন।

বিশেষতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম বা ভক্তিধর্ম্ম বেদ-প্রতিপাদিত মুখ্য ধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম গৌণধর্ম্ম। মুখ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে গৌণ ধর্ম্মের অপেক্ষা থাকেনা। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"যে চাত্র কথিতা ধর্ম্মা বর্ণাশ্রম-নিবন্ধনাঃ।
হরিভক্তি-কলাংশাংশ-সমানা ন হি তে দ্বিজাঃ॥"

হে দ্বিজগণ! বর্ণাশ্রম-বিহিত যে সকল ধর্ম্মের বিষয় এস্থলে কথিত হইল, সেই সকল ধর্ম্ম হরিভক্তির কলাংশের একাংশেরও সমান নহে।

অতএব "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" শ্রীহরিভক্তিই পরোধর্ম্ম বা মুখ্যধর্ম্ম। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম স্বর্গাদি ফলদায়ক, সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণভক্তি প্রদানে অসমর্থ। সুতরাং

'ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলং॥ শ্রীভা ১।২।৮

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণাশ্রম-বিহিত ধর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দ্বারা হরি-কথায় রতি না জন্মে তবে তদ্বিষয়ক শ্রম পণ্ডশ্রম মাত্র।

অতএব শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবকে কদাচ 'বান্তাশী' বলা যাইতে পারে না। বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোথাও বৈষ্ণবের উদ্দেশে এই কথা প্রযুক্ত দৃষ্ট হয় না। প্রধানতঃ পারদারিক পতিত-বৈষ্ণব বা প্রাকৃত সহজিয়াদিগকে লক্ষ্য করিয়াই "সংযোগী" কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু "সংযোগী" যে যোগী বা যুগী জাতির একটী সম্প্রদায় বিশেষ, তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। নতুবা শুদ্ধভক্তিনিষ্ঠ সদাচারী গৃহস্থ বৈষ্ণবদিগের সম্বন্ধে ঐ অপূর্ব্ব উদ্ভট শব্দ প্রয়োগ সম্পূর্ণ অশাস্ত্রীয় ও অযৌক্তিক। বৈষ্ণব স্বীয় পরিজন সকলকে বৈষ্ণব-ভাবান্বিত করিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিদে

পবিত্র আশ্রমের অনুরূপ একটী পারমার্থিক সংসার পত্তন করেন। এই জন্য মুনিঋষিদেরও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ছিলেন। এইরূপে সেই সিদ্ধ বীর্য্যোৎপন্ন বৈষ্ণব বংশধরগণই হিন্দু সমাজে গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব জাতি নামে অভিহিত। জাতি বৈষ্ণব, নাগা বৈষ্ণব মণ্ডলধারী (ইহাঁরা প্রথমে কয়েকখানি গ্রামের বৈষ্ণবকে মণ্ডলী বা সমাজবদ্ধ করিয়া একটী থাকের সৃষ্টি করেন) আট-সমাজী (প্রথম ৮টী-সমাজ লইয়া ইহাদের বৈবাহিক আদান প্রদান আরম্ভ হয়) প্রভৃতি কয়টী বিশিষ্ট-থাকের বৈষ্ণব-গণও এক্ষণে এই গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। নতুবা বাউল, দরবেশ সাঁই, কর্ত্তাভজা, অভ্যাগত এই সকল ভিক্ষুক শ্রেণীর বৈষ্ণব, এবং যাঁহারা বৈষ্ণব-বেশে বড়লোকের বাড়ী খানসামার কার্য্য করেন, যাঁহারা বার-বিলাসিনীদের মধ্যে বৈষ্ণবতা-বিস্তার-ছলে ছড়িদারী ফৌজদারীর কার্য্য করেন, যাঁহারা আসন্ন-মৃত্যু বা মৃত ব্যক্তিকে ভেক দিয়া শ্মশান-বন্ধুর কার্য্য করেন (ডোম-বৈরাগী), যাঁহারা কুলটার আশ্বাসে, সমাজের তাড়নে, ঋণের দায়ে, পেটের দায়ে, ভেক লইয়া (পবিত্র বিষ্ণু-সন্ন্যাসের বেশকে কলঙ্কিত করিয়া) ভণ্ড-বৈষ্ণবের বেশে ধর্ম্মের ভানে অধর্ম্ম সঞ্চয় পূর্ব্বক নিজে নরকস্থ ও অপর দশজন সরল বিশ্বাসী ভাল লোককে নরকস্থ করিতেছে—যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কোন সুরসিক ব্যক্তি শ্লেষ-ব্যঞ্জক বাক্যে কহিয়াছেন—

"পেট-নাদড়া, পুঁজিপড়া, মাগমরা, যমে পোড়া।
মাগীর তাড়া, জাতির হুড়া এ ক'বেটা বৈষ্ণবের গোঁড়া॥"

এই সকল গৌণ-শ্রেণীর বৈষ্ণবগণও জাতি-পরিচয়ে "বৈষ্ণব" বলিয়া অভিহিত হইলেও কিন্তু এক জাতি নহে। যেমন রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, কুলীন, শ্রোত্রীয়, মাহিষ্য-ব্রাহ্মণ, গোপ-ব্রাহ্মণ, শুঁড়ীর ব্রাহ্মণ, ঝল্লমল্লজাতির-ব্রাহ্মণ, মুচির-ব্রাহ্মণ, গ্রহাচার্য্য, ভাট, অগ্রদানী ব্রাহ্মণ সকলে একই "ব্রাহ্মণ" নামে পরিচিত হইলেও প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন জাতি এবং সমাজ ও থাকেও বিভিন্ন. সেইরূপ উল্লিখিত ভিন্ন ভিন্ন গৌণ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গুলিও "বৈষ্ণব" নামে পরিচিত হইলেও তাঁহাদিগকে

ভিন্ন জাতি বুঝিতে হইবে। সুতরাং সামাজিক হিসাবে সদাচারী গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবগণের তুল্য সকলের সমান মর্য্যাদা হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্য নীচকে উদ্ধার করিতে বলিয়াছেন নীচ-সঙ্গ করিতে বলেন নাই। সুতরাং নীচ-কর্ম্মী ও নীচ-সঙ্গীর সঙ্গ হইতে স্বতন্ত্রতা রক্ষাই তাঁহার অভিমত। এই জন্যই সদাচারী গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব জাতি, প্রাগুক্ত গৌণ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সংস্রব হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষণে চিরকালই যত্নশীল। ইহাই শাস্ত্র ও সভ্যজনানুমোদিত চিরন্তন-রীতি। "ফলতঃ বৈষ্ণব-সমাজে যতই শিক্ষার বিস্তার হইবে, যতই ভক্তির মহিমা প্রসারিত হইবে, ততই জাতীয় সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া নানা সদ্‌গুণ-মণ্ডিত তেজঃ-পুঞ্জ বৈষ্ণবমূর্ত্তি সকল মেঘোন্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় জগৎকে আলোকিত করিয়া তুলিবে এবং আসমুদ্র হিমাচল এই ভারত ভূমিতে এক মহাবৈষ্ণব-জাতি সংঘটিত হইয়া সত্যযুগ আনয়ন করিবে।

মিঃ রিজ্‌লি সাহেব লিখিয়াছেন—

"The Baishtam caste includes members of several Vaishnava sects and in theory intermarriage between these sects is prohibited. But if a man of one sect wishes to marry a woman of another sect, he has only to convert her by a simple ritual to his own sect and the obstacles to their union are removed."

বৈষ্ণব-জাতি নির্দ্দেশস্থলে "বোষ্টম"—এই অপশব্দ—এই অর্থহীন ব্যাকরণ-অসিদ্ধ শব্দ—এই বৈষ্ণব শব্দের বিকৃত শব্দ-প্রয়োগ যে একান্ত অযৌক্তিক ও শাস্ত্র-বিগর্হিত তাহা বলাই বাহুল্য। এই বিকৃত-শব্দ-প্রয়োগে পবিত্র-বৈষ্ণব-জাতির উপর যেন একটা বিজাতীয় ঘৃণা-দ্বেষের ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবের জাতিত্ব নিত্যসিদ্ধ ও শাস্ত্র-শুদ্ধ। বৈষ্ণব-শাসিত সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহী বৈষ্ণব একবর্ণ, ব্রাহ্মণ-শাসিত সম্প্রদায়ভুক্ত গৃহী বৈষ্ণব চতুর্ব্বর্ণ। চতুর্ব্বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণ নাই,

এই ভ্রম-অপনোদনের নিমিত্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ১০ম, অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল—

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রা শ্চত্বারো জাতয়ঃ।
স্বতন্ত্রা জাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা॥"

কই, শাস্ত্রে "বৈষ্ণব জাতি" স্থলে "বোষ্টম জাতি" লিখিত হয় নাই ত? সুতরাং বৈষ্ণব জাতি সম্বন্ধে বিশেষ তত্ত্ব না জানিয়াই যে ঐরূপ অযথা মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের মর্ম্মার্থ এই যে,—"বোষ্টম জাতি কতিপয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে বিভক্ত; সুতরাং এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বৈবাহিক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি এক সম্প্রদায়ের লোক অন্য সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে স্ব-সম্প্রদায়-বিহিত সামান্য অনুষ্ঠানের দ্বারা সেই স্ত্রীলোকটীকে সংস্কার করিয়া লইলেই চলে এবং ইহাতেই তাহাদের সমাজের প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।"

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ তিলি, তাম্বূলী প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই সমাজগত ভিন্ন ভিন্ন থাক আছে; যেমন, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, করণ, কায়স্থ, (পূর্ব্ববঙ্গে বৈদ্য ও কায়স্থের মধ্যেও আদান প্রদান আছে) একাদশ, দ্বাদশ তিলি, অষ্টগ্রামী, সপ্তগ্রামী তাম্বূলী প্রভৃতি। জাতি-পরিচয়ে এক হইলেও পরস্পর বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। সম্প্রতি জাতীয় আন্দোলনের ফলে ঐ সকল বিভিন্ন থাকের মধ্যে পরস্পর বিবাহের আদান-প্রদান চলিতেছে। আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেও জাত-বৈষ্ণব, নাগা-বৈষ্ণব, আট-সমাজী মণ্ডলধারী প্রভৃতি সমাজগত কতিপয় থাক আছে বটে, এবং যদিও উহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানও চলিতেছে, বৈদিক-বিধান অনুসারে বিবাহ-সংস্কার ভিন্ন বর ও কন্যা পক্ষে কোনরূপ সমাজ-বৈধানিক অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। অপর গৌণ-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যেই এইরূপ প্রথার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

রিজ্‌লি মহোদয় আরও লিখিয়াছেন—

" Baishtams have no gotras, but they are divided into fifteen Sections (Paribar), * * * Such as Adwaita Paribar, Nityananda Paribar, Acharya Paribar, Syam Chand etc. * * Although these groups are supposed to stand to the Baishtams in the place of gotras, marriage between persons belonging to the same Paribar is not forbidden and the grouping has no more effect on marriage than the quasi-endogamous division into sects referred to above."

ইহার সার মর্ম্ম এই যে,—"বোষ্টমদের গোত্র নাই, কিন্তু তাহারা পঞ্চদশটী বিভাগে (পরিবারে) বিভক্ত। যথা—অদ্বৈত পরিবার, নিত্যানন্দ পরিবার, আচার্য্য পরিবার, শ্যামচাঁদ পরিবার (ইহা সম্ভবতঃ শ্যামানন্দ পরিবার হইবে,) ইত্যাদি। যদিও এই সকল বিভাগ বোষ্টমদের গোত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়, তথাপি উহাদের এক পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে উহাদিগকে প্রায়-সগোত্রে-বিবাহকারী জাতির শ্রেণীভুক্ত করা ভিন্ন পৃথক শ্রেণীভুক্ত করার বিশেষ কোন ফল নাই।"

বৈষ্ণবের গোত্র নাই একথা সর্ব্বৈব শাস্ত্র-বিগর্হিত। চারি সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-সাধারণের ধর্ম্মগোত্র—অচ্যুতগোত্র।" যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

" সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যথা ব্রাহ্মণকুলাদন্যথাচ্যুত গোত্রতঃ॥"

গোত্র সম্বন্ধে বিশদ বিচার ইতঃপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈদিক ঋষি-গোত্রেরও প্রচলন আছে। উক্ত পরিবার সকল কোথাও বৈষ্ণবের গোত্র রূপে উক্ত হয় না। তবে যেখানে প্রবর অজ্ঞাত থাকে, সেই স্থলে কেহ কেহ 'পরিবার' উল্লেখ করিয়া প্রবরের স্থান পূরণ করিয়া থাকেন। কারণ 'প্রবরের' অপভ্রংশই 'পরিবার', ইহাই

কেহ কেহ অভিমত প্রকাশ করেন। গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষির নামই প্রবর; এস্থলে 'অচ্যুত গোত্র' এই ধর্ম্মগোত্রের প্রবর্ত্তকই স্ব স্ব গুরুদেব। এই জন্যই ঋষি-গোত্রের প্রবরের অজ্ঞাতে ধর্ম্মগোত্রের পরিবার উল্লিখিত হয়; যেখানে প্রবর জানা থাকে সেখানে প্রবরই উল্লেখ হয়। প্রবরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মুনিগণ একমত নহেন। কাহারও মতে "যে গোত্র, যজ্ঞকালে যে ঋষিকে বরণ করিতেন, সেই গোত্রের সেই ঋষি প্রবর। আবার কেহ বলেন, যখন এক নামে অনেক গোত্র চলিল, তখন প্রত্যেক গোত্রের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই গোত্রের ব্যাবর্ত্তক প্রধান প্রধান ঋষিকে লইয়া প্রবর স্থির হইল।" ফলতঃ যিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই বংশে বিবাহ করিতে পারিবেন না, ইহাই গোত্র-প্রবর-প্রচলনের উদ্দেশ্য। গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণবগণ সে বিধান সর্ব্বতোভাবে মানিয়া থাকেন।

" পৈতৃষস্ত্রেয়ীং ভগিনীং স্বস্ত্রীয়াং মাতুরেব চ।
মাতুশ্চ ভ্রাতুস্তনয়াং গত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥
এতাস্তি স্রস্ত ভার্য্যার্থে নোপযচ্ছেত্তু বুদ্ধিমান্।
জ্ঞাতিত্বেনানুপেয়াস্তাঃ পতন্তি হ্যপয়ন্নধঃ॥ মনু ১১ অঃ।

পিশতুত, মাশ্‌তুত ও মামাত ভগিনীতে গমন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐ তিন রমণীর পাণিগ্রহণ করিবে না, যে হেতু জ্ঞাতিত্ব ও বান্ধবত্ব প্রযুক্ত ঐ কন্যা অগ্রহণীয়া। যদি কেহ বিবাহ করে সে পতিত হয়।

আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে এ বিধানের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সুতরাং ইহাঁরা যে, উচ্চশ্রেণীর হিন্দু তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে পরিবার নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য কি, তাহা কথিত হইতেছে—

পূর্ব্বোক্ত পরিবার সকলের মধ্যে তিলক রচনার বিশেষ বিভেদ আছে। শিষ্যদের সেই তিলক দর্শন করিয়া—এই শিষ্য কোন্ গুরুর-সম্প্রদায় ভুক্ত, তাহা সহজে নির্ণয় করা যায়। এই ধর্ম্মনৈতিক বিভেদ-নির্দ্দেশের জন্যই পরিবার শব্দের

উদ্ভব হইয়াছে; সুতরাং উহা বৈষ্ণবের গোত্র-জ্ঞাপক নহে। অতএব এক পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হইলেও উহাতে পাতিত্যের আশঙ্কা নাই।

মিঃ রিজ্‌লি মহোদয় বৈষ্ণব-সাধারণ-সমাজকে উদ্দেশ করিয়া আর একটী অসঙ্গত কথা লিখিয়াছেন—

"Outsiders are freely admitted into the community however low their caste may be provided only that they are Hindus. Chaitanya is said to have extended this privilege even to Mahomadans, but since his time the tendency has been rather to contract the limits of the society, and no guru or mathdhari (Superintendent of a monastery) would now venture on such an act."

অর্থাৎ হিন্দু মাত্রেই যতই সে নীচজাতি হউক না কেন বৈষ্ণব-সমাজে অবাধে প্রবেশ করিতে পারে। এমন কি চৈতন্য মুসলমানকেও এই সুযোগ প্রদান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সময় হইতেই সমাজের সীমা অপেক্ষাকৃত সঙ্কুচিত হওয়ায় এরূপ ঘটনা বিরল হইয়া পড়ে এবং কোন গুরু বা মঠধারী এরূপ কার্য্য করিতে কখনও সাহসী হন নাই।"

বৈষ্ণব ধর্ম্ম সনাতন উদার ধর্ম্ম। সাধারণ বর্ণাশ্রমিদের মধ্যে সকল জাতিই বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে। এমন কি মুসলমানও বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুসারে শ্রীভগবানের নাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে পারে। হিন্দুদের মধ্যে যে কোন জাতি শাক্ত, শৈব বা সৌর-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যেরূপ তত্তৎ ধর্ম্ম-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ সকল জাতিই বিষ্ণু বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়-ভুক্ত হন। আর যাহারা অনধিকারী হইয়াও "ভেক" অর্থাৎ বিষ্ণু-সন্ন্যাসের বেশ মাত্র ধারণ করিয়া আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দেয় ইহারা জাতি-পরিচয়ে 'বৈষ্ণব' বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমাদের আলোচ্য গৌড়ীয়-

বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে উঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই। উঁহারা স্বতন্ত্র ভেকধারী কি নেড়ানেড়ী বৈষ্ণব সমাজের কিম্বা বাউলাদি বৈষ্ণব-উপসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে শূদ্র, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেনা। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে আচণ্ডাল সকল বর্ণের অধিকার; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সংকীর্ণতার পরি- বর্ত্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই উদারতাই ঘোষণা করিয়াছেন।

মিঃ রিজ্‌লি যে ভেক-প্রথার বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ ডোর-কৌপীন পরাইয়া তাহার হাতে একটা কোরঙ্গা বা নারিকেল মালা দিবার রীতি লিখিয়াছেন, এ প্রথা গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব সমাজে আদৌ প্রচলিত নাই। গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ন্যায় সদাচার-পরায়ণ ভদ্র-গৃহস্থ। সুতরাং মহা-মতি রিজ্‌লি "বৈষ্ণব জাতি" (Baishnav caste) ও "বোষ্টম জাতি" (Baishtab caste) বলিয়া যে স্বাতন্ত্র্যের রেখা টানিয়া দুইটী পৃথক্ জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে "বৈষ্ণবজাতিই" (Baishnav caste) আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতি। বিবাহাদি বিষয়ে তিনি যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নেড়ানেড়ী, ভেকধারী, সহজিয়া প্রভৃতি সমাজেই পরিদৃষ্ট হয়। তদ্ যথা—

" Baistams profess to marry their daughters as infants, and this may be taken to be the rule of the caste. Although in many instances, it is departed from as might be expected in a community comprising so many heterogeneous elements. sexual-intercourse before marriage is not visited by any social penalties, nor are girls who have led an immoral life turned out of the caste, etc.

অর্থাৎ শৈশব অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়াই বোষ্টম জাতির রীতি। যদিও অনেক স্থলে সমাজে এ প্রথা উঠিয়া যাইবার আশা করা যাইতে পারে; কিন্তু সমাজ এরূপ আরও বহু বিসদৃশ নিন্দনীয় প্রথায় দূষিত। বিবাহের পূর্ব্বে যৌন-সংসর্গ

(ব্যভিচার) কোন সামাজিক অপরাধরূপে দৃষ্ট হয় না কিম্বা দুশ্চরিত্রা কন্যা সকলকে জাতিতে গ্রহণ করাও দোষের বিষয় নয়। তবে তাহাদের বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদিগকে ভেক-পদ্ধতি অনুসারে সংস্কার করিয়া লওয়া হয় মাত্র।"

আমাদের আলোচ্য গৃহস্থ বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে উল্লিখিত দূষণীয় প্রথা আদৌ প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহের অনুরূপ বয়স্কা কন্যারই বিবাহ প্রথা প্রচলিত। এ সমাজে দূষিতা বা পতিতা কন্যা আদৌ গৃহীত হয় না। পরন্তু সমাজের কলঙ্ক ও আবর্জ্জনা বোধে লাঞ্ছিতা ও চির-পরিত্যক্তা হইয়া থাকে। মিঃ রিজ্‌লি আরও লিখিয়াছেন—

"The standard Hindu rituals is not observed in marriage. A guru or gosain presents to Chaitanya flowers and sandal-wood-paste and lays before him offerings of Malsabhog etc. * * * its essential and binding portion is the exchange of flowers or beads, technically known as Kanthi-badal."

"বোষ্টম জাতির বিবাহে প্রচলিত হিন্দু-বিবাহ পদ্ধতি দৃষ্ট হয় না। গুরু কিম্বা গোঁসাই চৈতন্যের উদ্দেশে মালা-চন্দন ও মালসাভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন; সঙ্কীর্ত্তন হয়, বর-কন্যার পরস্পর মালা বদলেই বিবাহ-সংস্কার শেষ। এই জন্য এ বিবাহের চলিত নাম "কণ্ঠীবদল।"

কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব জাতির বিবাহ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ন্যায় যথাশাস্ত্র বৈদিক-বিধানেই সম্পাদিত হয়। যদিও স্মার্ত্তমত ও বৈষ্ণবমত এই মতদ্বৈধ বশতঃ আলোচ্য বৈষ্ণবজাতির বিবাহে আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ও মন্ত্র-প্রয়োগ বিষয়ে কিছু কিছু বিভিন্নতা আছে, তথাপি কোথাও যজুর্ব্বেদ মতে ও কোথাও সামবেদীয় মতেই বিবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যেরূপ অধুনা স্মার্ত্ত

রঘুনন্দনের "উদ্বাহ তত্বানুসারে" ও ভবদেব পদ্ধতি মতেই বঙ্গদেশে প্রায়শঃ বিবাহাদি দশ সংস্কার নিষ্পন্ন হয়, সেইরূপ গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণব সমাজে বৈষ্ণব-স্মৃতিকর্ত্তা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত "সৎক্রিয়া-সারদীপিকা" অনুসারেই বিবাহাদি দশ-সংস্কার সম্পন্ন হইয়া থাকে। গৌড়াদ্য জাতি বৈষ্ণব—জাতি বৈষ্ণবেই আদান প্রদান চলিতেছে। কেহ কোন নূতন "ভেকধারী" বৈষ্ণবকে কন্যাদান করেন না। অতএব মিঃ রিজ্‌লীর উক্ত মন্তব্য যে, আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব সমাজের উদ্দেশে লিখিত হয় নাই, তাহা ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের সংখ্যাধিক্য বশতঃ কেবল তাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সাধারণ ভাবে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; সমাজের বিশেষ তত্ত্ব লইয়া পৃথক্‌ভাবে উহাদের বিষয়ে আলোচনা করিলেই সমীচীন হইত এবং আমাদিগেরও এই অপ্রীতিকর বিষয়ের সমালোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। আমাদের আলোচ্য-সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত নাই। বৈদিক-বৈষ্ণব বিধবাগণ উচ্চ ব্রাহ্মণ-বিধবাদের ন্যায় ব্রতচারিণী। অথচ রিজ্‌লি মহোদয় লিখিয়াছেন—

"Widows may marry again (Sanga) and are in no way restricted in the selection of their second husband."

অর্থাৎ বিধবারা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, এবং তাহাদের দ্বিতীয় স্বামী-পচ্ছন্দ করিতে কোন পণই প্রতিরুদ্ধ হয় না।"

এ প্রথা নেড়ানেড়ী, বাউল, সাঁই প্রভৃতি উপ-সম্প্রদায়েই দৃষ্ট হয়। আরও এই সকল সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের বিবাহ-সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ পরস্পর স্বেচ্ছাকৃত এবং বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইলে স্ত্রী বা পুরুষ উভয়েই আবার বিবাহ করিতে পারে। তাই মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"Divorce is permitted at the option of either party and divorced persons of either sex may marry again."

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-সমাজে বিবাহ একটা চুক্তি মাত্র নহে। ঐহিক পারত্রিক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। সুতরাং বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদ বা বিবাহ বন্ধন-চ্ছেদের পর পুনর্ব্বিবাহ এ সমাজে নাই। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সর্ব্বাংশে বেদাদি শাস্ত্রানুমোদিত। আহার-বিহারাদিও সাত্বিক শাস্ত্রানুগত। বেশ ভূষাও সভ্য ও ভদ্রজনোচিত। বাউল, নেড়ানেড়ী ও কর্ত্তাভজাদি উপ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের আচার-ব্যবহার ও বেশ-ভূষা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। গৌড়াদ্য-বৈষ্ণব জাতির মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি সুশিক্ষিত, কেহ সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত, কেহ বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় কুশলী। এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদিগের মধ্যেই উকীল, মোক্তার, মুন্সেফ, সাব্‌রেজিষ্ট্রার, স্কুল ইন্‌স্পেক্টর, পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর, অধ্যাপক, স্কুল মাষ্টার একাউন্টেন্ট জেনারেল্ (মিঃ জি, সি, দাস—পঞ্জাব) রায়বাহাদুর (রাধাশ্যাম অধিকারী—দাঁতন) জমিদার ও বহুধনশালী ও পদস্থ ব্যক্তি আছেন। সুতরাং শিক্ষিত সভ্যভব্য হিসাবেও এই গৌড়াদ্য বৈষ্ণবজাতি, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ন্যায় ভদ্রজনোচিত সমাদর লাভের যোগ্য বলিয়া এ যাবৎ হিন্দু-সমাজে সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন। নিরক্ষর ব্রাহ্মণ সন্তান যেরূপ শিক্ষার অভাবে স্বীয় সম্মান বিনাশ করিতেছেন, সেইরূপ এই গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব সন্তানগণও শিক্ষা ও সদাচারের অভাবে সাধারণের নিকট হীন-প্রভরূপে অবস্থান করিতেছেন। ইহাঁরা নিতান্ত নিরীহ ও ধর্ম্মভীরু, সাধন, ভজন দেবার্চ্চনাদি ধর্ম্মকর্ম্মে সদাব্যস্ত। মহামতি রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"Although Baistams do not consider it necessary to employ *Brahmans* for religious or ceremonial purposes. The gurus and goswamis who look after the religion of the caste, are in fact usually members of the sacred order."

অর্থাৎ যদিও বোষ্টমগণ, তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে কি বিবাহাদি ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না, তথাপি এই জাতির ধর্ম্ম-

পর্য্যবেক্ষক গুরু ও গোস্বামিগণই সচরাচর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে পুরোহিত নিয়োগের প্রথা থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজে নিজেই পূজা-অর্চ্চনা ও সামান্য সামান্য ক্রিয়াকাণ্ডাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। কোন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলেই কুল-পুরোহিত ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া থাকেন। শূদ্রভাবাপন্ন জাতি-সমাজেই যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে ব্রাহ্মণ-নিয়োগের বিধান প্রচলিত আছে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বৈদিক বৈষ্ণবগণ শূদ্রভাবাপন্ন না হওয়ায় এবং উহাঁরা আবহমান কাল দ্বিজধর্ম্মী বা বিপ্রবর্ণ বলিয়া সর্ব্ববিধ বৈদিক-বিধানে ইহাঁদের অধিকার থাকায় ইহাঁরা ব্রাহ্মণবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রিয়াকাণ্ড স্বয়ং সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কোন বৃহৎ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলেই গোস্বামী বা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিম্বা স্বজাতীয় বৈষ্ণবাচার্য্যকে সেই কার্য্যে বরণ করা হইয়া থাকে। প্রধানতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রয়ী রাঢ়ীয়, কণোজীয়া ও মধ্যশ্রেণী (দাক্ষিণাত্য বৈদিক) ব্রাহ্মণগণই এই বৈষ্ণব-জাতির পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। গোস্বামী বা বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"It follows that Baishtam Brahmans are not received on equal terms by the Brahmans who serve the higher castes and the latter would as a rule decline to eat cooked food which had been touched by a Baistam Brahman."

অর্থাৎ গোস্বামী বা বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ নীচ জাতীয় শিষ্যের বাড়ীতে আহার করেন এবং তাহাদের হস্তস্পৃষ্ট জলপান করেন বলিয়া, উচ্চতর জাতির যাজক-ব্রাহ্মণ সমাজে তুল্যরূপে আদৃত হন না এবং শেষোক্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট অন্নাদি ভোজন করিতে চাহেন না।"

বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্ত বা স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণগণই বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণকে এইরূপ ঘৃণার চক্ষে দর্শন করেন। এ বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণই জগৎপূজ্য,

এবং অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে এই ভেদ বিচার উঠিয়া গিয়াছে। এখন কুলীন ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের মধ্যে পরস্পর যথেষ্ট আদান প্রদান চলিতেছে। এমন কি ব্রাহ্মণ-সমাজও রাঢ়ী ও বারেন্দ্র-ভেদ উঠাইয়া দিতে চাহিতেছেন। কায়স্থ ও অপরাপর জাতি সমূহও স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্মানুরূপ স্থান পাইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। যাঁহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন না, এরূপ অহিন্দু অন্য জাতিকে ভারতের শুদ্ধি-সভা হিন্দু করিয়া লইতেছেন। এত বড় পরিবর্ত্তনের যুগে আলোচ্য বৈষ্ণব-সমাজ যে বিশেষ কিছু একটা নূতন পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছেন, তাহা নহে। বৈষ্ণবের স্থান ও শক্তি অনেক উচ্চে। কেবল শিক্ষার অভাব ও দরিদ্রতাই সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া রাখিয়াছে; এই বৈষ্ণব জাতি-সমাজ স্বীয় ন্যায্য দাবী ও অধিকার পাইবার জন্যই বদ্ধপরিকর।

বৈষ্ণব মাত্রেই যে মৃতদেহ, বাড়ীর উঠানের ধারে সমাহিত করেন, তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব-সমাজে দাহ-প্রথা ও সমাধি-প্রথা—উভয় প্রথাই প্রচলিত আছে এবং সমাধির স্থান স্বতন্ত্র আছে। এই উভয় প্রথাই যে বৈদিক, তাহা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। মিঃ রিজ্‌লি আরও লিখিয়াছেন—

"No regular Sraddh is performed, Chaitanya is worshipped and Malsabhog is offered seven or eight days after death and the relations of the deceased then indulge in a feast to show that the time of mourning is over."

অর্থাৎ বোষ্টমরা যথারীতি শ্রাদ্ধ করে না, মৃত্যুর ৭।৮ দিন পরে চৈতন্যের পূজা ও মালসাভোগ দিয়াই কার্য্য শেষ করে এবং তারপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়রা একটা ভোজ দেয়। ইহাতেই দেখায়, অশৌচকাল গত হইয়া গেল।"

আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি-সমাজে মৃতের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া যথাশাস্ত্র বৈদিক-বিধান অনুসারে মহাপ্রসাদান্নে নির্ব্বাহিত হয়। ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদ ভাবে আলোচিত

হইয়াছে। এই বৈদিক-বৈষ্ণব জাতি পূর্ব্বাপর ব্রাহ্মণবৎ ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব লোক-প্রবাদ মাত্র নহেন—শাস্ত্রোক্ত লক্ষণান্বিত। এই জন্যই আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-জাতি ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-নিষ্ঠ এবং জ্ঞান ও ভক্তি পরায়ণ বলিয়া বিপ্রবৎ ১০ দিন অশৌচ পালন করিয়া থাকেন। এক্ষণে অশৌচ কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। মৃতের প্রতি শোক-প্রকাশ ও সম্মান প্রদর্শনকে অশৌচ বলা যায় না। যেহেতু জননা-শৌচে ত আর শোক-প্রকাশ কি সম্মান প্রদর্শন চলে না! হিন্দুর অশৌচ ওরূপ ধরণের নহে। হিন্দুর জাতীয় জীবনের লক্ষ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ। আধ্যাত্মিক চিন্তাই হিন্দু-জীবনের প্রধান ব্রত। যেরূপ চিত্ত-বৃত্তিতে পরমার্থ চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে, হিন্দুর পক্ষে সেইরূপ চিত্ত-বৃত্তির কালই অশৌচ কাল। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে আছে—

অশৌচ বিচার।

"কৃতোদকং তে ভরতেন সার্দ্ধং
নৃপাঙ্গনা-মন্ত্রি-পুরোহিতাশ্চ।
পুরং প্রবিশ্যাশ্রুপুরিত নেত্রা
ভূমৌ দশাহং ব্যনয়ন্ত দুঃখম্॥ ৭সঃ ২৩ শ্লোক।

রামানুজ তাঁহার ভাষ্যে এই দুঃখ শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অশৌচ "দুঃখম-শৌচম্।" ইহা দ্বারাও দেখা যায়, মৃত ব্যক্তির জন্য শোক-দুঃখাদিতে অভিভূত থাকার কালই অশৌচ কাল। অশৌচ-তত্ত্ব সম্বন্ধে স্মৃতি সংহিতাদির অনেক ব্যবস্থানুসারেও মনে হয়, শোক-দুঃখাদি দ্বারা যাঁহার হৃদয় যে পরিমাণে মোহগ্রস্ত হয় তাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যথা—

"একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদ-সমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলং বেদজ্ঞ নির্গুণো দশভির্দ্দিনৈঃ॥" পরাশর ৫৩ অঃ॥

অত্রি। ৮৩॥

" যথার্থতো বিজানাতি বেদমঙ্গৈঃ সমন্বিতম্।
সকল্পং সরহস্যঞ্চ ক্রিয়াবাং শ্চেন্নসূতকী॥ ৪॥
রাজর্ত্বিগ দীক্ষিতানাঞ্চ বালে দেশান্তরে তথা।
ব্রতিনাং সত্রিনাঞ্চৈব সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ৫॥
একাহস্তু সমাখ্যাতো যোহগ্নিবেদ-সমন্বিতঃ।
হীনে হীনতরে চৈব দ্বি ত্রি চতুরহস্তথা॥ ৬॥ দক্ষঃ॥

পরাশর ও অত্রি উভয়ের মতেই সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিন অশৌচ, কেবল বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের তিন দিন এবং নির্গুণ ব্রাহ্মণের দশ দিন অশৌচ কাল। দক্ষ ঋষির মতে যিনি চারিবেদ ও তাহার ছয় অঙ্গ, কল্প ও রহস্য সহিত সবিশেষ জানিয়াছেন এবং যিনি তদনুরূপ ক্রিয়াবান, তাঁহার অশৌচ হয় না। সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের একদিনে শুদ্ধি, ক্রমশঃ হীনতর ব্রাহ্মণের দুই, তিন বা চারি দিনে শুদ্ধি।

এই সমস্ত ব্যবস্থা দ্বারা দেখা যায়, আত্মজ্ঞানের তারতম্যানুসারেই অশৌচ কালের কম বেশী হইয়া থাকে। স্মৃতি শাস্ত্রের এইরূপ অনেক ব্যবস্থা আছে। বাহুল্য বোধে সে সব বচন উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

শূদ্রের মাসাশৌচ অনেক স্মৃতিরই ব্যবস্থা। কিন্তু ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের অর্থাৎ দ্বিজগণের ন্যায় আচারবান শূদ্রের অশৌচ বৈশ্যবৎ ১৫ দিন।

" শূদ্রানাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাম্।
বৈশ্যবচ্ছৌচ কল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টঞ্চ ভোজনম্॥ মনু ১৪০।৫ অঃ।

স্মৃতি শাস্ত্রের এই সব ব্যবস্থা দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, জ্ঞানের তারতম্যানুসারে শোক মোহাদি দ্বারা যিনি যে পরিমাণে অভিভূত হইবেন, তাঁহার অশৌচ কালও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—যেরূপ মানসিক অবস্থাসম্পন্ন হইলে হিন্দু

জীবনের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যাঘাত হয়, সেই অবস্থাই অশৌচাবস্থা। অশৌচের সহিত মনের সম্বন্ধ, কেবল মাত্র জননাশৌচে জননী ভিন্ন কোন অশৌচেই শরীরের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

যে সময় লোকের চিত্ত শোক, মোহ বা আনন্দাতিশয্যের দ্বারা অভিভূত থাকে, সেই সময়কেই অশৌচ কাল ধরা হয় বলিয়াই, আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে অবস্থা বিশেষে অশৌচ কালের এত ইতর-বিশেষ দেখিতে পাই। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে কয়েকটী স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

" মহীপতীনাং নাশৌচং হতানাং বিদ্যুতা তথা।
গোব্রাহ্মণার্থে সংগ্রামে যস্য চেচ্ছতি ভূমিপঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ৩য়। ২৭।
ঋত্বিজাং দীক্ষিতানাঞ্চ যজ্ঞীয় কর্ম্ম কুর্ব্বতাম্।
সত্রিবতি ব্রহ্মচারি দাতৃ ব্রহ্মবিদাং তথা॥ ৩য়। ২৮।
দানে বিবাহে যজ্ঞে চ সংগ্রামে দেশ-বিপ্লবে।
আপদ্যপি কষ্টায়াং সদ্যঃ শৌচং বিধীয়তে॥ ২৯। ৩য় যাজ্ঞবল্ক্যঃ।
সব্রতী মন্ত্রপূতশ্চ আহিতাগ্নিশ্চ যো দ্বিজঃ।
রাজ্ঞশ্চ সূতকং নাস্তি যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥ পরাশর ২৮।৩ অঃ।

এই সমস্ত স্মৃতি বচনের দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, যে যে স্থানে চিত্ত শোক মোহাদির অতীত অবস্থায় থাকে সেই সেই স্থলে সদ্যাশৌচের ব্যবস্থা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর সংহিতার মতে রাজার সদ্যাশৌচ ব্যবস্থা দেখা যায়। অবশ্য প্রাচীন হিন্দু রাজাদের আদর্শ এখন আমাদের ধারণার অতীত; কাজেই রাজার পক্ষে সদ্যাশৌচ ব্যবস্থার কারণ সহজে লোককে বুঝান কঠিন। কিন্তু এই সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রে অন্যান্য যে সব স্থলে সদ্যাশৌচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে মানসিক অবস্থার সহিতই যে অশৌচের সম্বন্ধ, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। যজ্ঞীয় কর্ম্মরত ও

পুরোহিতাদির যিনি অন্নসত্র দিয়াছেন বা ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রহ্মচারী, দান কার্য্যরত বা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তির অশৌচ হইবে না। কারণ ইহাঁদের চিত্ত আরব্ধ কার্য্যে বা ব্রহ্মচিন্তায় এরূপ বিভোর যে তথায় শোক মোহাদির কোন স্থান নাই। আরব্ধ দান কার্য্যে, বিবাহে বা যজ্ঞে, যুদ্ধে, দেশ-বিপ্লবে, আপৎকালে বা ক্লেশকর অবস্থাতে সদ্যাশৌচ হইবে। কারণ এই সব স্থলেও চিত্ত এরূপ একাগ্রতার সহিত একমুখী থাকে যে শোক মোহাদির আঘাতে চিত্তের সে একাগ্রতা নষ্ট করিতে পারে না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা যায়—যে যে অবস্থায় লোকের চিত্তে স্থৈর্য্য আসিতে পারে না, সেই সেই অবস্থা-প্রাপ্ত লোক সর্ব্বদাই অশুচি। যথা—

"ব্যাধিতস্য কদর্য্যস্য ঋণগ্রস্তস্য সর্ব্বদা।
ক্রিয়াহীনস্য মূর্খস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ॥ ১০২। অত্রি॥৯।৬অঃ।
ব্যসনাসক্ত-চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
স্বাধ্যায় ব্রতহীনস্য সততং সূতকং ভবেৎ॥ ১০৩। অত্রি।
ব্যসনাসক্ত চিত্তস্য পরাধীনস্য নিত্যশঃ।
শ্রদ্ধাত্যাগ-বিহীনস্য ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ॥ ১০।৬অঃ।দক্ষঃ।

অশৌচ জিনিষটী কি তাহা এখন বোধ হয়, অধিক বুঝাইতে হইবে না। অতএব বৈদিক-ব্রহ্মবৈষ্ণবদিগের অর্থাৎ আলোচ্য বেদাচার-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব-জাতির শাস্ত্রানুসারে কোন সূতক-সম্ভাবনা না থাকিলেও লোকব্যবহারতঃ ব্রাহ্মণবৎ ১০ দিন অশৌচ পালনের সদাচার পূর্ব্বাপর প্রচলিত রহিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ইচ্ছামত ৭।৮ দিন বা অনির্দ্দিষ্টদিন অশৌচের ভান করেন, তাঁহাদের হইতে আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবজাতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহা বলাই বাহুল্য।

মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"Baishtams eat cooked food only with people of their own caste, but they take water and sweetmeats from, and smoke out of the same hookah with, men of almost all castes, except Muchis and sweepers."

" অর্থাৎ বোষ্টমগণ কেবল তাহাদের স্বজাতিরই সহিত একত্র অন্ন গ্রহণ করে ; কিন্তু মুচি ও ঝাড়ুদার ভিন্ন প্রায় সকল জাতিরই সহিত এক হুঁকায় তামাক খায় এবং তাহাদের জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করে।"

এতবড় একটা গুরুতর কলঙ্ক সমগ্র বৈষ্ণব-জাতির উপর আরোপ করা সমীচীন হয় নাই। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বজাতি ও আত্মীয় বান্ধবের বাড়ীতেই অন্ন গ্রহণ করেন। হিন্দু-সাধারণ সকল জাতিই এইরূপ অন্ন-বিচার করে। কোন উচ্চতর জাতি নিম্নশ্রেণী জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের অন্ন প্রায় সকল জাতিই খাইয়া থাকে। কিন্তু আলোচ্য বৈষ্ণব-জাতি, বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাক্ত ব্রাহ্মণাদির অন্ন গ্রহণ করেন না। বৈষ্ণবদিগের এই অন্ন-বিচার সাম্প্রদায়িক 'গোঁড়ামী' নহে ; সম্পূর্ণ শাস্ত্র-নীতি। বৈষ্ণব কেন যে বৈষ্ণব ভিন্ন অপরের অন্ন এমন কি অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অন্নও ভক্ষণ করেন না, তাহার কারণ এই যে—

"দুষ্কৃতং হি মনুষ্যস্য সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং।
যো যস্যান্নং সমশ্নাতি স তস্যাশ্নাতি কিল্বিষং॥"

হঃ ভঃ বিঃ ধৃত কৌর্ম্মবচনং।

অর্থাৎ অন্ন মধ্যে মানবের নিখিল পাপ অবস্থিতি করে। সুতরাং যে ব্যক্তি যাহার অন্ন ভোজন করে, সে তাহার পাতক সেবন করিয়া থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্ন ভোজন করেন বলিয়া তাহাতে কোনরূপ পাতক স্পর্শ করিতে পারে না। স্কন্দপুরাণে—মার্কণ্ডেয় ভগীরথ সংবাদে কথিত হইয়াছে—

" শুদ্ধং ভাগবতস্যান্নং শুদ্ধং ভাগীরথীজলং।
শুদ্ধং বিষ্ণুপরং চিত্তং শুদ্ধ মেকাদশীব্রতং॥"

ভাগবতের (বৈষ্ণবের) অন্ন (বিষ্ণুভুক্ত সর্ব্বদ্রব্য) সদাশুদ্ধ। এমন কি সূতকাদি নিষিদ্ধ অবস্থাতেও শুদ্ধ। যথা বিষ্ণুস্মৃতিতে—

শিব বিষ্ণ্বর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নি-পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচারি-যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্॥"

যাঁহার শিবার্চ্চনে দীক্ষা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ শৈব, যাঁহার বিষ্ণু-অর্চ্চনায় দীক্ষা লাভ হইয়াছে অর্থাৎ বৈষ্ণব, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী ও যতিগণের শরীরে অশৌচ থাকে না। ইহারই দৃষ্টান্ত, যথা—গঙ্গাজল, নীচজাতি স্পৃষ্ট হইলেও যেমন অপবিত্র হয় না (অপি চণ্ডালভাণ্ডস্থং তজ্জলং পাবনং মহৎ)—সদাশুদ্ধ। বৈষ্ণব বিষ্ণুকে যাহা সমর্পণ করেন, তাহা নীচকুলোৎপন্ন বৈষ্ণব স্পর্শ করিলেও স্পর্শদোষ সম্ভবে না। বরং ভোজনে দেহ পবিত্র ও পুণ্য হয়। সুতরাং জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবান্ন গ্রহণে কোন পাতিত্যের আশঙ্কা নাই। বিশেষতঃ বৈষ্ণবের পক্ষে বৈষ্ণবান্নই প্রশস্ত।—

"বৈষ্ণবানাং হি ভোক্তব্যং প্রার্থ্যান্নং বৈষ্ণবৈঃ সদা।
অবৈষ্ণবানামন্নন্তু পরিবর্জ্জ্যমমেধ্যবৎ॥ কূর্ম্মপুরাণে

বৈষ্ণব, বৈষ্ণবের অন্ন (ভক্ষ্যদ্রব্যমাত্রকে) প্রার্থনা করিয়া ভোজন করিবেন। অবৈষ্ণবের অন্নকে অমেধ্য অর্থাৎ মলমূত্রবৎ পরিত্যাগ করিবেন। পুনশ্চ স্কান্দে—

"অবৈষ্ণবগৃহে ভুক্ত্বা পীত্বা বাজ্ঞানতোঽপি বা।
শুদ্ধি শ্চান্দ্রায়ণে প্রোক্তা ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা সদা॥"

অজ্ঞানেও অবৈষ্ণবের গৃহে অন্ন ভোজন বা জলপান করিলে চান্দ্রায়ণ দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে; নতুবা তদীয় ইষ্ট কর্ম্ম ও পূর্ত্ত কর্ম্মাদি সকলই নিষ্ফল হইয়া যায়। শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতং॥"

হে রাজন্! যে ব্যক্তির গৃহে শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজিত নাই, তদীয় অন্ন, অভক্ষ্য সদৃশ বলিয়া ভোজন নিষিদ্ধ।

তাই বিষ্ণু স্মৃতি বলেন—

" শ্রোত্রিয়ান্নং বৈষ্ণবান্নং হুতশেষঞ্চ যদ্ধবিঃ।
আনখাৎ শোধয়েৎ পাপং তুষাগ্নিঃ কনকং যথা॥"

তুষানল যেরূপ স্বর্ণের শুদ্ধি-সম্পাদন করে, সেইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের অন্ন, বৈষ্ণবের অন্ন ও হোমাবশিষ্ট হবি, নখ হইতে সমস্ত দেহের নিখিল পাতক শোধন করে।

সুতরাং—

" প্রার্থয়েদ্বৈষ্ণবাদন্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ॥" পদ্মপুরাণ।

বিচক্ষণ ব্যক্তিই সর্ব্ববিধ পাতক হইতে বিশুদ্ধি লাভের নিমিত্ত সযত্নে বৈষ্ণবগণের নিকটে অন্ন প্রার্থনা করিবে, তদভাবে কেবল জলপান করিবে।

আবার শাস্ত্রে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রের অন্ন-গ্রহণ নিষিদ্ধ, কিন্তু শূদ্রদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির অন্ন-ভোজন দোষাবহ নহে। যথা—

" আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাস নাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" মনু ৪ অঃ।

যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, পুরুষানুক্রমে বংশের মিত্র, যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্য কর্ম্ম করে, অথবা দাস অর্থাৎ কৈবর্ত্ত ও নাপিত এবং যে ব্যক্তি আত্মনিবেদন করে, ইহাদের অন্ন ভোজ্য। যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ও যম-সংহিতা ঐ একই কথা প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। ফলতঃ পুরাকালে, আহারাদি বিষয়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় এতটা গোঁড়ামী—এতটা সঙ্কীর্ণতা বা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল না। যে সময় হইতে সমাজে সাম্প্রদায়িক হিংসা-দ্বেষের ভাব প্রবল হইয়া উঠে, সেই হইতেই পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধ ও আহারাদি বন্ধ হইয়া যায়। কালক্রমে যখন বর্ণভেদ কুল পরম্পরাগত হইয়া আসিল, তখনও লোক তপস্যা-বলে বা গুণ ও সদাচার-প্রভাবে উচ্চজাতিতে উন্নীত হইতে পারিতেন। অন্ন-গ্রহণ

ও ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীগণের পাণিগ্রহণ তখন নিষিদ্ধ ছিল না।—

"ত্রিষুবর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাক-ভোজন মেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥" আদিত্য পুরাণ।

আবার অগ্নি পুরাণে বৃষদানাধ্যায়ে লিখিত আছে—

"শূদ্রাস্তু যে দানপরা ভবন্তি,
ব্রতান্বিতা বিপ্রপরায়ণাস্তু।
অন্নং হি তেষাং সততং সুভোজ্যং
ভবেদ্দ্বিজৈ দৃ´ষ্টমিদং পুরাতনৈঃ॥"

অর্থাৎ শূদ্রগণের মধ্যে যাঁহারা দানপর, ব্রতান্বিত ও বিপ্রসেবারত তাঁহাদের অন্ন দ্বিজগণের সুভোজ্য। সে যাহা হউক, বৈষ্ণব যে বৈষ্ণবের অন্ন কেন ভোজন করেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণবের পক্ষে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণের অন্নও বর্জ্জনীয়। কিন্তু বৈষ্ণবের অন্ন, সর্ব্ব বর্ণের এমন কি ব্রাহ্মণেরও উপেক্ষণীয় নহে ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। বেশীদিনের কথা নহে, খৃষ্টীয় ষোড়শ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য সুবর্ণবণিক-বংশীয় শ্রীমদ্ উদ্ধারণ ঠাকুর, মহোৎসবে রন্ধন করিতেন আর শত শত ব্রাহ্মণ সেই প্রসাদান্ন ভোজন করিতেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ সময়ে কুলাচার্য্যগণের প্রশ্নের উত্তরে প্রভু বলিয়াছিলেন—

"প্রভু কহে কখন বা আমি পাক করি।
না পারিলে উদ্ধারণ রাখয়ে উতারি॥
এই মত পরিবর্ত্তরূপে পাক হয়।
শুনিয়া সবার মনে লাগিল বিস্ময়॥
* * * *
সেই দিন হৈতে নিত্য নিত্য মহোৎসব।
আসিয়া মিলয়ে যত আত্মবন্ধু সব॥

প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ ॥” শ্রীচৈতন্যভাগবত।

এইরূপ শাস্ত্রে কত উদার মত রহিয়াছে; কিন্তু সমাজ সে শাস্ত্রানুমোদিত পথে পরিচালিত হইতেছে কি? হইলে সমাজের এতটা দুরবস্থা—এত অধঃপতন ঘটিত না। এখন হিন্দু-সমাজ দেশাচার ও লোকাচারের দাস হইয়া কপটতার তাণ্ডব-তরঙ্গে হাবুডুবু করিতেছে।

অতএব “ অবৈষ্ণবত্বেঽপি বিপ্রাণামপান্নং বৈষ্ণবৈর্বর্জ্জনীয় মিত্যভিপ্রেত্য ” বৈষ্ণব যখন অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণেরও অন্ন ভোজন করেন না, এমন কি “ শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবং ” অবৈষ্ণব বিপ্রকে চণ্ডালের তুল্যরূপেও দর্শন করেন না, সেই ভুবন-পাবনক্ষম পবিত্র “বৈষ্ণব জাতি” মুচি, মুদ্দফরাস ভিন্ন সকল জাতির সহিত এক হুঁকায় তামাক খায়, সকল জাতির স্পৃষ্ট জল ও মিষ্টান্নাদি গ্রহণ করে, ইহা কি কখন সম্ভবপর হয়? এত বড় অশ্রাব্য কলঙ্কের ডালি সমগ্র বৈষ্ণব জাতির মাথায় চাপান বাস্তবিকই কি সঙ্গত হইয়াছে? উক্ত বর্ণনায় কোন এক নিম্নতম শ্রেণীর বৈষ্ণব-উপসম্প্রদায়ের পরিচয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণবগণ স্বজাতি ভিন্ন কাহারও হুঁকায় তামাক খান্ না, এবং ব্রাহ্মণ (নীচ বর্ণের ব্রাহ্মণ, ভাট, অগ্রদানী ও গ্রহাচার্য্যাদি ভিন্ন) কায়স্থ, বৈদ্য, নবশাখ ও চাষীকৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) প্রভৃতি সজ্জাতির বাড়ীতেই জল ও মিষ্টান্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন। মিঃ রিজ্‌লি আরও লিখিয়াছেন যে—

“ Their social standing is low, as the caste is recruited from among all classes of society and large number of prostitutes and people who have got into trouble in consequence of sexual irregularities, are found among their ranks.

অর্থাৎ উহাদের সামাজিক স্থান নিম্নবর্ত্তী; যেহেতু সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্য হইতেই এই জাতির দল পুষ্ট হয় এবং অধিকাংশ বেশ্যা ও বিড়ম্বনা-প্রাপ্ত জারজ-সন্তান ইহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়।”

আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-জাতি সমাজে অবাধ ভেকপ্রথা না থাকায় এবং সমাজের উপেক্ষিতা ও পতিতা গণিকাগণের কি জারজসন্তানগণের প্রবেশাধিকার না থাকায় উক্ত কলঙ্ক এই সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। সুতরাং আলোচ্য বৈষ্ণব-জাতির সামাজিক মর্য্যাদা নিম্নবর্ত্তী নহে। হিন্দু সাধারণ মধ্যে ইহাঁরা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মানিত, পূজিত ও প্রণম্য হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে ভোজনান্তে ব্রাহ্মণেরই ন্যায় ভোজন-দক্ষিণা প্রাপ্ত হন ও উচ্চবর্ণ-সমাজে সসম্মানে সমাদর লাভ করেন। নিরপেক্ষভাবে সকল সমাজের মৌলিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া বৈষ্ণব-সমাজ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, আমাদিগকে এই অপ্রীতিকর আলোচনা করিবার প্রয়োজন হইত না। মিঃ রিজ্‌লি আরও লিখিয়াছেন—

"They have no characteristic occupation, and follow all professions deemed respectable by middle-class Hindus."

অর্থাৎ বৈষ্ণবদের স্বাভাবিক কোন নির্দ্দিষ্ট পেশা নাই, মাধ্যমিক শ্রেণীর হিন্দুগণ যে যে ব্যবসাকে বা বৃত্তিকে সম্মানজনক মনে করে, উহারা সেই সকল বৃত্তিরই অনুবর্ত্তী।"

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, বৈষ্ণবদিগের বৃত্তি সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লীর এই মন্তব্য, হিন্দুশাস্ত্র ও সমাজ আদৌ সমর্থন করেন না। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের ন্যায় বৈষ্ণবেরও স্বাভাবিকী বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণের বৃত্তি—

"অধ্যাপন মধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥" মনু, ১অ,।

অর্থাৎ অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ ইহাই ব্রাহ্মণের স্বাভাবিকী বৃত্তি। বৈষ্ণব বিপ্রবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া বৈষ্ণবেরও বৃত্তি ব্রাহ্মণেরই ন্যায়। বৈষ্ণবও অধ্যয়ন, অধ্যাপন যজন, যাজনাদি করিয়া থাকেন। অনেক

শাস্ত্রজ্ঞ বৈষ্ণবের চতুষ্পাঠী আছে এবং তথায় বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ বালকগণ যথারীতি শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া থাকেন। তাই, বৈষ্ণব-স্মৃতি শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে কথিত হইয়াছে—

"অতোঽধীত্যান্বহং বিদ্বানথাধ্যাপ্য চ বৈষ্ণবঃ
সমর্প্য তচ্চ কৃষ্ণায় যতেত নিজবৃত্তয়ে॥"

অর্থাৎ এইহেতু বৈষ্ণব নিত্য বেদপাঠ করিবেন, শাস্ত্রজ্ঞ হইলে শিষ্যকে অধ্যাপন করাইয়া এবং অধ্যয়ন ও অধ্যাপন শ্রীহরিতে অর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় জীবিকার্থ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

সেই বৃত্তি কিরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা কথিত হইতেছে। যথা—

"ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্ত মমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু নিত্যং যাচ্ঞা স্যাৎ প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং শ্ববৃত্তি নীচসেবনং।
আত্মনো নীচলোকানাং সেবনং বৃত্তিসিদ্ধয়ে॥
নিতরাং নিন্দ্যতে সদ্ভি র্বৈষ্ণবস্য বিশেষতঃ॥" শ্রীভাঃ, ৭ম স্কঃ।

যজন, যাজন, অধ্যয়ন, ও অধ্যাপন এই বৃত্তি চতুষ্টয় দ্বিজাতির পক্ষে নির্দ্দিষ্ট; তন্মধ্যে সকল জাতিই ঋত ও অমৃত দ্বারা মৃত ও প্রমৃত দ্বারা অথবা সত্য ও অনৃত দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, কিন্তু জীবিকার্থ শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে নাই। ঋত শব্দে উঞ্ছ ও শিল বুঝায়, অমৃত শব্দে অযাচিত, মৃত শব্দে যাচ্ঞা, প্রমৃত শব্দে কৃষি, সত্যানৃত শব্দে বাণিজ্য, ও শ্ববৃত্তি শব্দে হীন-সেবা বুঝায়। জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য আপনা হইতে নীচ ব্যক্তির সেবাই নিন্দা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু বৈষ্ণবের পক্ষে নিন্দনীয়। সুতরাং—

পণীকৃত্যাত্মনঃ প্রাণান্ যে বর্ত্তন্তে দ্বিজাধমাঃ।
তেষাং দুরাত্মনামন্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥"

যে দ্বিজাধম স্বীয় প্রাণকে পণ করতঃ জীবিকা সম্পাদন করে (অর্থাৎ চাকরীজীবী) সেই পাপাত্মার অন্ন সেবন করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। অতঃপর শুক্লবৃত্তি অর্থাৎ পবিত্র জীবিকা কথিত হইতেছে—

"প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং যাজ্যাতঃ শিষ্যতস্তথা।
গুণান্বিতেভ্যো বিপ্রস্য শুক্লং তৎ ত্রিবিধং স্মৃতং॥"

শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ৩য়, কাণ্ড।

অর্থাৎ প্রতিগ্রহ দ্বারা লব্ধ যজমান সকাশে প্রাপ্ত ও গুণবান্ শিষ্য সকাশে লব্ধ বিপ্রের পক্ষে (বৈষ্ণবের বিপ্রসাম্য হেতু বৈষ্ণবের পক্ষে) এই ত্রিবিধ শুক্ল (পবিত্র) জীবিকা নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই সকল বৃত্তি যে কেবল শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট, তাহা নহে। আমাদের আলোচ্য বৈদিক-বৈষ্ণব-জাতির অধিকাংশ উপরোক্ত ত্রিবিধ শুক্ল-বৃত্তির উপরই জীবিকা নির্ভর করিয়া আছেন। মৃত, (ভিক্ষা) প্রমৃত (কৃষি) ও সত্যানৃত (বাণিজ্য) জীবিকার্থ এই তিনটীও অনেকের অবলম্বনীয়। সুতরাং বৃত্তি-অনুসারেও এই বৈষ্ণবজাতি যে হীন-ভাবাপন্ন নহেন, তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তবে দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাবই এই জাতি-সমাজকে অপেক্ষাকৃত হীনপ্রভ করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান অন্ন-সমস্যার কালে অন্যান্য উচ্চবর্ণের ন্যায় শিক্ষিত জাতি বৈষ্ণবগণের চাকরীই (যদিও চাকরী শ্ববৃত্তি) যে প্রধান উপজীব্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

মেদিনীপুর জেলায় আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্যবৈদিক বৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্য ও তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট আচার ব্যবহার দর্শনে মহামতি মিঃ রিজলি অবশেষে লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন—

In the district of Midnapore the organization of the Baishtam caste seems to differ in some points from that

described above. Two endogamous classes are recognized—(1) *Jati Baishnab*, consisting of those whose conversion to Baishnavism dates back beyond living memory, and (2) Ordinary Baishnabs, called also "Bhekdhari" or wearers of the garb, who are supposed to have adopted Vaishnavism at a recent date.

অর্থাৎ মেদিনীপুর জেলায় বৈষ্ণব জাতির উৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ হইতে কোন কোন বিষয়ে বিভিন্ন বোধ হয়। এই সব গোত্রভুক্ত জাতির দুইটী শ্রেণীভেদ আছে। ১ম, "জাতি-বৈষ্ণব"—যাঁহারা স্মরণাতীত কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন ২য়, "ভেকধারী"—যাঁহারা অধুনাতন কালে বৈষ্ণব হইয়াছেন।

প্রথমোক্ত জাতি-বৈষ্ণবগণ সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

The former are men of substance, who have conformed to ordinary Hinduism to such an extent that they are now Baishnabs in little more than name. In the matter of marriage they follow the usages of the Nabasakha: they burn their dead, mourn for thirty days, celebrate the Sradha and employ high-caste-Brahmans to officiate for them for religious and ceremonial purposes. They do not intermarry or eat with the Baishnabs who have been recently converted.

অর্থাৎ এই শ্রেণীর বৈষ্ণবগণ এক্ষণে নামে মাত্র বৈষ্ণব, কিন্তু প্রায়শঃ সাধারণ হিন্দুদের ন্যায় ভাবান্বিত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ-সম্বন্ধে উহারা নবশাখদের মতই ব্যবহার অনুসরণ করে; উহারা মৃতদেহ দাহ করে, ৩০ দিন অশৌচপালন করে, শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে এবং উহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে এবং শ্রাদ্ধাদি

অনুষ্ঠানে, উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হয়। যাহারা সম্প্রতি বৈষ্ণব হইয়াছে, সেই সকল বৈষ্ণবদের সহিত উহারা বৈবাহিক আদান-প্রদান বা আহার করে না।”

কেবল মেদিনীপুর জেলাতেই যে বৈষ্ণবজাতির এইরূপ শ্রেণীভেদ আছে, বাঙ্গলার আর কোন জেলায় নাই—এ কথা কতদূর সঙ্গত? মেদিনীপুরে যাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ রিজ্‌লি “জাতি-বৈষ্ণব” আখ্যা দিয়াছেন, ঐ শ্রেণীর বৈষ্ণব বাঙ্গলার সকল জেলাতেই আছেন। বিশেষ অনুসন্ধান করিলে এ বাক্যের সত্যতা সহজেই উপলব্ধি হইবে। বরং মেদিনীপুরের উক্ত জাতি বৈষ্ণবদিগের আচার-ব্যবহার অপেক্ষা হুগলী, হাবড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার জাতি বৈষ্ণব অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণবজাতির আচার-ব্যবহার সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ও অন্যান্য বৈষ্ণব-সমাজের অনুকরণীয়। মেদিনীপুরের জাতি বৈষ্ণবগণ বিবাহ বিষয়ে নবশাখের মত আচার অনুসরণ করেন; কিন্তু প্রাগুক্ত জেলার বৈষ্ণবগণ সর্ব্ব বিষয়ে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার অনুসরণকারী। বিবাহের অঙ্গ—গাত্রহরিদ্রা, পত্রকরণ, অব্যূঢ়ান্ন, অধিবাস, নান্দীমুখ, বরযাত্রী, জামাতৃবরণ, স্ত্রী-আচার, সপ্তদীপদান, সাতপাক, মাল্যদান, সম্প্রদান, বাসর, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগমন, ফুলসজ্জা, অষ্টমঙ্গলা পাকস্পর্শ প্রভৃতি বৈবাহিক আচারগুলি যথাযথ পালন করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের জাতি-বৈষ্ণবগণ সকলেই যে নবশাখের অনুবর্ত্তী, তাহা বিশ্বাস করা যায় না; আমরা বিশ্বস্তরূপেই অবগত আছি, অনেক সদাচারী জাতি-বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার-ব্যবহার অনুসরণ করেন। যাঁহারা অশিক্ষিত—যাঁহাদের সামাজিক বা নৈতিক আচার-ব্যবহার ক্রমশঃ অবনতির পথে ধাবিত হইতেছে, তাঁহাদের মধ্যেই ঐরূপ বিসদৃশ আচার-ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। আবার মেদিনীপুরের জাতি বৈষ্ণবগণ যদি শূদ্রের ন্যায় ৩০ দিনই অশৌচ পালন করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে,

তাঁহারা বিবেক-বুদ্ধি হারাইয়া অধঃপাতের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন। যদি "বৈষ্ণব" বলিয়া জাতি-পরিচয়ই দিয়া থাকেন, তবে শূদ্রের ন্যায় আচরণ কেন? বৈষ্ণব যে শূদ্র নহেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার গৌড়াদ্য-বৈদিক-বৈষ্ণবগণ অনেক উচ্চে অবস্থিত।

সৎকুলী ও অনন্তকুলী নামে গৃহি-বৈষ্ণব সম্প্রদায় উড়িষ্যা জেলায় এবং বঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় ও মান্দ্রাজের গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত আছে। সৎকুলী বৈষ্ণবেরা আপনাদের কৌলিন্য-খ্যাপনের নিমিত্ত, যে জাতি হইতে বৈষ্ণব হইয়াছেন, সেই পূর্ব্বজাতি-পরিচয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব, কায়স্থ-বৈষ্ণব, খণ্ডাইৎ-বৈষ্ণব মাহিষ্য-বৈষ্ণব ইত্যাদি পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল বৈষ্ণবও অচ্যুতগোত্র বলিয়া থাকেন, কিন্তু বিবাহে স্বজাতীয় অথবা স্বজাতি-বৈষ্ণবের কন্যা ব্যতীত অন্য জাতীয় বৈষ্ণবের কন্যা গ্রহণ করেন না। আর যাঁহারা অনন্তকুলী—তাঁহাদের মধ্যে বিবাহের কোনরূপ বন্ধন নাই। তাঁহারা সকল কুলোৎপন্ন বৈষ্ণবের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। এজন্য সৎকুলীরা অনন্তকুলীদিগকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখেন। . এই অনন্তকুলী বৈষ্ণবগণ অধিকাংশ পূর্ব্বোক্ত "ভেকধারী" বৈষ্ণবদের অন্তর্গত বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু বলাই বাহুল্য, জাতি-বৈষ্ণব বা গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্ত সৎকুলী ও অনন্তকুলী বৈষ্ণবদের হইতে পৃথক শ্রেণীভুক্ত। মিঃ রিজ্‌লি এই অনন্তকুলী বা ভেকধারী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The latter are described to me by a correspondent as—" the scum of the population. Those who are guilty of adultery or incest and in consequence find it inconvenient to live as members of the castes to which they can by so doing place themselves beyond the pale of the influence of the headmen of their castes, and secodly, because their con-

version removes all obstacles to the continuance of the illicit or incestuous connexions which they have formed."

অর্থাৎ শেষোক্ত ভেকধারী বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে যে পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহার মর্ম্ম এই—ভেকধারী বৈষ্ণবগণ জনসমাজের আবর্জ্জনা স্বরূপ। যাহারা ব্যভিচার-দুষ্ট এবং যাহারা স্বীয় জাতি-সমাজভুক্ত হইয়া থাকিবার কোন সুযোগ পায় না, তাহারা বৈষ্ণব হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের দুইটী সুবিধা হয়। প্রথম, তাহারা স্বজাতি-সমাজ-কর্ত্তাদের শাসনদণ্ডের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বসে। দ্বিতীয়তঃ তাহারা যে ব্যভিচার-সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা তখন অবাধগতিতে চলিতে থাকে।"

এই অনস্তকুলী ভেকধারী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের আমাদের আলোচ্য বৈদিক বৈষ্ণব-সমাজে সহজে প্রবেশ করিবার সুযোগ না থাকায় উঁহারা যে পৃথক্ শ্রেণী-ভুক্ত হইয়া রহিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। অন্যান্য জেলা অপেক্ষা মেদিনীপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর প্রভুপাদ গোস্বামিগণের সম্বন্ধে মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"The Gosains or "Gentoo Bishops" as they were called by Mr. Holwell, have now become the hereditary leaders of the sect. Most of them are prosperous traders and money-lenders, enriched by the gifts of the laity and by the inheritance of all property left by Bairagis. They marry the daughters of Srotriya and Bansaja Brahmans and give their daughters to kulins, who, however, deem it a dishonour to marry one of their girls to a gosain. * * * The Adwaitananda Gosains admit to the Vaishnava community only Brahmans, Baidyas and member of those castes

from whose hands a Brahman may take water. The Nityananda on the other hand * * * open the door of fellowship to all sorts and conditions of men be they Brahmans or Chandals, high caste-widows or common prostitutes. The Nityananda are very popular among the lower castes. * *

অর্থাৎ গোস্বামিগণ (মিঃ হল্ওয়েল গোস্বামিগণকে "জেণ্ট্ বিশপ" অর্থাৎ প্রধান পাদ্রী বলিয়াছেন) বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পুরুষানুক্রমে নেতা বা পরিচালক। ইহাঁদের অধিকাংশ প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও মহাজন, বৈরাগীদের ত্যক্ত-সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে এবং তাঁহাদের দানেই ইহাঁরা প্রভূত ধনশালী। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ও বংশজ ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করেন, কিন্তু নিজেদের কন্যা কুলীনে দান করেন। অথচ কুলীনরা গোস্বামিদের ঘরে কন্যার বিবাহ দিতে অগৌরব বোধ করেন। অদ্বৈতানন্দ গোস্বামী প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ যাহাদের হাতে জলগ্রহণ করিতে পারেন, এমন সজ্জাতিকেই কেবল বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশাধিকার দিয়াছেন। পক্ষান্তরে নিত্যানন্দ গোস্বামী সকল অবস্থার সকল রকম জাতির জন্যই বৈষ্ণব-সমাজের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন—তা' তাহারা ব্রাহ্মণই হউক, কি চণ্ডালই হউক, উচ্চ বর্ণের বিধবাই হউক অথবা সামান্য বেশ্যাই হউক। সুতরাং নিত্যানন্দ সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর লোককেই বৈষ্ণবধর্ম্মে অবাধে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন।"

এই যে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপেক্ষা শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অধিক গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে, ইহার মূলে কতটুকু সত্য নিহিত আছে, সে বিচার প্রভুপাদগণই করিবেন। উক্ত বর্ণনা-পাঠে বুঝা যায়, না কি? একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষভাব সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ধূমায়িত হইয়া রহিয়াছে। দীনদয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের উদারতার মধ্যে যে মহাপ্রাণতা—যে বিশ্বমানবতার আদর্শ মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, সেইটীই এখন অনেক সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তির বিদ্বেষের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বৈদেশিকের পক্ষে এদেশের সামাজিক রীতি-

নীতি সঠিকরূপে অবগত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এ দেশের "হাযবড়া সমঝ্-দারগণ" খেয়ালের বশে যাহা নিজে ভাল বুঝেন তাহাই উচ্চ-রাজকর্ম্মচারিদের কর্ণগোচর করেন, আর তাঁহারা বিশেষ তথ্য না লইয়া তাঁহাদের কথাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অবিকল লিপিবদ্ধ করেন। ইহাতেই বৈষ্ণব-জাতি সম্বন্ধে এত বিভ্রাট ঘটিয়াছে। মিঃ রিজ্‌লি লিখিয়াছেন—

"Who join the Vaishnava-communion pay a fee of twenty annas, sixteen of which go to the Gosain and four to the fouzdar."

বৈষ্ণব-সমাজে প্রবেশ ফিঃ (fee) ১।০ কুড়ি আনা, তন্মধ্যে ষোল আনা গোঁসাইয়ের প্রাপ্য, আর ফৌজদারের প্রাপ্য চারি আনা।" এরূপ প্রথা নেড়ানেড়ী, ভেকধারী-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই প্রথা গৌড়াদ্য-বৈদিক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রচলিত না থাকায় আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

—:(*):—

বিংশ উল্লাস।

---:০:---

উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব।

এই সকল উপসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব, বিশুদ্ধ বৈদিক-বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। ইঁহাদের অধিকাংশই স্বকপোল-কল্পিত মতানুসরণ করিয়া থাকেন। ইঁহাদের ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মপথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত বা প্রবর্ত্তিত নহে। তন্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মিশ্রণে এক একটী অভিনব আকারে রূপান্তরিত।

উদাসীন বৈষ্ণব।

ইহাঁরা জাতি-বৈষ্ণব বা গৃহী বৈষ্ণব হইতে পৃথক্। অথচ গোস্বামীদের শাসনাধীন। আত্মীয়-বান্ধবহীন, বিধবা, নিষ্কর্ম্মা ও বয়স্কা গণিকাগণই এই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের দল পুষ্টি করে। ভিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের আখ্‌ড়া আছে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীগণ একত্র ভাই-ভগিনীর ন্যায় বাস করে। একত্র গাঁজা খায়। ইহাদের সন্তানাদি দেখা যায় না। প্রাচীন গৌড় নগরের মধ্যে রূপ-সয়ার নামক বৃহৎ জলাশয়ের তীরে প্রতি বৎসরই জুন মাসে "রাসমেলা বা প্রেমতলা" নামে এই বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের একটী বৃহৎ মেলা বসে। বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু বৈরাগী ও বৈরাগিণী এই স্থানে সমবেত হয়। বৈষ্ণবীরা ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বসে। কোন বৈরাগীর বৈষ্ণবী প্রয়োজন হইলে ফৌজদারের নিকট যথারীতি ১৷০ আনা জমা দিয়া বৈষ্ণবী পছন্দ করে। অপছন্দ হইলে পুনরায় ১৷০ আনা জমা দিয়া দ্বিতীয়বার পছন্দ করে। একবার পছন্দ করিয়া গ্রহণ করিলে কোন বৈরাগী, সেই বৈষ্ণবীকে এক বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ মেলার পূর্ব্বে ত্যাগ করিতে পারিবে না, ইহাই এই সমাজের নিয়ম।

বাঁয়া কৌপীন।

এই সম্প্রদায়িরা কটীদেশের বামদিকে কৌপীনের গ্রন্থিবন্ধন করে। একদা গুরু, এক শিষ্যের বেশাশ্রয়কালে ভুল বশতঃ কৌপীনের গ্রন্থি দক্ষিণ কটিতে না বাঁধিয়া বামভাগে বন্ধন করেন। পরে সেই ভুল সংশোধন করিতে যাইলে, শিষ্য বলিল—"শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন পূর্ব্ব হইতেই এরূপ ভ্রান্তি-বিধান করিয়াছেন, তখন ইহার আর সংশোধনের প্রয়োজন নাই।" এইরূপে এই শিষ্য হইতেই বাঁয়া-কৌপীন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ইহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। ইহারা মাছ, মাংস ভক্ষণ কি মদ্যপান করে না। মাত্র সচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকই ইহাঁদের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে পারে।

কিশোরী-ভজনিয়া বা সহজিয়া।

এই সম্প্রদায়ের মত বড়ই নিগূঢ়। ইহাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ জগৎপতি, জীব মাত্রেই তাঁহার শক্তি শ্রীরাধিকা। যিনি গুরু, তিনি কৃষ্ণ—শিষ্যগণ—রাধিকাস্বরূপ। স্বকীয় ও পরকীয় ভেদে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগরূপ রসাশ্রয়ই ইহাদের সাধন। ইহারা রাধাকৃষ্ণের অনুরূপ রাসলীলা করিয়া থাকে। হায়! প্রকৃত সদ্-গুরুর পদাশ্রয়ে অপ্রাকৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব না জানিবার ফলেই বৈষ্ণব নামের কলঙ্ক স্বরূপ এই উপসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা ভজন সাধনের ভানে ইন্দ্রিয়বৃত্তির চরিতার্থতা করিয়াই আপনাকে সিদ্ধ মহাত্মা মনে করে। বাহ্যিক তিলক, মালা ধারণ ও ভিক্ষাও করে। ফলতঃ মনে হয়, ইহা "রাধাবল্লভী" সম্প্রদায়েরই একটী শাখা-বিশেষ কিম্বা স্পষ্টদায়ক সম্প্রদায়েরই একটী রূপান্তর শাখা। ইহাদের মধ্যে উদাসীন দেখা যায় না। গুরু 'প্রধান' নামে অভিহিত। এই প্রধানই সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ের পরিচালক। বহু নীচ জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ এবং বহু কামুক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইহাদের সম্প্রদায়ে জাতিভেদ নাই, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমান। ইহারা "হংস" মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। শিষ্যকে উলঙ্গ স্ত্রীলোকের নিকট স্বীয় কামেন্দ্রিয় সংযমের অগ্নি-পরীক্ষা দিতে হয়। বোম্বাইয়ের মহারাজার রাসমণ্ডলীতে ইহাদের একটী

প্রধান উৎসব হয়। মৎস্যাদ-ভোজনই এই উৎসবের অঙ্গ। তবে মদ্য, মাংস ব্যবহার নিষিদ্ধ।—ভোজনান্তে রাধা-লীলাবিষয়ক সঙ্গীত হয়। এই সময়েই গুরু শিষ্যের মধ্যে দশা প্রাপ্তি ঘটে। তারপর প্রধান বা "গুরু" একটী সুন্দরী শিষ্যাকে রাধিকা স্বরূপে মনোনীত করেন। অনন্তর অন্যান্য শিষ্য শিষ্যা সকল পুষ্প চন্দনে সেই গুরু-শিষ্যা যুগলকে বিভূষিত করে এবং তাহাদের উভয়কে রাধাকৃষ্ণ জ্ঞানে ভক্তি করে। এই সকল ভ্রষ্টাচারীর দলই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজের আবর্জ্জনা স্বরূপ।

জগৎমোহনী সম্প্রদায়।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার মাছুলিয়া গ্রামের জগন্মোহন গোঁসাই নামক এক রামাৎ বৈষ্ণবই এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। জগন্মোহনের শিষ্য গোবিন্দ, গোবিন্দের শিষ্য শান্ত, শান্তের শিষ্য রামকৃষ্ণ গোঁসাই হইতেই এই সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হয়, ইহারা স্ত্রী-সঙ্গী নহেন। ইহারা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, ইহাদের মতে গুরুই সে পূর্ণব্রহ্ম। গৃহী ও উদাসীন ভেদে দুই শ্রেণীর সাধক আছে। বাহ্যিক আচার-ব্যবহারের দিকে ইহাদের ততটা লক্ষ্য নাই। অন্তরে অন্তরে গুরুভক্তি ও ব্রহ্ম নাম গ্রহণ করেন। এই সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ ধর্ম্মগ্রন্থ নাই। সঙ্গীত ও গুরু-পরম্পরা উপদেশই প্রধান অবলম্বন। আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিকে তাহার প্রাণ-প্রয়াণের পূর্ব্বে সমাধিগর্ত্তের মধ্যে আনয়ন করা হয়, সেই অবস্থায় তথায় তাহার মৃত্যু পরম সৌভাগ্যের বিষয়, ইহাই এই সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস।

স্পষ্টদায়ক-সম্প্রদায়।

সৈদাবাদের কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শিষ্য রূপরাম কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা রাধাকৃষ্ণের উপাসক হইলেও ইহাদের মধ্যে অন্যান্য উপসম্প্রদায়ের ন্যায় নৈতিক অবনতি দেখা যায় না। ইহারা স্ত্রীলোকের দ্বারা রন্ধন করা অন্নাদি গ্রহণ করে না। ইহারা আচণ্ডাল সকলকেই মন্ত্রদীক্ষা দেন, বটে, কিন্তু সকলকে ভেক দেন না। ইহাদের হস্তস্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণেও ব্যবহার করিতে পারেন।

ইহারা নীচ অন্ত্যজ ও বেশ্যার ভিক্ষা বা দান গ্রহণ করেন না, কিম্বা মাছ মাংসও ভক্ষণ করেন না। ভেকধারী বৈরাগী বৈষ্ণবদের অন্নাহার ইহাদের আচার-বিরুদ্ধ। ইহারা এক কণ্ঠী মালা ও নাসাগ্রে ক্ষুদ্র তিলক ধারণ করেন এবং বাহু, বক্ষঃ ও স্কন্ধে "হরেকৃষ্ণ" ইত্যাদি নামের ছাপ অঙ্কন করেন, স্ত্রীলোকেরা মস্তক মুণ্ডন করিয়া শিখা মাত্র ধারণ করেন। ইহারা মৃতদেহ উপবিষ্ট-অবস্থায় নামাবলী-বস্ত্র-মণ্ডিত করিয়া সমাহিত করেন এবং মৃতের জপ-মালা ও দণ্ড, করঙ্গাও পার্শ্বে স্থাপন করেন। সমাধির উপর আখ্‌ড়া ঘর বা মন্দির নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

কবীন্দ্র-পরিবার।

ইহা একটী ক্ষুদ্র সম্প্রদায়। বিষ্ণুদাস কবীন্দ্র এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহাঁকে কেহ কেহ ৬৪ মহান্তের একতম বলিয়া থাকেন। বিষ্ণুদাস অত্যন্ত দীনভক্ত ছিলেন, শ্রীমহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ প্রসাদে তাঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। একদা গুরুদেব পাত্রে ভুক্তাবশেষ কিছুই রাখিলেন না, বিষ্ণুদাস অনন্যোপায় হইয়া অবশেষে শ্রীচৈতন্যের নিষ্ঠাবনের সহিত প্রসাদান্ন-কণা দেখিতে পাইয়া নিষ্ঠাপূর্ব্বক তাহাই গলাধঃকরণ করিলেন। অথচ তাহা যে রক্ত-রঞ্জিত ছিল, এ কথা কাহাকেও জানাইলেন না। কিন্তু তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী শিষ্য এই ব্যাপার দেখিয়া বিষ্ণুদাসকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট এক প্রশ্ন উত্থাপন করিলেন—"কোন শিষ্য স্বীয় গুরুর রক্তপান করিলে তাহাকে কি করা কর্ত্তব্য ?" শ্রীচৈতন্যদেব বলিলেন—"তাহাকে সম্প্রদায় হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।" এইরূপে কবীন্দ্র মূল-সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইলে আর তাহাকে গ্রহণ করা হয় নাই। অবশেষে বিষ্ণুদাস স্বীয় নামে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন। কবীন্দ্র সম্প্রদায়ীরা সাধারণ বৈষ্ণবদের মত আচার-পরায়ণ। মহান্তের পদ কেহ বংশানুক্রমে প্রাপ্ত হন্ না, শিষ্যদের কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ে উদাসী বা বৈরাগী নাই। সকলেই গৃহস্থ। শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতে

সকল জাতিই এই সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়া থাকে।

বাউল-সম্প্রদায়।

ইহা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক-সম্প্রদায়েরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। বাউল, উদাসীন-শ্রেণীভুক্ত; ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ নাই। ইহারা মূল বা প্রধান বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হইতে পৃথকীভূত। প্রধানতঃ নীচ জাতীয় লোকই এই সম্প্রদায়ের দলপুষ্টি করে এবং তাঁহারা আপনাদিগকে নিত্য, চৈতন্য, হরিদাস, বাউল ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন। বাতুল শব্দের অপভ্রংশই বাউল। এই জন্য এই সম্প্রদায়ী কেহ কেহ নিজেকে "ক্ষ্যাপা" বলিয়াও পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ও সামাজিক বিষয় লইয়া পরস্পর কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। ইহারা গোস্বামিগণের দোহাই দেন, বটে, কিন্তু গোস্বামী শাস্ত্রের মতানুবর্ত্তী নহেন। ইহারা মদ মাংস খান না, কিন্তু মাছ খাওয়া ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে। ইহারা গাঁজা ও তামাকের অত্যন্ত ভক্ত। ইহারা দাড়ী গোঁপ কামান না এবং মস্তকের চুল বড় করিয়া রাখেন। ইহাঁদের কোন কোন আখড়ায় নাড়ুগোপাল, কোন আখড়ায় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের খড়ম পূজিত হইয়া থাকেন। বাউলসম্প্রদায় সর্ব্বাংশে ব্যভিচার-প্রসূত; এজন্য সম্ভ্রান্ত হিন্দুদিগের চক্ষে অত্যন্ত ঘৃণিত ও হেয়।

এই সম্প্রদায়ের সাধন-পদ্ধতি অতীব গুহ্য, উহা পুস্তকে প্রকাশ করা যায় না। "যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা' আছে ভাণ্ডে" (দেহে) এই মতই ইহাদের "দেহতত্ত্ব।" আর এক একটী প্রকৃতি বা স্ত্রীলোক লইয়া ইন্দ্রিয়-পরিচালন করাই সাধন। শোণিত, শুক্র, মল, মূত্র পরিত্যাগ না করিয়া গ্রহণের নামই "চারিচন্দ্র-ভেদ"। ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গীত এই প্রকৃতি-সাধন ও দেহতত্ত্ব লইয়া সাঙ্কেতিক বাক্যে গীত হয়। সহজে অর্থবোধ করা যায় না। ইহাঁরা পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা ধারণ করেন। ভিক্ষাই ইহাঁদের প্রধান উপজীবিকা। আলখেল্লা, ঝুলি, লাঠি ও কৌপিন ইহাঁদের বেশভূষা। শ্রীমহাপ্রভুর ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক যে এই ধর্ম্মমত, তাহা বলাই বাহুল্য। ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়েরই

অনুরূপ। ইহাদের আলখেল্লার নাম "চিন্তাকন্থা"—ইহা প্রকৃতি-সাধন সংক্রান্ত অপবিত্র গুহ্যপদার্থে রঞ্জিত। বাহ্যিক আচারও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও লৌকিক-আচার-বিরুদ্ধ।

দরবেশ, সাঁই সম্প্রদায়।

১৮৫০ খৃঃঅব্দে ঢাকার উদয় চাঁদ কর্ম্মকার কর্ত্তৃক দরবেশ-সম্প্রদায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীপাদ সনাতন গৌড়ের বাদসাহের দরবার ত্যাগ করিয়া ফকির বেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টান্তেই এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। প্রকৃতি-সহযোগে ইন্দ্রিয়ভোগই ইহাদের সাধন। ইহারা বিগ্রহ-সেবা করেন না, গাত্রে আলখেল্লা ও ডোর-কৌপীন ব্যবহার করেন। ইহাদের আচরণ বাউল ও স্নাড়াদেরই অনুরূপ। দরবেশীরা " দীন দরদী " নাম উচ্চারণ করেন। বজ্রফল স্ফটিক ও প্রবালের মালা ধারণ করেন। ঐ মালার নাম তসবী। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। মুসলমানদের সহিত সঙ্গ করেন। ইহাঁরা বলেন—

" কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল জুল্‌কে কর সাঁইজীকা কাম॥"

সাঁই সম্প্রদায়ীরা সুরাপান ও মহামাংসাদিও গ্রহণ করেন। ইহাঁদের ধর্ম্ম, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম মিশ্রিত। ইহাঁরা " মুরসীদ সত্য " এই নাম জপ করেন। গলায় জৈতুন কাঠের মালা ও বামহস্তে তাঁবা ও লোহার বালা ধারণ করেন। কেহ প্রকৃতি রাখেন, কেহ রাখেন না। ইহাঁদের সহিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধই নাই। অথচ ইহাদিগকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে,—এইটাই আশ্চর্য্য !!

কর্ত্তাভজা।

খৃঃ ১৮শ, শতাব্দির প্রারম্ভে আউল চাঁদ নামে এক সাধু এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ী লোকেরা আউল চাঁদকে শ্রীমহাপ্রভুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। 'আউল' শব্দে পারসিক ভাষায় 'বুজরুক্' অর্থাৎ দৈবশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি। একমাত্র বিশ্বকর্ত্তাকে ভজনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এ

সম্প্রদায়ী গুরুদের নাম 'মহাশয়',—শিষ্যের নাম 'বরাতি'। ইহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ ভাই-ভগ্নীর ন্যায় অবস্থানের ব্যবস্থা আছে—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" ভোজন-বিষয়ে জাতিভেদ বা উচ্ছিষ্ট বিচার নাই। ইঁহাদের মন্ত্র কতকগুলি প্রার্থনা পূর্ণ বাক্যের সমষ্টি।—যেমন "গুরু সত্য" এই মন্ত্র প্রথমে শিষ্যকে প্রদান করেন। নদীয়া জেলায় ঘোষপাড়া নিবাসী সদ্‌গোপ বংশীয় রামশরণ পালই আউল চাঁদের প্রধান শিষ্য ছিলেন। এই পালেদের বাড়ীতে যে গদি আছে, রামশরণ পাল হইতে পরপর উত্তরাধিকার সূত্রে উহার যিনিই অধিকারী হইয়া আসিতেছেন, তিনিই কর্ত্তা স্বরূপ হন এবং ঠাকুর নামে অভিহিত হন। এই সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেই উক্ত গদীতে অধিষ্ঠিত কর্ত্তার প্রসাদ ভোজন ও পদধূলি গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাঁদের সাম্প্রদায়িক কোন বিশেষ গ্রন্থ নাই, বাউল সম্প্রদায়ের ন্যায় দেহতত্ত্ব-বিষয়ক কতকগুলি গানই উহাদের অবলম্বনীয়। বৈশাখ মাসে রথ ও ফাল্গুন মাসে দোলের সময় বহুতর নরনারী ঘোষপাড়ায় সমবেত হয়। এ সম্প্রদায়ের মত, তত নিন্দনীয় নয় কিন্তু কতকগুলি অসংযতেন্দ্রিয় মূর্খ ব্যক্তির স্বভাবের দোষে সম্প্রদায়ে ব্যভিচারের স্রোত প্রবল হওয়ায় শিক্ষিত সমাজের নিকট উহা অতিশয় ঘৃণিত হইয়াছে। "রাম-বল্লভী" সম্প্রদায় এই কর্ত্তাভজারই একটী শাখা বিশেষ। শিবচতুর্দ্দশীর দিন পাঁচঘরা গ্রামে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রাধাবল্লভের উদ্দেশে একটী উৎসব হয়। সর্ব্ব-ধর্ম্ম সমন্বয়ই ইহাদের ধর্ম্মমতের উদ্দেশ্য। "কালী, কৃষ্ণ, গড্, খোদা, কোন নামে নাহি বাধা, বাদীর বিবাদে দ্বিধা, তাতে নাহি টলোরে। মন! কালীকৃষ্ণ গড্ খোদা বলরে।" ইঁহাদের মতে পরদ্রব্য-গ্রহণ ও পরস্ত্রী-হরণ অতিশয় নিষিদ্ধ। "সাহেবধনী"—ইহাও কর্ত্তাভজা-সম্প্রদায়েরই শাখা বিশেষ। কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত, শালিগ্রাম-দোগাছিয়া গ্রামের অন্তবর্ত্তী বনে এক উদাসীন বাস করিতেন; তাঁহার নাম সাহেবধনী। গোপবংশীয় দুঃখীরাম পাল ইহাঁর মূল শিষ্য। ইহাঁর পুত্র চরণ পাল এই সম্প্রদায়ের মত বিশেষরূপে প্রচার করেন।

ইঁহাদের উপাসনা স্থানের নাম "আসন"—ইহা একখানি চৌকি মাত্র। ইহার উপর পুষ্প, চন্দন, মাল্যাদি দেওয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে জাতিভেদ বিচার নাই। কর্ত্তাভজাদের মতই সঙ্গীত করিয়া থাকেন। ইহারা "দীননাথ দীনবন্ধু, দীনদয়াল দীনবন্ধু" এই নাম মন্ত্র উপদেশ দেন।

আউল সম্প্রদায়।

ইঁহারা প্রকৃতিকেই পরমদেবতা মনে করেন। এই সম্প্রদায়ীরা বাউলদের মত শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম, কেবল স্ত্রী-পুরুষের প্রাকৃত কামোপভোগেই পর্য্যবসিত মনে করেন। লোকাচার ও বেদাচার লঙ্ঘন পূর্ব্বক যথেচ্ছ পান ভোজন, ও প্রকৃতি-সঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন অনুষ্ঠান দেখা যায় না। সাঁইদের মত "চারিচন্দ্র ভেদ" প্রচলিত আছে। ইঁহারা গোঁপ দাড়ী রাখেন না। তিলকাদিও প্রায় করেন না। "খুসী-বিশ্বাসী"—কৃষ্ণনগর জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামের নিকট ভাগাগ্রামে খুসী-বিশ্বাস নামক একজন মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। বিশ্বাসই এ সম্প্রদায়ের মূল। শিষ্যদিগকে বলিতেন—"তোরা আমাকে ডাকিস্, আমার কেউ থাকে আমি ডাক্‌বো।" শিষ্যগণ গুরুকেই ভজিবে ইহাই মূল উদ্দেশ্য। রোগীকে ঔষধ দান, নিঃসন্তানকে সন্তান লাভার্থ কবচ দান করেন—বিশ্বাস করিয়া উহা ধারণ করিলে খুসী হওয়া যায়। "সাধন মত" জানা যায় নাই। তবে হরিনাম সংকীর্ত্তন করেন। "বলরামী"—নদীয়া-মেহেরপুর গ্রামে মালোপাড়ায় বলরাম হাড়ী অনুমান ১২৩০ বঙ্গাব্দে এই সম্প্রদায় গঠন করেন। বলরাম সোহহং বাদী ছিলেন। এই সম্প্রদায়ী লোকের মধ্যে জাতিভেদ নাই। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়ই এই সম্প্রদায়ে আছে। ইহাদের সৎগ্রন্থ নাই, বিগ্রহ-সেবা নাই। গুরু-পরম্পরাও দেখা যায় না। ফলতঃ এই সকল উপ-সম্প্রদায় যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তাহা সহজেই অনুমিত হইতেছে।

একবিংশ উল্লাস।

—:o:—

অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণব।

ইঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মতানুবর্ত্তী না হইলেও বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ও সদাচারী।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়।

১৩৭০ শকাব্দে আসাম প্রদেশে আলিপুখুরি গ্রামে শিরোমণি ভূঞা কুসুমবর নামক কায়স্থের ভবনে মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক শ্রীশঙ্করদেব জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া শ্রীক্ষেত্র, গয়া, কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থ পর্য্যটন করেন। অবশেষে শ্রীনবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মতে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। আসাম প্রদেশে ও কুচবিহার অঞ্চলে বহুব্যক্তি এই মতাবলম্বী। শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্যের নাম মাধবদেব। মাধব, পুরুষোত্তম ও দামোদর প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ ধর্ম্ম প্রচার করেন। সাধনাদি বিষয়ে ইহাঁরা প্রায়শঃ গৌড়ীয় মতাবলম্বী। শঙ্করদেব সংস্কৃত, বাঙ্গলা, ব্রজবুলি ও আসামী ভাষা-মিশ্রণে, কীর্ত্তন, নামমালা রচনা ও শ্রীভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ করেন। মাধবদেবও রত্নাবলী, নামঘোষা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া যান। শঙ্কর-রচিত কীর্ত্তনের নাম—'নাম' এবং ধর্ম্মভাবোদ্দীপক নাটকের নাম 'ভাওনা'। শঙ্করদেবের দুইটী প্রধান, আখড়া আছে। নওগাঁ জিলায় বড়দওয়া গ্রামে একটী এবং গৌহাটী জেলায় বড়পেটা গ্রামে একটী। উভয় সত্রেই বড় বড় নামঘর ও ভাওনাঘর আছে। সত্রে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ শ্রীবিগ্রহের ন্যায় পূজিত হন। অন্য বিগ্রহ নাই বটে, কিন্তু প্রস্তর ফলকে শঙ্কর দেবের চরণ-চিহ্ন ভক্তগণ কর্ত্তৃক সাদরে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা সংসারত্যাগী তাঁহারা "কেবলিয়া" নামে অভিহিত। বড়পেটার সত্রে শঙ্করদেব ও তৎ-শিষ্য মাধবদেবের সমাধি আছে। ইহাঁদের নামঘর ভিন্ন অন্য কোন দেবমন্দিরের কথা শুনা যায় না।

বিখ্যাত এবং এককণ্ঠী মালাধারণ করেন। ইহারা অন্যের পক্ক অন্ন গ্রহণ করেন না। ইহঁাদের মধ্যে গৃহস্থ ও উদাসীন দুই আছে। কেহ কেহ বলেন—এই গৃহস্থরাই স্পষ্টদায়ক। এতদ্ব্যতীত মান্দ্রাজের বড়্গাল ও তিঙ্গল সম্প্রদায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর-নিবাসী বেদান্ত দেশীকর নামে জনৈক ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায় দ্বয়ের প্রবর্ত্তক। ইহঁারা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর উপাসনা করেন। মহারাষ্ট্রদেশে "বিঠ্ঠলভক্ত" নামে একটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। ইহঁাদের উপাস্য দেবতার নাম পাণ্ডুরঙ্গ বিঠল ও বিঠোবা। কেহ কেহ ইহঁাদিগকে বৌদ্ধ-বৈষ্ণব বলিয়া থাকেন। খৃঃ ১৪শ, শতাব্দীতে এই সম্প্রদায় গঠিত হয়। দ্বিতীয় আলমগীরের সময় দিল্লীনগরে ধূসর বংশীয় চরণদাস নামক এক ব্যক্তি "চরণদাসী" নামে এক সম্প্রদায় গঠন করেন। ইহঁারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসক,—কর্ম্ম ও ভক্তিই তাঁহার সাধন বলিয়া অবলম্বন করেন। দিল্লীতে ইহঁাদের ৫।৬ মঠ আছে। দ্বারকা অঞ্চলে "মার্গী" নামে এক সাধু-বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে। রামানন্দী বৈষ্ণবদের সহিত ইহঁাদের মতের ঐক্য আছে ইহঁাদের মধ্যে সকলেই গৃহস্থ। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি ভয়ে বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য দেশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ আলোচিত হইল না। প্রসঙ্গতঃ কেবল নামমাত্র উল্লিখিত হইল। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশেও তিলকদাসী, দর্পনারায়ণী হজরতী, গোবরাই, পাগলনাথী প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপসম্প্রদায় আছে। উহারা চারি সম্প্রদায়ের কাহারও মতাবলম্বী নহে। কেবল ভিক্ষা-ব্যবসায়ী বলিয়া বৈষ্ণব বা বৈরাগী নামে অভিহিত, বস্তুতঃ উহারা বৈষ্ণব নামে অযোগ্য।

বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের প্রকৃত বিবরণ সঙ্কলিত করিতে হয়তঃ অনেক অপ্রিয় সত্য বিবৃত করিতে হইয়াছে। তজ্জন্য সকল সম্প্রদায়ের সকল থাকের সাধু বৈষ্ণব মহাত্মাগণ যেন স্ব স্ব উদারতাগুণে এ অধম লেখকের অপরাধ মার্জ্জনা করেন, ইহাই উপসংহারে বিনীত প্রার্থনা।

ইতি—শ্রীকৃষ্ণার্পণ মস্তু।

পরিশিষ্ট।

——:০:——

আর্য্যধর্ম্ম।

আর্য্য শব্দের অর্থ বিশিষ্ট মান্য ও সৎকুলোদ্ভব। বেদ-সংহিতায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোকমাত্রকেই আর্য্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যথা—ঋগ্বেদে-

"বিজানী হ্যার্য্যান্ যে চ দস্যবো বর্হিষ্মতে রনয়া শাসদব্রতান্। ১ম, ৫১সূঃ।

হে ইন্দ্র! তুমি আর্য্যবর্গকে এবং দস্যুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হও। ঐ ব্রতবিরোধীদিগকে নিগ্রহ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠাতা যজমানের অধীন কর।

এই দস্যু বা দাসগণই শূদ্রনামে অভিহিত। এই আর্য্যগণের ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম—আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দুধর্ম্ম।

আর্য্যাবর্ত্ত।

ঋক্মন্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে, আর্য্য ও দস্যু বা দাসগণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব ও বিরুদ্ধজাতি ছিলেন। অথর্ব্ববেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, সমগ্র মানব আর্য্য ও শূদ্র এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

"তথাহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ। কাঃ ৪।২০।৪।

প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উতশূদ্র উতার্য্যে॥ কা ১৯।৬২।১।

আবার শতপথ-ব্রাহ্মণে ও কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে কথিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ই আর্য্য।

"শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যবচ্ছেতে। ১৩অ, ৩ক, ৭সূ।

এই সূত্রের অর্থে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

"শূদ্র শ্চতুর্থবর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।"

অতএব শূদ্র পৃথক্ এক অনার্য্য জাতি বলিয়াই বোধ হয়। আর্য্যজাতি এই অনার্য্যদিগকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন এবং অনেক আর্য্যজাতিও আচার-ভ্রষ্ট হইয়া অনার্য্যজাতির দলপুষ্ট করিয়াছে।

এই আর্য্যজাতি যথায় বাস করিতেন তাহার নাম আর্য্যাবর্ত্ত। মনুসংহিতায় ইহার চতুঃসীমা এইরূপ কথিত আছে।—

"আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ॥ ২য়,অঃ।

উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল, পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র এই চতুঃসীমাযুক্ত ভূভাগের নাম পণ্ডিতেরা আর্য্যাবর্ত্ত কহেন।

আর্য্যাবর্ত্ত প্রধানতঃ আর্য্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিবৃন্দেরই বাসস্থান ছিল। অতএব আর্য্যশব্দ হিন্দুদিগের জাতিগত সাধারণ নাম।

"এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ।
শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবসেৎ বৃত্তিকর্ষিতঃ॥ মনু ২য়,অঃ।

দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যরা এই সকল দেশে বসতি করিবেন, শূদ্রেরা ব্যবসায় অনুরোধে যথা তথা বাস করিতে পারে।

অমরকোষেও আর্য্যাবর্ত্তের এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ আছে—

"আর্য্যাবর্ত্তঃ পুণ্যভূমির্মধ্যং বিন্ধ্যহিমাগয়োঃ।"

বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যগত স্থান আর্য্যাবর্ত্ত বা আর্য্যদিগের বাসভূমি।

হিন্দুশব্দের উৎপত্তি।

এই আর্য্যদিগের ধর্ম্মই আর্য্যধর্ম্ম বা হিন্দু ধর্ম্ম নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই হিন্দু শব্দটী সংস্কৃত-মূলক নহে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শনাদি কোন প্রাচীন গ্রন্থে উহা দৃষ্ট হয় না। ঐ শব্দটী 'আবস্তিক' নামক প্রাচীন পারসিক ভাষারই অন্তর্গত। সংস্কৃত সিন্ধু শব্দ হইতেই পারসিক 'হেন্দু' শব্দের উৎপত্তি এবং কোন অনিবার্য্য কারণে এই রূপান্তরিত শব্দই আর্যসমাজে 'হিন্দুস্থান' 'হিন্দুধর্ম্ম' নামে প্রচলিত হইয়া এক্ষণে আর্য্যত্বের প্রতিপাদক হইয়া পাড়িয়াছে। মেরুতন্ত্রে হিন্দুশব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে—

"হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে। (২৩ প্রকাশ।)

হীনকে দূষিত করে বলিয়া হিন্দু নামে কথিত। কেহ কেহ বলেন হিমালয় ও বিন্দু সরোবর এই শব্দের আদ্য ও অন্ত অংশ লইয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। কারণ উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্দুসরোবর পর্য্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগের বাসস্থান।

বৈষ্ণবের জন্ম।

১৫ পৃষ্ঠায় লিখিত ফুটনোটে যে শ্লোকাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে এস্থলে উল্লিখিত হইল। কেহ কেহ এই শ্লোকটীকে বৃহদ্বিষ্ণু-যামলের বচন বলেন। যথা—

" ললাটাদ্বৈষ্ণবো জাতঃ ব্রাহ্মণো মুখদেশতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাহুমূলাচ্চ উরুদেশাচ্চ বৈশ্য বৈ॥
জাতো বিষ্ণোঃ পদাচ্ছূদ্রঃ ভক্তিধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতঃ।
তস্মাদ্বৈ বৈষ্ণবঃ খ্যাতঃ চতুর্ব্বর্ণেষু সত্তমঃ॥"

ভৃগু বরুণের পুত্র।

৫৪ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনে ঋগ্বেদ ৯ম, ৬৫ সূক্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই—সায়ণ ভাষ্য—

" বরুণ-পুত্রস্য ভৃগো রার্ষং।
হিন্বন্তি ভৃগু বারুণির্জমদগ্নির্ব্বেতি॥"

৫৭ পৃষ্ঠায় ১৫ লাইনের পর—নিম্নোদ্ধৃত অংশটী পাঠ্য। যথা—"শ্রীভাগবতে ঐ বেদ (অথর্ব্ববেদ) অঙ্গিরা ঋষির অপত্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

"প্রজাপতে রঙ্গিরসাঃ স্বধা পত্নীপিতৄনথ।
অথর্ব্বাঙ্গিরসং বেদং পুত্রত্বে চাকরোৎসতী॥"

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসে শিখা-সূত্রাদি গ্রহণ।

৫১ পৃষ্ঠায় ২ লাইনের পর নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ্য। "বৈষ্ণব-সন্ন্যাস ও স্মার্ত্ত-মায়াবাদ-সন্ন্যাস, এতদুভয়ের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য সূচিত হইয়াছে। স্মার্ত্ত-মায়াবাদ-সন্ন্যাসে শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগ করিবার বিধি দৃষ্ট হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসে শিখা-সূত্রাদি রক্ষা করিবারই বিধি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা শ্রীভাগবতে—

"হীনো যজ্ঞোপবীতেন যদি স্যাৎ জ্ঞানভিক্ষুকঃ।
তস্য ক্রিয়াঃ নিষ্ফলাঃ স্যুঃ প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে।
গায়ত্রী সহিতানেব প্রাজাপত্যান্ ষড়াচরেৎ।
পুনঃ সংস্কার মাহৃত্য ধার্য্যং যজ্ঞোপবীতকম্।
উপবীতং ত্রিদণ্ডঞ্চ পাত্রং জলং পবিত্রকম্।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ ন ত্যাজ্যং যাবদায়ুষম্॥

স্কন্দপুরাণ-সূতসংহিতায়—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥"

এই প্রমাণের মূলে স্মার্ত্ত-মায়াবাদ-সন্ন্যাসে শিখাসূত্রাদি ত্যাগ বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতিযোগিতার ফল বলিয়াই প্রতীত হয়।"

শ্রীচণ্ডীদাস।

৯২ পৃষ্ঠায় লিখিত—"বোধ হয়, এই জন্যই বৈষ্ণব তান্ত্রিক চণ্ডীদাস রজকিনী রামীর (রামমণির) প্রেমে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।"—এই চির-প্রচলিত কিম্বদন্তীর বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে কোন কোন বৈষ্ণব-সুধী গবেষণা-পূর্ণ বাদ-প্রতিবাদ করিতেছেন। তাঁহারা বলেন, চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত রসতত্ত্বের পদগুলি প্রকৃত-পক্ষে চণ্ডীদাসের রচিত নহে। পরবর্ত্তী কালে কোন সহজিয়া মতের কবি ঐ সকল পদাবলী রচনা করিয়া চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির নাম সংযোজিত করিয়া

দিয়াছেন। পরম ভক্ত বটু (বড়ু) চণ্ডীদাসের রামমণি নাম্নী রজক কন্যা নায়িকা ছিল, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। এ সিদ্ধান্ত সর্ব্বসম্মতিক্রমে সুমীমাংসিত ও প্রমাণিত না হইলেও এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। কারণ, নব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম-মতকে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মাগণের নামে এইরূপে নিজেদের মতানুকূল জাল পুঁথি বা পদাবলী প্রচারিত করা এক সময়ে সহজিয়া-পন্থিগণের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। উঁহাদিগের গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সে যাহা হউক, এমনও হইতে পারে, চণ্ডীদাস প্রথম অবস্থায় তান্ত্রিক ছিলেন—কৌলাচার মতে নায়িকা সাধন করিতেন—সেই অবস্থায় ঐ সকল রস-তত্ত্বের পদাবলী রচনা করিয়া থাকিবেন। পরে দেবী বাশুলীর স্বপ্নাদেশে বিশুদ্ধভাবে বৈষ্ণব রস সিদ্ধান্তানুসারে শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন সাধনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারই ফল স্বরূপ আমরা তাঁহার রচিত সুমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তন-পদাবলীর রসাস্বাদ লাভে ধন্য হইতেছি। কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া উভয় মতের সামঞ্জস্য বিধান করেন।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী।

১৫৪ পৃষ্ঠায় উক্ত শ্রীপাদের কেবল "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত" গ্রন্থেরই পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থভিন্ন "শ্রীরাধারসসুধানিধিঃ স্তোত্রকাব্যম্" (এই গ্রন্থখানি মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ ও ভজন-তাৎপর্য্য সহ বিশদ ব্যাখ্যা সমেত "ভক্তি-প্রভা কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।) "সঙ্গীত-মাধব" (সংস্কৃত ব্রজগীতি-কাব্য—কবিবর শ্রীজয়দেবের "শ্রীগীতগোবিন্দের" অনুসরণে লিখিত) এবং "শ্রীবৃন্দাবন-শতকম্" (এ পর্য্যন্ত ১৬টী শতক সংগৃহীত হইয়াছে) প্রভৃতি উপাদেয় শ্রীগ্রন্থগুলি শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর।

১৭৯ পৃষ্ঠায় শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কৃত গ্রন্থাবলীর যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তন্মধ্যে "শ্রীবৈরাগ্য-নির্ণয়" নামক গ্রন্থটীর উল্লেখ করা হয় নাই। ইহাতে পারদারিক মর্কট-বৈরাগীদের অপূর্ব্ব আখ্যান বর্ণিত আছে। ইহাও "শ্রীভক্তি-প্রভা কার্য্যালয়" হইতে প্রকাশিত হইয়াছেন।

বৈদিক ৪৮ সংস্কার।

(২৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত)—বেদে যে ৪৮ প্রকার সংস্কার বর্ণিত আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল। যথা—গৌতমীয় বৈদিক ধর্ম্মসূত্র—৮ম, অধ্যায়ে—

(১) গর্ভাধান, ২ পুংসবন, ৩ সীমন্তোন্নয়ন, ৪ জাতকর্ম্ম, ৫ নামকরণ, ৬ অন্নপ্রাশন, ৭ চৌল (চূড়াকরণ) ৮ উপনয়ন, ৯ মহানাম্নীব্রত, ১০ মহাব্রত, ১১ উপনিষদ্‌ব্রত, ১২ গোদানব্রত, ১৩ সমাবর্ত্তন, ১৪ বিবাহ, ১৫ দেবযজ্ঞ, ১৬ পিতৃযজ্ঞ, ১৭ মনুষ্যযজ্ঞ, ১৮ ভূতযজ্ঞ, ১৯ ব্রহ্মযজ্ঞ, ২০ অষ্টকা, ২১ পার্ব্বণ, ২২ শ্রাদ্ধ, ২৩ শ্রাবণী, ২৪ আগ্রহায়ণী, ২৫ চৈত্রী, ২৬ আশ্বযুজী (৭টী পাকযজ্ঞ) ২৭ অগ্ন্যাধেয়, ২৮ অগ্নিহোত্র, ২৯ দর্শপৌর্ণমাস, ৩০ আগ্রয়ণ, ৩১ চাতুর্ম্মাস্য, ৩২ নিরূঢ় পশুবন্ধ, ৩৩ সৌত্রামণি (৭টী হবির্যজ্ঞ), ৩৪ অগ্নিষ্টোম, ৩৫ অত্যাগ্নিষ্টোম, ৩৬ উকথ্য, ৩৭ ষোড়শী, ৩৮ বাজপেয়, ৩৯ অতিরাত্র, ৪০ আপ্তোর্যাম (৭টী সোমযজ্ঞ), ৪১ সর্ব্বভূতো-পরদয়া, ৪২ ক্ষান্তি, ৪৩ অনসূয়া, ৪৪ শৌচ, ৪৫ অনায়াস, ৪৬ মঙ্গল, ৪৭ অকার্পণ্য ও ৪৮ অস্পৃহা।

"এই ৪৮টী সংস্কারের মধ্যে প্রথম ১৪টী সংস্কার জীবিত দেহের এবং ১৫ হইতে ৪০ অর্থাৎ ২৬টী কর্ত্তার ও দ্রব্যের সংস্কার এবং শেষ ৮টী আত্মার গুণ-সংস্কার 'অষ্টকা" হইতে "আশ্বযুজী" পর্য্যন্ত ৭টী পাকযজ্ঞ, অগ্ন্যাধেয় হইতে সৌত্রামণি পর্য্যন্ত ৭টী হবির্যজ্ঞ এবং "অগ্নিষ্টোম" হইতে "আপ্তোর্য্যাম" পর্য্যন্ত সোমযজ্ঞ নামে অভিহিত।

পরিশিষ্ট।

নাভাগারিষ্ট।

২২৪ পৃষ্ঠায়—উল্লিখিত নাভাগারিষ্ট সম্বন্ধে ব্রহ্ম পুরাণে উক্ত

নেদিষ্টঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ”– নেদিষ্ট মনুর সপ্তম পুত্র। কূর্ম্ম-পুরাণে

পরিবর্ত্তে “ অরিষ্ট ” শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—“নাভাগো হ্যরিষ্টঃ।” হরিব

নামটী—“ নাভাগারিষ্ট ” বলিয়াছেন। যথা—

“নাভাগারিষ্ট পুত্রৌ দ্বৌ বৈশ্যৌ ব্রাহ্মণতাং গতৌ। ১১ অধ্যায়।

আবার হরিবংশের টীকাকার একটী শ্রুতি উদ্ধার করিয়াছেন—

“ নাভাগদিষ্টং বৈ মানবমিতি শ্রুতি।”

অর্থাৎ ঐ নাম নাভাগারিষ্ট নয় নাভাগদিষ্ট। অপিচ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটী উপাখ্যানে ঐ নামটী ‘ নাভানেদিষ্ট ’ বর্ণিত আছে। যথা—

“ নাভানেদিষ্টং বৈ মানবং ব্রহ্মচর্য্যং বসন্তং ভ্রাতরো নিরভজন্।”

অর্থাৎ মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করায় তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহাকে ভাগচ্যুত করেন।

উপবীত ধারণের কাল।

২৫৯ পৃষ্ঠার পর নিম্নোদ্ধৃত অংশ অতিরিক্ত রূপে পাঠ্য।

যজ্ঞসূত্র ধারণের একটী নির্দ্দিষ্ট কাল আছে। আশ্বলায়ন গৃহসূত্রে উক্ত হইয়াছে—

“ অষ্টমে বর্ষে ব্রাহ্মণমুপনয়েদ্ গর্ভাষ্টমে বৈকাদশে ক্ষত্রিয়ং দ্বাদশে বৈশ্যম্। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যানতীতঃকাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য আচতুর্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত উর্দ্ধং পতিত সাবিত্রীকা ভবন্তি।” ১।২।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অষ্টম বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের একাদশ বর্ষ, এবং বৈশ্যের দ্বাদশ বর্ষ, উপনয়নের মুখ্য কাল। কিন্তু ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশ বর্ষ এবং

...বৎসর বয়ঃকাল অতীত না হইলে সাবিত্রী পতিত হয় না অর্থাৎ উপ-
ন অতীত হয় না।

অনুশাসন বাক্যেরই অনুরূপ মনুসংহিতাতেও উক্ত হইয়াছে—

"গর্ভাষ্টমেহব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনয়নং।
গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥
আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধো আচতুর্বিংশতের্বিশঃ॥" ২য় অধ্যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব।

গৌড় দেশবাসী বৈষ্ণবগণই গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে অভিহিত। গৌড়দেশ বলিতে এস্থলে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিতে সমগ্র বঙ্গদেশবাসী বৈষ্ণবই বুঝিতে হইবে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন বঙ্গপ্রমুখ গৌড় দেশই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাজতরঙ্গিনী পাঠে জানা যায়, কাশ্মীররাজ ললিতা-দিত্যের পুত্র জয়াদিত্য গৌড়ের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামক নগরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন।" শ্রীচরিতামৃত পাঠেও জানাযায় বঙ্গদেশ সাধারণতঃ গৌড়দেশ নামেই অভিহিত ছিল। যথা—

"হেনকালে গৌড় দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভু দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন॥"

পুনশ্চ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

শেষ খণ্ডে সন্ন্যাসীরূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড়ক্ষিতি॥"

ইতি—পরিশিষ্ট সমাপ্ত।